কার্যপরিবেশ ঃ
ঢাকা ভিত্তিক ক্ষুদ্রশিল্পের উপর একটা সমীক্ষা

M.Phil

এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমাকৃত অভিসন্দর্ভ

জুন, ২০০২

মোঃ মঈনুদ্দিন চৌধুরী
ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

RB
B
338.642
CHK
C-2
DU

GIFT

400864

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কার্যপরিবেশ ঃ
ঢাকা ভিত্তিক ক্ষুদ্রশিল্পের উপর একটা সমীক্ষা

এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমাকৃত অভিসন্দর্ভ
জুন, ২০০২

Dhaka University Library
400864

400864

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

মোঃ মঈনুদ্দিন চৌধুরী
ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

তারিখঃ ২৭শে জুন, ২০০২

এম. ফিল. ডিগ্রী অর্জনের উদ্দেশ্যে "কার্যপরিবেশঃ ঢাকা ভিত্তিক ক্ষুদ্রশিল্পের উপর একটা সমীক্ষা" শিরোনামে আমি অত্র অভিসন্দর্ভ রচনা করেছি। আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমার জানা মতে অন্য কোন গবেষক এরূপ শিরোনামে কোন গবেষণা কাজ করেননি। আমি আরও ঘোষণা করছি যে, আন্তর্জাতিক কোন জার্নাল/পত্র-পত্রিকাতে আমি এ অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কিয়দংশও প্রকাশ করিনি।

মোঃ মঈনুদ্দিন চৌধুরী
২৭/৬/০২

(মোঃ মঈনুদ্দিন চৌধুরী)
এম. ফিল. (গবেষক)
ম্যানেজমেন্ট ষ্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

400864

জমাদানের জন্য সুপারিশকৃত

২৭/৬/০২

(ডঃ মোঃ আব্বাস আলী খান)
অধ্যাপক, ম্যানেজমেন্ট ষ্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
Professor
Department of Management
Dhaka University

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

মুখবন্ধ

সকল প্রশংসা সর্বশক্তিমান আল্লাহতালার যিনি আমাকে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করার তওফিক যুগিয়েছেন। আমি বিশেষভাবে ঋণী আমার সম্মানীত তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডঃ মোঃ আব্বাস আলী খানের নিকট যিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আন্তরিক ও গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সুদক্ষ তত্ত্বাবধান করেছেন এবং উৎসাহিত করেছেন। আমি আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক এবং আমার সম্মানীত সহযোগী তত্ত্বাবধায়ক মোহাম্মদ মহিউদ্দীনকে যিনি আমাকে গবেষণা প্রস্তাবনাসহ গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূল্যবান নির্দেশনা দিয়েছেন। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তাদের মূল্যবান তথ্য প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ, পাবলিক লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ (ঢাকা), পাবলিক লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ (কুমিল্লা), বার্ড (কুমিল্লা) কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন পরিদপ্তরের কর্তৃপক্ষসমূহকে যারা আমাকে গ্রন্থাগার সুবিধাদিসহ ক্ষুদ্রশিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন মূল্যবান তথ্য প্রদান করেছেন। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মোঃ মোশারফ হোসাইনের প্রতি যিনি বিভিন্নভাবে সহায়তা করে আমার গবেষণা কর্মে উৎসাহিত করেছেন। আর এই গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানাভাবে সাহায্য করে যারা এই প্রচেষ্টাকে বর্তমান রূপ দেওয়ায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছে তাদের মধ্যে আমি বন্ধু প্রতিম আলম এবং খালাত ভাই সাঈদ ও রিয়াজকে ধন্যবাদের সাথে স্মরণ করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সর্বাঙ্গীন পৃষ্ঠপোষকতার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

400864

অতীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ব্যবস্থাপনা) উক্ত বিষয়ে কোন গবেষণা থিসিস রচিত হয়নি। তাই সাধ্যানুকূল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি এই অভিসন্দর্ভে কিছু ভুল ত্রুটি থেকে যায় তবুও তা সংশ্লিষ্ট গবেষক, শিক্ষার্থী ও ক্ষুদ্রশিল্পের মালিকদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। থিসিস প্রণয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন দেশী-বিদেশী পুস্তক, থিসিস,

Dhaka University Institutional Repository

জার্নাল, ম্যানুয়েল, পত্রিকা ইত্যাদির সহায়তা নেয়া হয়েছে। তাই আমি সংশ্লিষ্ট লেখক প্রকাশকদের কাছে ঋণী। সময়ের স্বল্পতা ও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে মাত্র ২০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে নমুনা হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। যদি আরও বেশি সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে নমুনা হিসেবে বেছে নেয়া যেত তাহলে গবেষণা থিসিস আরও মানসম্মত হত।

এ অভিসন্দর্ভের কোন একটি অংশও যদি ভবিষ্যতে কোন গবেষণায় সহায়ক হয় তাহলে গবেষকের শ্রম সার্থক হবে।

মোঃ মঈনুদ্দিন চৌধুরী
২৩/০৬/০২

(মোঃ মঈনুদ্দিন চৌধুরী)
ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

MAP SHOWING THE CONCENTRATION OF SMALL INDUSTRIES IN

Dhaka University Institutional Repository

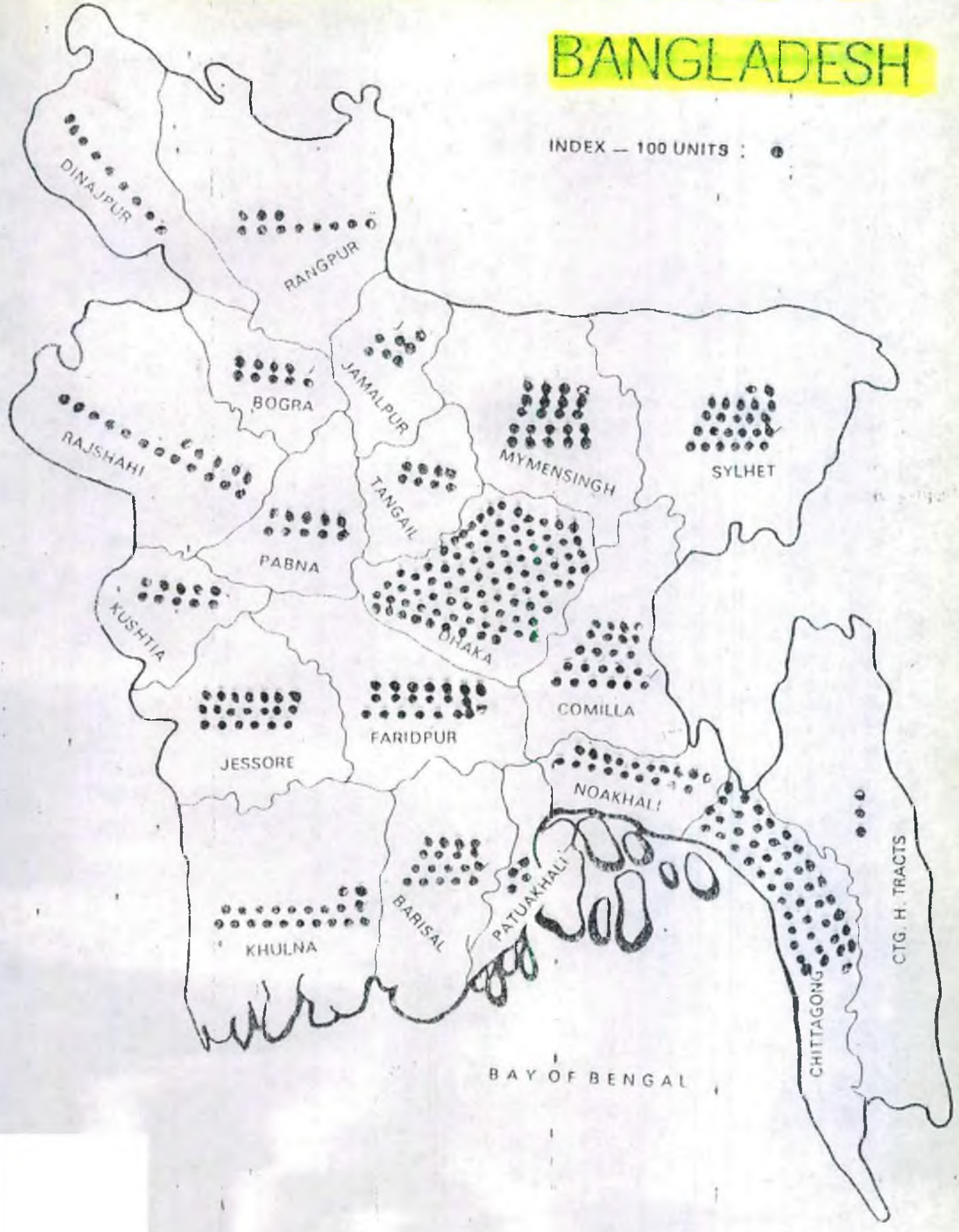

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

শিরোনাম		পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ		i
মানচিত্র		iii
সারসংক্ষেপ		১-৪
অধ্যায়-১		৫-২৬
ভূমিকা		৬
১.১	উৎপাদনশীলতার উপর কার্যপরিবেশের প্রভাব	৬
১.২	সমস্যার বিবরণ	১৬
১.৩	গবেষণার উদ্দেশ্য	১৭
১.৪	তথ্য সংগ্রহের সাথে সংশ্লিষ্ট উপাদানসমূহ	১৭
১.৫	গবেষণা পদ্ধতি	১৮
১.৬	গবেষণার সীমাবদ্ধতা	২৩
অধ্যায়–২		২৭-৭৭
ক্ষুদ্র শিল্প ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের পর্যালোচনা		২৮
২.১	বাংলাদেশের শিল্পের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ	২৮

Dhaka University Institutional Repository

২.১.১ শিল্পনীতির উদ্দেশ্য ৩৩

২.১.২ বেসরকারিকরণ এবং রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প সংস্কার নীতি ৩৪

২.১.৩ বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিবেশ ৩৪

২.২ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্পের পরিচিতি ৩৮

২.২.১ ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির শিল্পের মধ্যে পার্থক্য ৪০

২.২.২ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ক্ষুদ্রশিল্প ৪১

২.২.৩ ক্ষুদ্র শিল্পে অর্থায়ন ৪৩

২.২.৪ ক্ষুদ্রশিল্পে অর্থায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাবলী ৪৬

২.৩ ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ৫২

২.৩.১ মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বাংলাদেশের ক্ষুদ্রশিল্প ৫৮

২.৩.২ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রশিল্পের ভূমিকা ৬০

২.৪ বিসিকের পরিচিতি ৬৭

২.৪.১ বাংলাদেশের ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়নে বিসিকের ভূমিকা ৬৮

অধ্যায়–৩ ৭৮-১১৩

কার্যপরিবেশ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ের পর্যালোচনা ৭৯

৩.১ কার্যপরিবেশ পরিচিতি ৭৯

৩.২ কর্মক্ষেত্র সংগঠন এবং কর্মস্থল পরিকল্পনা ৮২

৩.২.১ কর্মস্থল ৮২

Dhaka University Institutional Repository

৩.২.২ মালামাল নাড়াচাড়া ৮৩

৩.২.৩ গৃহস্থালী, সংরক্ষণ ও কর্মস্থলের প্রবেশপথ ৮৪

৩.২.৪ কাজের বিষয়বস্তু এবং কর্ম তালিকা ৮৫

৩.৩ ভৌত কাজের পরিবেশ ৮৬

৩.৩.১ আলোকায়ন ৮৭

৩.৩.২ রং এর প্রভাব ৯১

৩.৩.৩ তাপ ৯২

৩.৩.৪ গোলমাল ৯৪

৩.৩.৫ সঙ্গীত ৯৭

৩.৩.৬ কর্ম অনুসূচি ৯৯

৩.৩.৭ ক্ষতিকারক বস্তুর নাড়াচাড়া, ব্যবহার এবং সংরক্ষণ ১০১

৩.৩.৮ নিরাপত্তা বেষ্টনী ও অন্যান্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ১০৩

৩.৩.৯ নিরাপদ কাজের ধরন ১০৪

৩.৪ শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য সুবিধাদি ১০৪

৩.৪.১ স্যানিটারী সুবিধাদি ১০৫

৩.৪.২ পানীয় এবং খাবারের সুবিধাদি ১০৫

৩.৪.৩ চিত্ত বিনোদন, শিশু পরিচর্যা এবং যাতায়াত সুবিধাদি ১০৬

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়–৪ ১১৪-১৫০

জরিপকৃত ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যপরিবেশ ১১৫

৪.১ প্রাথমিক কিছু তথ্য ১১৫

৪.২ শ্রমিক কর্মীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যবস্থা ১১৭

৪.৩ নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থা ১৩২

৪.৪ শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কিত ব্যবস্থা ১৩৬

৪.৫ প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকদের নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যবস্থা ১৩৯

৪.৬ অন্যান্য ব্যবস্থা ১৪৪

মন্তব্য ১৪৫

অধ্যায়–৫ ১৫১-১৫৮

কারখানা আইনে বর্ণিত পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষের পরিচিতি ১৫২

৫.১ পরিদর্শক ১৫২

৫.১.১ পরিদর্শকের নিয়োগ ১৫২

৫.১.২ পরিদর্শকের ক্ষমতা ১৫৩

৫.১.৩ পরিদর্শকের কর্তব্য ১৫৪

৫.২ প্রত্যয়নকারী চিকিৎসক ১৫৪

৫.৩ বাংলাদেশের কলকারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকারী পরিদপ্তরের কার্যক্রম ১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়–৬ ১৫৯-১৮৭

আইনানুগ ও আদর্শ কার্যপরিবেশ বনাম বাস্তব কার্যপরিবেশ ১৬০

৬.১ মালামাল সংরক্ষণ ও স্থানান্তর সম্পর্কিত বিচ্যুতি ১৬০

৬.২ কর্মস্থল ডিজাইন সংক্রান্ত বিচ্যুতি ১৬২

৬.৩ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিচ্যুতি ১৬৩

৬.৪ শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কিত বিচ্যুতি ১৭০

৬.৫ নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিচ্যুতি ১৭৮

৬.৬ অন্যান্য বিচ্যুতি ১৮০

অধ্যায়-৭ ১৮৮-১৯৮

কার্যপরিবেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাবলী

ও সেগুলো নিরসনে প্রস্তাবিত সুপারিশ– ১৮৯

৭.১ সমস্যা ও সুপারিশ ১৮৯

৭.২ উপসংহার ১৯৩

পরিশিষ্ট–১ ১৯৯-২০২

প্রশ্নপত্র ২০০

পরিশিষ্ট–২ ২০৩-২১৩

গ্রন্থপঞ্জি ২০৪

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের অধিকাংশ ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এর জন্য দায়ী কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হল অনুন্নত কার্যপরিবেশ। আলোচ্য গবেষণার মাধ্যমে ঢাকা শহরে বিদ্যমান বিভিন্ন ক্ষুদ্রশিল্পের কার্যপরিবেশ সম্পর্কে অবহিত হয়ে এবং উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে আইনানুগ কার্যপরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে কিনা তা বিস্তারিত বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

বিসিক কর্তৃক নিবন্ধিত ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানকে গবেষণার জন্য বিবেচনা করা হয়েছে। ১৩টি ক্ষুদ্রশিল্প খাতের মধ্য থেকে ৩টি শিল্পখাতকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নমুনায় আনা হয়েছে। উক্ত ৩টি ক্ষুদ্রশিল্পখাতের মধ্য থেকে আবার ঢাকা কেন্দ্রীক ২০টি ক্ষুদ্র শিল্পকে দৈবচৈতভাবে বাছাই করা হয়েছে। গবেষণার কার্যকাল ছিল ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সাল। অনুসন্ধানকালে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও একজন শ্রমিককে নমুনা হিসেবে ধরা হয়েছে। গবেষণার জন্য সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। সাক্ষাৎকারের জন্য একটি পূর্ব প্রস্তুত উন্মুক্ত প্রশ্নমালা ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে ব্যক্তিগত আলোচনা, বিভিন্ন প্রকাশনা, বই, জার্নাল, রিপোর্ট, থিসিস, পত্রিকা, ম্যানুয়েল ইত্যাদি থেকে প্রয়োজনীয় উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং উপযুক্ত পরিসংখ্যান পদ্ধতি ব্যবহার করে উক্ত সংগৃহীত উপাত্ত ও তথ্য শ্রেণীবদ্ধকরণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিবেশ সম্পর্কে অবহিত হয়ে কারখানা আইন ও বিধিমালা মোতাবেক আইনানুগ ও আদর্শ কার্যপরিবেশের সাথে এর বিচ্যুতি চিহ্নিত করা এবং পরিবেশ কিভাবে উন্নত করা যায় তার পদক্ষেপ সুপারিশ করা আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্য।

কারখানা আইন ও বিধিমালায় বর্ণিত বিভিন্ন উপাদানসমূহের সাথে কার্যপরিবেশের সম্পর্ক রয়েছে বিধায় সেগুলোকে তথ্য সংগ্রহের সাথে সংশ্লিষ্ট উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যথা– শ্রমিক কর্মচারীদের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সুবিধা, কারখানার নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থা, শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কিত ব্যবস্থা, অন্যান্য অবস্থা যেমন– সাপ্তাহিক কার্যঘণ্টা সংক্রান্ত

Dhaka University Institutional Repository

বিধান, ক্ষতিপূরণমূলক সাপ্তাহিক ছুটি, বিশ্রাম বা আহারের বিরতি, কাজের সময়ের ব্যাপ্তি, রাত্রির পালা, প্রাপ্ত বয়স্ক ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক লোক নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যবস্থা ইত্যাদি।

ঢাকার ২০টি ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠান জরিপ করে দেখা গিয়েছে যে, উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যপরিবেশ সন্তোষজনক নয়। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যবস্থা, নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থা, শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কিত ব্যবস্থা ও অন্যান্য ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ১৯৬৫ সালের কারখানা আইন মোতাবেক আইনানুগ বিধান এবং বিভিন্ন পুস্তকে প্রদত্ত আদর্শমানের সাথে বাস্তব কার্যপরিবেশ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। প্রতিষ্ঠানসমূহ জরিপ করে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থা ভাল নয়। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই নোংরা এবং দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশ বিরাজ করছে। বায়ুচলাচল ও তাপমাত্রা সন্তোষজনক নয়। প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক আলোর ব্যবস্থা খুবই খারাপ। কোন প্রতিষ্ঠানেই থুথু ফেলার জন্য পিকদানি নেই। প্রতিষ্ঠানগুলিতে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। বেশীরভাগ প্রতিষ্ঠানেই বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা নেই। কিংবা গরমকালে ঠান্ডা পানির ব্যবস্থা নেই। অনেক প্রতিষ্ঠানেই পায়খানা ও প্রস্রাবখানা নেই। শ্রমিকদের ধোয়া ও গোসলের কোন ব্যবস্থা নেই। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানেই ফাস্ট এইড বক্স নেই এবং প্রাথমিক চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত নেই। প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিকদের জন্য বিশ্রামের সুবন্দোবস্ত নেই। শ্রমিকেরা খেতে পারে এমন কোন ক্যান্টিন বা খাবার ঘর প্রতিষ্ঠানগুলিতে নেই। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানেই শ্রমিকদের চিত্ত বিনোদনের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণেও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ উদাসীন। যেমন–অগ্নিকান্ড সম্পর্কিত বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সাবধানতা অবলম্বন করে না। তাদের মতে, বিশেষজ্ঞের অভাবে তারা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি রাখেন না। চলমান যন্ত্রের নিকটে কাজ করার সময় শ্রমিকগণ নির্দিষ্ট কোন পোষাক পরে না এবং এ ব্যাপারে তাদের কোন প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয় না। প্রতিষ্ঠানগুলিতে নির্দিষ্ট ওজনের বেশি ভারবহনের কাজ হয়ে থাকে। চোখের নিরাপত্তার জন্য কোন গগলসের ব্যবস্থা নেই। অন্যান্য বিষয় যেমন- শ্রমিকদের দৈনিক ও প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট সময়ের বেশি কাজ করানো হয়। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানেই ক্ষতিপূরণমূলক সাপ্তাহিক ছুটি পাওয়া যায় না। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত সময় কাজ করলে অতিরিক্ত ভাতা প্রদান করে না। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা কিশোর ও শিশু শ্রমিক নিয়োগ করার সময় প্রত্যয়নকারী চিকিৎসক কর্তৃক দৈহিক সক্ষমতা সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র নেওয়া হয় না। শ্রমিকদের কোন

Dhaka University Institutional Repository

রেজিস্টার প্রতিষ্ঠানসমূহ সংরক্ষণ করে না। অর্থাৎ বলা যায়– ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাঙ্খিত মাত্রার কার্যপরিবেশের অভাব রয়েছে।

জরিপকালে ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে কার্যপরিবেশ কাঙ্খিত মাত্রার না হওয়ার কারণ স্বরূপ বিভিন্ন সমস্যা দেখা যায়। এর মধ্যে রয়েছে, বাংলাদেশের কল-কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকারী পরিদপ্তরের কিছু সমস্যা যেমন–পরিদর্শকের স্বল্পতা, পরিদর্শকদের নিরাপত্তার অভাব, পরিদর্শকদের জন্য যানবাহনের অভাব, পর্যাপ্ত মেশিনারীর অভাব, যোগ্যতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ ও পরিকল্পনাবিদের অভাব, প্রশিক্ষণের অভাব, পরিদর্শকদের কর্তব্যে অবহেলা ইত্যাদি।

অন্যান্য সমস্যার মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র শিল্পের মালিকগণ পরিদর্শন পরিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত না থাকা, আইনগত ত্রুটি, অর্থের অভাব, ঋণ না পাওয়া, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেধাবী ও দক্ষ মাণিকের অভাব, কার্যপরিবেশ সম্পর্কে মালিক ও শ্রমিক-কর্মীগণের সচেতনতার অভাব, পর্যাপ্ত স্থানের অভাব, মালিকদের উদাসীনতা ও ভুল ধারণা ইত্যাদি।

উল্লেখিত সমস্যাসমূহ সমাধান করতে হলে প্রথমেই পরিদর্শন পরিদপ্তরকে ঢেলে সাজিয়ে এর সমস্যার সমাধান করতে হবে, ক্ষুদ্র শিল্পের মালিকগণ যাতে পরিদর্শন পরিদপ্তরের কার্যক্রম জানতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, আইনগত ত্রুটি দূর করতে হবে, প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিক ও শ্রমিক-কর্মীগণকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ও তাদের মধ্যে কার্যপরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, মালিকগণ যাতে নিজের জায়গায় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারে সেজন্য তাদের আর্থিক সহায়তা দিতে হবে, মালিকদের উদাসীনতা ও কার্যপরিবেশ সম্পর্কিত ভুল ধারনা দূর করতে হবে। সর্বোপরি সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যপরিবেশ উন্নয়নে এগিয়ে আসতে হবে।

বর্তমান গবেষণাটি ঢাকা শহরের বিভিন্ন থানার ২০টি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে করা হয়েছে। ঢাকা শহর ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাই কার্যপরিবেশসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ব্যাপকভিত্তিক গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে এই শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী।

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীর সব শিল্পোন্নত দেশই তাদের শিল্পায়নের প্রাথমিক স্তরে ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়নকেই শিল্পোন্নয়নের অন্যতম কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ জাপানের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। অষ্টাদশ শতকের পূর্বে জাপানের অর্থনীতিও বর্তমান বাংলাদেশের মত ছিল। তারা প্রথমে ক্ষুদ্রশিল্পের উপর, তারপর মাঝারি শিল্প এবং সবশেষে বৃহৎ শিল্পের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। মেইজী সরকার জাপানের শিল্পের উন্নতির জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন- পাশ্চাত্যের অনুকরণে বিদেশ থেকে অভিজ্ঞ লোক আনয়ন করা হয়, জাপানের শিক্ষিত তরুণদেরকে বিদেশে প্রেরণ করা হয় এবং শিল্প সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা প্রদানের জন্য দেশে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৬০ সালের হিসাব অনুযায়ী জাপানের সর্বমোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৯৯.৪% ক্ষুদ্রশিল্প। বর্তমানে জাপানে ভারী শিল্প থাকা সত্ত্বেও ক্ষুদ্রশিল্পের গুরুত্ব হ্রাস পায়নি।

অধিক জনসংখ্যার ভারে জর্জরিত এই বাংলাদেশকেও জাপানের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে প্রথমে ক্ষুদ্রশিল্পের উপর জোর দিতে হবে। তারপর ক্রমান্বয়ে বড় আকারের শিল্পগুলোকে বিবেচনায় আনতে হবে। আর এভাবেই শিল্পোন্নয়নকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথাযথ পৃষ্ঠপোষকে পরিনত করা সম্ভব হবে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-১

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-১

ভূমিকা

কার্যপরিবেশ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক-কর্মীগণ কি পরিবেশে কাজ করছে তা অবহিত হয়ে তার উপর ভিত্তি করে একটা প্রতিবেদন প্রস্তুত করাই এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

১.১ উৎপাদনশীলতার উপর কার্যপরিবেশের প্রভাব

উৎপাদন ব্যবস্থায় কার্যপরিবেশ নিঃসন্দেহে মানুষের কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। আদর্শ কার্যপরিবেশ যেমন শ্রমিক-কর্মীদেরকে কাজে অনুপ্রাণিত করে তেমনি নিকৃষ্ট কার্যপরিবেশ তাদেরকে কাজে নিরুৎসাহিত করে। প্রতিকূল কার্যপরিবেশে কখনই দক্ষ উৎপাদন সম্ভব নয়। তাই, উত্তম কার্যপরিবেশ দক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য। উন্নত কার্যপরিবেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শ্রমিক-কর্মীদের দৈহিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য এটি অত্যাবশ্যক। এই অবস্থা তাদের শারিরীক সুস্থতার নিশ্চয়তা বিধান করে, তারা প্রফুল্লমনে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কাজ করে যায়। কাজে তাদের অবসাদ বা ক্লান্তি আসে না। এর ফলে দক্ষতার সাথে উৎপাদন কার্যাদি চলতে থাকে। উৎপাদন দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়।[১] শ্রমিকগণ যখন তাদের কাজ ও নিয়োগকর্তা সম্পর্কে গর্ব অনুভব করবে তখন তারা কাজে কর্মে অধিকতর সহযোগিতা করবে এবং অনুগত হবে। এই গর্ব তৈরি করার জন্য ব্যবস্থাপনার একটি পথই খোলা আছে। আর সেটি হচ্ছে আকর্ষণীয় কার্যপরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করা।[২]

ব্যবস্থাপনা হলো উপযুক্ত পরিবেশে মানব-আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং অর্জন করার একটা প্রক্রিয়া। অপরপক্ষে ব্যবস্থাপকগণ এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেন, যা

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য ব্যক্তির পক্ষে কাজ করার জন্য অনুকূল হবে, যে কাজ কারখানার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে এবং এরূপ প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণও এক বা একাধিক উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হবেন। একটা প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্দেশ্যবালী নির্ধারণ এবং এগুলো অর্জনের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা একজন ব্যবস্থাপকের সামগ্রিক দায়িত্ব।[৩]

ব্যবস্থাপকগণ যে কর্মপরিবেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তার দুটি অংশ রয়েছে। স্পষ্টতই এর একটা হলো ভৌত অংশ। ভৌত অংশ বলতে যা নিয়ে এটি গঠিত তার সব কিছুই বোঝায়। যেমন আলো, তাপ, শব্দ, বায়ুচলাচল ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতি এবং উপকরণ, যা নিয়ে একজন শ্রমিক কাজ করে। এবং ভৌত অংশ বলতে আরও বোঝায় সময়োপযোগী সুবিন্যস্ত কার্যসম্পাদন। যা কিছু ভৌত পরিবেশকে প্রভাবিত করে তার সবই এর অংশ এবং ব্যবস্থাপককে এগুলো অবশ্যই সঠিক পরিমানে ব্যবহার করতে হবে যাতে এমন এক ভৌত পরিবেশের সৃষ্টি হয়, যেখানে কর্মচারীরা আনন্দমুখর উৎপাদনমুখী মন নিয়ে কাজ করতে পারে। এরূপ ভৌত পরিবেশ সৃষ্টি করার ব্যাপারে বর্তমান ব্যবস্থাপকগণ সনাতন বা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা চিন্তা গোষ্ঠী থেকে প্রচুর পরিমানে দিক নির্দেশনা গ্রহণ করেন, যারা ভৌত দিকের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৪]

পরিবেশের দ্বিতীয় যে অংশের সঙ্গে ব্যবস্থাপকগণ জড়িত থাকেন তা অনেকটা ধারণামূলক। এটি হলো পরিবেশের মনোগত দিক, যা একজন কর্মচারীর কর্ম এবং কর্মস্থলের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে। এই ধারণাগত অথবা মানসিক পরিবেশ, যা ব্যবস্থাপকগণ সৃষ্টি করেন, তার উদ্দেশ্য হলো একটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা বা প্রতিটি শ্রমিকের জন্য এমন এক মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি করা, যা প্রত্যেক শ্রমিককে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অনুধাবন করতে সক্ষম করে। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে তার প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করলে তার কি সুবিধা হবে এটি বুঝতে পারলেই সে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে সক্ষম হবে। মানসিক পরিবেশে অসম্পূর্ণতা বা অতৃপ্তি স্পষ্টত পরিলক্ষিত হয়, যখন একজন কর্মী অন্য কোথাও কর্মসংস্থান খুঁজে বেড়ায় অথবা তার নির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনে সামগ্রিকভাবে মনপ্রাণ নিয়োজিত করতে পারেনা। অপরপক্ষে একটা কার্যকর মানসিক পরিবেশে একজন কর্মী বুঝতে পারে কেন সে কাজে অংশগ্রহণ করবে, কোন্ কোন্ সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান তাকে চায় এবং কিভাবে তার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব হবে।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

একজন ব্যবস্থাপকের কাজ হলো একটা সুস্থ ভৌত এবং মানসিক কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে অন্যেরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনে তাদের প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখতে অনুপ্রাণিত হয়। যথাযথ ভৌত-মানসিক পরিবেশ অথবা কর্মপরিবেশের অনুপস্থিতিতে অংশগ্রহণকারীদের প্রচেষ্টা অকার্যকর হতে পারে অথবা তাদের প্রচেষ্টা লোপ পেতে পারে।[৬]

অবশ্য একটা পরিবেশে এ দুটি দিক স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করতে পারে না। এদের একটি আরেকটিকে প্রভাবিত করে। একটা নিখুঁত ভৌত পরিবেশ তেমন কর্মীর কাছে নিখুঁত নাও মনে হতে পারে, যে সেটাকে অন্যভাবে দেখে এবং এরূপ অসম্পূর্ণতা তার মানসিকতায় নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করবে। উদাহরণস্বরূপ তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণের কথা বলা যায়। একজন ভৌত বিজ্ঞানী যদি বলেন যে, তাপমাত্রা নিখুঁত অবস্থায় রয়েছে এবং একজন কর্মী যদি মনে করে যে, এখন খুব গরম, তাহলে তার পক্ষে কাজটি আদৌ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে মানসিক দিকটা কিন্তু শারিরীক দিকটাকে প্রভাবিত করে। আবার বিপরীতটিও হয়তো সত্য হতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, মুক্তস্থানে জনসমক্ষে বাজানো সঙ্গীত একজন কর্মপীড়িত কর্মীর মনে প্রশান্তি সঞ্চার করতে পারে। এখানে কিন্তু শারিরীক দিকটা মানসিক দিকটাকে প্রভাবিত করেছে। একটা কারখানার মুক্তাঙ্গনে পুরস্কার ও সম্মান ঘোষণা একজন শ্রমিককে সন্তুষ্ট করতে পারে এবং তার মধ্যে একটা ইতিবাচক বা উদ্দীপক মানসিক কাঠামো সৃষ্টি করতে পারে। পক্ষান্তরে, একই অবস্থায় তিরস্কার বা ভর্ৎসনা তার মধ্যে একটা নেতিবাচক মানসিকতা তৈরি করতে পারে। সুতরাং বিষয়বস্তু এবং কিভাবে এই বিষয়বস্তু নিয়ে যোগাযোগ ঘটে তা ভৌত ধারণামূলক পরিবেশের অংশবিশেষ।[৭]

জেনারেল মটরস ১৯৭৭ সালে নিউয়র্কের টেরিটাউনে তার শ্রমিকদের কাজের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য একটি প্রোগ্রাম চালু করেছিল। এই প্রথা শ্রমিক এবং কার্যপরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে। টেরিটাউনের ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগের মাধ্যমে দেখা যায় যে, কাজের জীবনের মান 'শিল্পীয় গণতন্ত্রে'র সাথে সম্পর্কিত। কাজের জীবনের মানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে কার্যসন্তুষ্টি এবং কাজের জীবনের মান উন্নয়নের যে কোন দিক পর্যালোচনা করতে গেলে কার্যসন্তুষ্টিকেও বিবেচনায় আনতে হয়।[৮] প্রতিষ্ঠানে উন্নত কার্যপরিবেশ বিদ্যমান থাকলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, প্রতিষ্ঠানে উন্নত কার্যপরিবেশের অভাব দেখা দিলে কার্যঅসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে উৎপাদনশীলতা হ্রাস

Dhaka University Institutional Repository

পায়। হথর্ন স্টাডি এবং হার্জবার্গের গবেষণায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কার্যপরিবেশের তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। পশ্চিমা দেশগুলোতেও কার্যপরিবেশের গুরুত্ব বর্তমানে তেমন নেই। কারণ এসব দেশে উন্নত কার্যপরিবেশ বিদ্যমান। হার্জবার্গ ও তার অনুসারীগণ ১৯৫৯ সালে আমেরিকার পিটাসবার্গ এলাকায় পরিচালিত গবেষণা থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পরস্পর বিরোধী দু'ধরনের উপাদান প্রেষণাকে প্রভাবিত করে। উপাদান দুটি হল রক্ষণাবেক্ষণমূলক এবং প্রেষণামূলক উপাদান। রক্ষণাবেক্ষণমূলক উপাদানসমূহের মধ্যে কার্যপরিবেশ অন্যতম। হার্জবার্গ লক্ষ্য করেন, প্রেষণামূলক উপাদানগুলো প্রতিষ্ঠানে বর্তমান থাকলে লোকজন প্রেষণা লাভ করে। কিন্তু এটি বর্তমান না থাকলে তাদের অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হয় না। আবার রক্ষণাবেক্ষণমূলক উপাদানগুলো বর্তমান থাকলে লোকজন কার্যে প্রেষণা লাভ করে না কিন্তু বর্তমান না থাকলে কার্যের প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। ফলশ্রুতিতে কার্যের প্রতি বিতৃষ্ণা ও অবহেলা সৃষ্টি হয়।[৯] অর্থাৎ প্রেষণামূলক উপাদান কর্মীদের প্রেষণা দান করে এবং রক্ষণাবেক্ষণমূলক উপাদান কর্মীদের প্রেষণাদানের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করে।[১০]

লিন্ডাল গবেষণালব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে এ সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, সাধারণ মজুরী সন্তুষ্টি বর্ধনে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং কাজের নিরাপত্তা এবং কাজের পরিবেশ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।[১১] কার্যসন্তুষ্টি সম্পর্কিত বহুসংখ্যক গবেষণা পর্যালোচনা করে ভ্রম কার্যসন্তুষ্টির উপাদানগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে ব্যক্তিগত উপাদান, কর্মসম্পর্কিত উপাদান এবং কর্মবহির্ভূত উপাদান। কর্মসম্পর্কিত উপাদানের মধ্যে অন্যতম উপাদান হচ্ছে কর্মস্থলের পরিবেশ।[১২]

কর্মসন্তুষ্টিতে কর্মের বিভিন্ন উপাদানের গুরুত্ব সম্পর্কিত অনেকগুলো গবেষণার ফলাফল পর্যালোচনা করে হ্যারেল দেখতে পান যে, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত কর্মচারীদের মূল্যায়নের তারতম্য অনুযায়ী কর্মসন্তুষ্টিতে কর্মপরিবেশের গুরুত্ব ক্রমানুসারে দ্বিতীয় থেকে একাদশ স্থানের মধ্যে অবস্থিত।[১৩]

পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের ১১,০০০ শ্রমিকের উপর পরিচালিত ১৬টি গবেষণার ফলাফল পর্যালোচনা করে হার্জবার্গ ও তার সহযোগীরা দেখতে পান যে, উক্ত শ্রমিকদের মূল্যায়ন অনুসারে কর্মসন্তুষ্টিতে চাকরির বিভিন্ন উপাদানের ক্রমানুসারে কার্যপরিবেশ দশম স্থানের অধিকারী।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের ১৫৬০ জন শ্রমিকের উপর পরিচালিত একটি গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, উক্ত শ্রমিকেরা তাদের চাকরির উপাদানের মধ্যে কার্যপরিবেশকে কর্মসন্তুষ্টির জন্য তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মনে করে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের চেয়ে বাংলাদেশের শ্রমিকেরা কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ (বিশেষ করে প্রাকৃতিক পরিবেশ)কে বেশি গুরুত্ব আরোপ করার একটি কারণ সম্ভবত এই যে, পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলোর তুলনায় এদেশের শ্রমিকেরা অনেক অনুন্নত ও প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করে।[১৫]

নারায়ণগঞ্জের পাঁচটি গার্মেন্টস ফেক্টরীর ১৫০ জন শ্রমিকের উপর পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়, মাত্র ৩০% শ্রমিক তাদের কারখানার কার্যপরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্ট। বাকী ৭০% শ্রমিকই তাদের কারখানার কার্যপরিবেশ নিয়ে অসন্তুষ্ট।[১৬]

লিকার্টের মতে, মানব-মুখী পরিবেশ উচ্চ উৎপাদনশীলতা এবং কার্যসন্তুষ্টি উভয়ই অর্জন করতে পারে।[১৭]

বাংলাদেশে প্রগতিশীল শিল্পপতিগণ কারখানায় ক্যান্টিনের ব্যবস্থা করেছেন। সকাল ১১টার দিকে এখানে চা, সিঙ্গারা খাবার ব্যবস্থা আছে; অবশ্য তা অর্থের বিনিময়ে। আদমজী জুট মিলের এই কান্টিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ চা পান করেছেন। ছদ্মবেশে শ্রমিকদের কথাবার্তা শ্রবণ করেছেন তার গবেষণার অংশ হিসেবে। অগ্রগতিশীল শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোতে খাদ্য গ্রহণ, কাজ, অবসর, চিত্তবিনোদন, ঘুম প্রভৃতির জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচি প্রণয়ন করে ইতিবাচক ফল পেতে দেখা গেছে। উদাহরণ–চট্টগ্রামের প্রগতি শিল্প কারখানা।[১৮]

শিল্পবিপ্লবের পূর্বে শ্রমিকরা অসহনীয় শর্তে কাজে নিয়োজিত হত। ফলশ্রুতিতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করতে হত। কার্যক্ষেত্রে দুর্ঘটনা প্রতিরোধের বা স্বাস্থ্য রক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এরূপ কাজের পরিবেশে শুধুমাত্র জীবিকা নির্বাহের তাগিদে তারা নিঃশব্দে কাজ করত। কাজেই তৎকালীন শ্রমিকদের আত্মতৃপ্তি বা সন্তুষ্টির সাথে কাজ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অর্থাৎ তাদের আচরণগত সন্তুষ্টির দিকে খেয়াল দেওয়ার অবকাশ ছিল না বললেই চলে।[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

এই অবস্থার পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে আসল শিল্প বিপ্লব। ইউরোপে পুর্বতন কাঠামো ভেঙ্গে জেগে উঠল মানুষ। দ্রুতগতিতে বেড়ে যেতে লাগল শিল্প-কারখানার সংখ্যা। শিল্প প্রতিষ্ঠানে উদ্বৃত্ত বাড়তে লাগল। ফলশ্রুতিতে সংগঠকরা কাজের সময় কমিয়ে দিল ও মজুরী বাড়িয়ে দিল। এতে করে কাজের সন্তুষ্টি বেড়ে গেল শতগুণে। ফলে কর্মচারীদের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়ে উঠল।[২০]

এই নতুন শিল্পীয় পরিবেশে রবার্ট ওয়েন নামক একজন শিল্পপতি যথেষ্ট অবদান রাখেন। ১৮০০ সাল থেকে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত তিনি নিজের পরিচালিত স্কটল্যান্ডের এক বস্ত্রকলে গবেষণা চালান-যা তখনকার দিনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। শিল্প বিপ্লবের এই যুগে শ্রমিকগণকে যখন যন্ত্রের মত মনে করা হত সেই সময়ে তিনি কারখানায় কার্যপরিবেশের উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি বালক-বালিকাদের কার্যে নিয়োগ বন্ধ করেন। শ্রমিকদের কার্যঘণ্টা হ্রাসের সাথে সাথে তাদের আহার পরিবেশনের ব্যবস্থা করেন, শ্রমিকদের জন্য উৎপাদন খরচায় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করেন এবং কর্মচারীদের জন্য বাসস্থান ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করে কারখানা জীবনকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এতে তার প্রতিষ্ঠানে কার্যাবস্থার অভূতপূর্ব কল্যাণ সাধিত হয়।[২১] এবং ক্রমান্বয়ে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও তাকে অনুসরণ করতে থাকে। একারণে তাকে আধুনিক শ্রমিক-কর্মী ব্যবস্থাপনার জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়।[২২]

১৮৩৫ সালে এন্ড্রু উরে তার The Philosophy of Manufacturers নামক পুস্তকে মানবীয় উপাদান সম্পর্কে মতবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি উৎপাদনের যান্ত্রিক এবং বাণিজ্যিক বিষয়কে স্বীকৃতি দান করেন। এটির তৃতীয় বিষয় হিসেবে মানবীয় উপাদানকে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি শ্রমিকদিগকে গরম চা, ঔষধপত্র এবং চিকিৎসাভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। ফেক্টরীতে বায়ু চলাচলের জন্য তিনি পাখার ব্যবস্থাও করেন।[২৩]

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক এফ্রেডরিউটেলর বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমেরিকার শিল্পসমূহে কাজের প্রতি লোকের আগ্রহ জাগ্রত করেন। তিনি নির্দেশ করেন, কার্যসম্পাদনের জন্য ভাল মেশিনের ব্যবস্থা থাকলে ভাল কার্যসম্পাদিত হতে পারে। টেলরের প্রধান কার্য ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়।[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

১৯২০ এবং ১৯৩০ এর দশকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এলটন মেয়ো এবং এফ.জে. রোথলিসবার্গার কার্যক্ষেত্রে মানবীয় আচরনের ধারণার তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করেন। তারা হথর্ন প্লান্টে দূরদৃষ্টি, সূক্ষচিন্তা এবং সমাজতাত্ত্বিক ধারণার উপর ভিত্তি করে একটি শিল্পীয় জরীপ পরিচালনা করেন, যা 'হথর্ন গবেষণা' নামে পরিচিত। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, সংগঠন হচ্ছে সামাজিক সিস্টেম এবং শ্রমিকগণ এর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।[২৫] এ গবেষণার ফলে দেখা গেল যে, কার্যপরিবেশের উন্নয়ন, ক্লান্তি সময় পরিবর্তন, কার্যদিবস হ্রাস এবং বিভিন্ন ধরনের প্রনোদনামূলক মজুরী প্রথা দ্বারা উৎপাদন প্রভাবিত হয় না।[২৬] এ গবেষণার ফল থেকে প্রমাণীত হয় যে, কর্মক্ষেত্রের প্রাকৃতিক পরিবেশ এর অনুকূল পরিবর্তন বা উন্নয়ন ছাড়াই উন্নত সামাজিক ও মানসিক পরিবেশ সৃষ্টির ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। যেমন-নির্দিষ্ট কর্মীদের অপর্যাপ্ত আলোতে কাজ করেও উজ্জ্বল আলোতে কর্মরত শ্রমিকদের তুলনায় উৎপাদন কম হয়নি। প্রমাণ হয়েছে যে, কর্মবিরতি, কর্মদিন ও কর্ম সপ্তাহের মেয়াদের হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে ধারাবাহিকভাবে উৎপাদন হ্রাস-বৃদ্ধির কোন সম্পর্ক নেই। আরো প্রমাণিত হয় যে, কর্মক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশের নিজস্ব কোন ভূমিকা নেই। সামাজিক উপাদানগুলো এ ব্যাপারে প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে।[২৭]

ম্যাকগ্রেগর তাঁর ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত The Human Side of Enterprise নামক গ্রন্থে 'এক্স' এবং 'ওয়াই' নামক দুটি তত্ত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। 'এক্স' তত্ত্ব হচ্ছে স্বৈরাচারী ব্যবস্থাপকের ধারণা এবং 'ওয়াই' তত্ত্ব হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনার ধারণা। 'ওয়াই' তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মানবীয় দিকের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। এই তত্ত্বটিতে বলা হয়েছে যে, লোকের মধ্যে সুপ্ত মেধা আছে এবং যথোপযুক্ত পরিবেশ পেলে তারা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে মেধার বিকাশ ঘটাতে পারে।[২৮] কাজেই ওয়াই তত্ত্বে কার্য-পরিবেশ উন্নত করার উপর জোর দেয়া হয়েছে।

ভাল আলোর ব্যবস্থা আনন্দ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।[২৯] আলো এবং রঙ একত্রে জোড়া লাগা যমজ শিশুর মত উদ্ভাসিত হয়। তারা একত্রে একটি দলের মত কাজ করে, যা অন্ধকার দূর করতে পারে। একটি ব্যতীত অন্যটির মাধ্যমে কাজের অর্ধেক সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। ভাল উদ্ভাসন ব্যবস্থা অধিকতর উৎপাদন দক্ষতা সৃষ্টি করে, কর্মীর মনোবল বাড়ায়, দুর্ঘটনা হ্রাস করে এবং এর মাধ্যমে ঘরের কাজকর্ম ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়।[৩০] আলো যে কোন

Dhaka University Institutional Repository

কারখানা বা অফিসের জন্য অত্যাবশ্যক। কোন কারখানা বা অফিসে কতটুকু আলোর প্রয়োজন তা নির্ভর করে কার্যের প্রকৃতির উপর। কাজের প্রকৃতির বিভিন্নতা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আলোর তারতম্য হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, কম্পিউটার মেরামত কারখানা বা ঘড়ি সংযোজন শিল্পে সাধারণ অফিস থেকে অধিক আলোর প্রয়োজন হয়।[৩১]

কোলাহলের ফলাফল কারখানা পরিবেশের জন্য নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। অনভিপ্রেত, মাত্রাতিরিক্ত বা বিঘ্ন সৃষ্টিকারী আওয়াজ বা শব্দাদি যা বিভিন্ন কারণে সৃষ্টি হয় তাই-ই কোলাহল। কোলাহল কর্মরত মানুষকে দু'ভাবে প্রভাবিত করে। প্রথমত, উচ্চ শব্দ বা কোলাহলের মধ্যে কাজ করবার ফলে মানুষের কান বিনষ্ট হয়ে শ্রবণ শক্তি রহিত হতে পারে। দ্বিতীয়ত, উচ্চ কোলাহলের মাঝে কাজ করবার ফলে শ্রমিক-কর্মী বা অপারেটরদের কাজের প্রতি একাগ্রতা ক্ষুণ্ন হয়। তাদের কর্মদক্ষতা হ্রাস পায়। কাজের মান কমে যায়। ফলে উৎপাদনের পরিমান ও মান উভয়ই কমে যায়। দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ কোলাহলের মধ্যে কাজ করবার ফলে অথবা, হঠাৎ উচ্চ শব্দস্তরে কাজ করবার ফলে শ্রবণশক্তি রহিত হবার ঘটনা বিরল নয়। কোন্ কোলাহল স্তর সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে এ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞরা একমত যে, ১০০dB-এর অধিক কোলাহলস্তর ক্ষতিকর। এই কারণে ৫০ ফুট দূরত্বে ১৩০ dB শব্দস্তর সৃষ্টিকারী জেট বিমান (ভূমিতে) কর্মরত কারিগর বা কর্মীরা ইঞ্জিনের সন্নিকটে কাজ করার সময় কানে শব্দ নিয়ন্ত্রক পরিধান করে থাকে। অতএব, কর্মস্থলে কোলাহল স্তর ১০০ dB এর অনেক নীচে থাকতে হবে, তা না হলে নানান বিপত্তি ঘটবে। ৮০ dB কোলাহলস্তর সৃষ্টিকারী গড়-পড়তা কারখানাগুলো এই প্রকার কারখানার অন্তর্ভুক্ত বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। অতিরিক্ত কোলাহল শ্রমিক-কর্মী বা অপারেটরদের 'টেনসন' বৃদ্ধি করে যার ফলে তাদের অধিক শক্তি ক্ষয় হয়, অবসাদ বা ক্লান্তি আসে এবং উত্তেজনা ও স্নায়ুবিক দুর্বলতা বেড়ে যায়। কেউ কেউ মনে করেন, সময়ের ব্যবধানে শ্রমিক-কর্মীরা বিপত্তিকর কোলাহলে অভ্যস্ত হয়ে যায়।[৩২] কারও মতে, মনোযোগ নষ্টকারী কোলাহলের প্রভাবের কথা সম্ভবত মানুষের মনে অতিরঞ্জিতভাবে দেখা দিয়েছে।[৩৩] চারজন টাইপিস্টকে কোলাহলমুক্ত ও কোলাহযুক্ত-এ দুই পরিবেশে কাজ করতে দিয়ে তাদের উৎপাদনশীলতার তুলনা করে দেখা হয়েছিল। ফলাফলে দেখা গিয়েছে যে, তাদের ভুলের পরিমাণ, টাইপের

Dhaka University Institutional Repository

পরিমান এবং বাতিলকৃত পত্রের সংখ্যা বিবেচনা করে কোন তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায়নি।[৩৪]

কিন্তু তা সত্ত্বেও, অনেকের মতে এরূপ সময়ের পরও উৎপাদনের পরিমান কমে যেতে দেখা যায়; এবং তা শ্রমিকদের অনুভূতি বা মানসিক যোগ্যতার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, উচ্চ কোলাহল বিশিষ্ট কারখানা-পরিবেশ সর্বদাই অনাকর্ষনীয়। এ অবস্থায় কোম্পানির পক্ষে ভাল শ্রমিক পাওয়া বা ধরে রাখা কঠিন হয়।[৩৫]

আবহাওয়া শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও উৎপাদন ক্ষমতার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। মানুষ কতটুকু দক্ষতার সাথে কাজ করবে তা অনেকটা কারখানার আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। উত্তাপ, আলো-বাতাস, ধোঁয়া, আর্দ্রতা প্রভৃতি কারখানার আবহাওয়ার অন্যতম উপাদান। তাই ইদানিং অধিকাংশ অফিস ও কারখানাগৃহ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হতে দেখা যায়। আবহাওয়া পরিচ্ছন্ন ও অনুকূল বা দূষণমুক্ত রাখার জন্য অনেক অফিসে ধুমপান নিষিদ্ধ করা হয়। এ অবস্থা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সহায়ক হয়। ফলে তারা অধিকতর দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে।[৩৬]

কার্যপরিবেশের নকশাকরণে শ্রমিক-নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু কোন কারখানায় ১০০% নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বাস্তবসম্মত নয়। এরূপ পরিস্থিতি কোন কারখানায় বিদ্যমান থাকতে পারে না। তবে, যুক্তিসম্মত বা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব। বিভিন্ন কারখানায় এর তারতম্য হতে পারে। তাই, এটি একটি আপেক্ষিক বিষয়। তাছাড়া, এ ব্যাপারে ব্যয়ের বিষয়টিও বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। নিরাপত্তা বিধান করা নিঃসন্দেহে ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। গ্রহণযোগ্য বা যুক্তিসম্মত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে ব্যবস্থাপনাকে দুর্ঘটনার হার যথাসম্ভব কমাতে হবে। দুর্ঘটনার পরিমাণ ন্যূনতম পর্যায়ে আনতে পারলে ব্যবস্থাপনার পক্ষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাদি অর্জন করা সম্ভব হবে। দুর্ঘটনার হার কমলে শ্রমিকদের শারিরীক ও মানসিক যন্ত্রণার উপশম হবে। এতে আর্থিক ক্ষতি হ্রাস পাবে। দুর্ঘটনা হ্রাস পেলে নিয়োগকর্তার বীমা খরচ ও ক্ষতিপূরণ ব্যয় কমে যাবে। তাছাড়া, এ অবস্থা কারখানার প্রতি শ্রমিকদের আকৃষ্ট করবে।[৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

দুর্ঘটনা একটি ব্যয়বহুল, ভীতিকর ও ক্ষতিকর মানসিক সমস্যা। দুর্ঘটনার ফলে কর্মীর মৃত্যু হলে তা ঐ ব্যক্তির পরিবারের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। সে যদি আহত বা পঙ্গু হয়ে থাকে পরিবারকে আজীবন সেই ক্ষতির বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে। পারিবারিক লোকসান হয় বিপুল। অভিজ্ঞ কর্মীর মৃত্যু কোম্পানির জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিকর। দুর্ঘটনায় কর্মসময়ের ক্ষতিসাধন হয়। উৎপাদন হ্রাস পায়। ক্ষতিগ্রস্ত বা বিকল হওয়া যন্ত্রপাতি মেরামত করতে খরচ হয়। উপর্যুপরি দুর্ঘটনা কর্মীদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়। এরপর রয়েছে দুর্ঘটনার জন্য কর্মীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া, চিকিৎসার সুবিধাদি দেওয়া। এইভাবে কোম্পানি বিপুল খরচের মধ্যে পড়ে, পরোক্ষভাবে দেশ জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৩৮]

Kerr দেখেছেন দুর্ঘটনার হার বেশি হয় ফ্যাক্টরীর যে সব বিভাগে পদোন্নতির সম্ভাবনা কম থাকে, কর্মচারিরা প্রতিষ্ঠানের ভিতরেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বদলী কম হয় এবং উচ্চ গোলমাল বিরাজ করে। দুর্ঘটনার তীব্রতা অধিক হয় যেখানে পুরুষ কর্মী সংখ্যায় বেশি থাকে, পদোন্নতির সম্ভাবনা কম থাকে, কর্মীরা তারুণ্যদীপ্ত নয় এবং কর্মীদের গড় মেয়াদকাল দীর্ঘ হয়।[৩৯] গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে জানা যায় যে, নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ দুর্ঘটনাকে হ্রাস করে। যারা নতুন কর্মী হিসেবে যোগদান করে তাদের নিরাপত্তার উপর প্রশিক্ষণ দিলে তারা কাজের বিপর্যয়মূলক দিকগুলি সম্পর্কে অবহিত হবে, নিরাপত্তামূলক আচরণ কিভাবে করতে হবে তাও শিখতে পারবে এবং এতে করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হবে। নিরাপত্তা প্রশিক্ষণের ফলে যে দুর্ঘটনা যথেষ্ট হ্রাস পায় তার একটি উদাহরণ দেখিয়েছেন Ewell। Proctor এবং Gamble Company একটি ব্যাপক নিরাপত্তা কর্মসূচি পরিকল্পনা গ্রহণ করে- এর একটি অংশ হচ্ছে নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ। কোম্পানির ২০টি প্ল্যান্টে ২৫ বৎসর ব্যাপী এই কার্যক্রম চলে। ২৫ বৎসরে দুর্ঘটনা নাটকীয়ভাবে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে, অবশ্য এটা সমন্বিত নিরাপত্তা কর্মসূচির ফল (এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল বিপদ কমানোর বিবিধ প্রচেষ্টা, প্রচার, প্রশিক্ষন ইত্যাদি)।[৪০]

দুর্ঘটনা অনেক সময় মানুষ থেকেই উদ্ভুত বলে কর্মের প্রাকৃতিক পরিবেশ কর্মীর জন্য যথোপযুক্ত না হলে তা বিপর্যয় বহন করতে পারে। উদাহরণ-স্বরূপ, সূক্ষ্মধরনের কাজের জন্য পর্যাপ্ত আলো না হলে দুর্ঘটনা সংঘটিত হতে পারে। যন্ত্রপাতির পরিকল্পনাও সঠিক হতে হবে। কর্মপরিবেশ, যন্ত্রপাতি এবং কর্মপদ্ধতিকে নিরাপত্তার দিক থেকে পরিকল্পনা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

আলো হতে হবে পর্যাপ্ত, তাপ হতে হবে স্বস্তিকর। যন্ত্রপাতির উন্নত পরিকল্পনার সাথে সাথে এর রক্ষণাবেক্ষণও হতে হবে যথাযথ যাতে সেগুলি ঠিকমতো চলে। কর্মস্থল নিয়মিত ধোয়ামোছা হলে কর্মী দুর্ঘটনায় নাও পতিত হতে পারে। নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামও যথারীতি থাকতে হবে যেমন ফার্স্ট এইড যন্ত্রপাতি, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ইত্যাদি। এমনকি সেফটি এইডস এর পরিকল্পনাও মানবিক প্রকৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে হওয়া বাঞ্চনীয়। যে সব কাজ ঝুঁকিপূর্ণ সেগুলি যতটা সম্ভব কম ঝুঁকিপূর্ণ করে পরিকল্পনা করা উচিত। ডিসপ্লের ডিজাইন এমন হতে হবে যেমন মানুষ তাড়াতাড়ি সঠিক তথ্য নিতে পারে এবং কন্ট্রোলের ডিজাইনও এমন হতে হবে যাতে মানুষ সহজে ও দ্রুতগতিতে মেশিন পরিচালনা করতে পারে। যে কন্ট্রোল পরিচালনা করতে গেলে জোর জবরদস্তি লাগে, সহজে হাতের নাগালে পাওয়া যায় না, সেখানে দুর্ঘটনা ঘটা আশ্চর্য নয়।[৪১]

শ্রমিক-কর্মীর দক্ষতা ঠিক রাখার জন্য এবং নির্দিষ্ট মানের কাজ সম্পাদনে তার অবসাদ না আসার জন্য উপযুক্ত মানের ও সুস্থ কারখানা বা কাজের পরিবেশের প্রয়োজন। সুস্থ কারখানার পরিবেশের উপর শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও দক্ষতা নির্ভর করে যা উৎপাদন দক্ষতা অর্জনের সহায়ক। সুতরাং কারখানার অভ্যন্তরে যাতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারে, চলাফেরার জন্য পর্যাপ্ত জায়গার ব্যবস্থা থাকে, শ্রমিকদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকে এবং কারখানার ভিতর বা বাইরে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় থাকে সেদিকে ব্যবস্থাপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। উন্নত মানের কারখানা-পরিবেশ শ্রমিকদের দৈহিক ও মানসিক বল এবং তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে যা উৎপাদনের মান ও পরিমান বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।[৪২]

সুতরাং কার্যসন্তুষ্টি, প্রেষণার পরিবেশ সৃষ্টি তথা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কার্যপরিবেশের প্রভাব অপরিসীম।

১.২ সমস্যার বিবরণ

বাংলাদেশে অসংখ্য ক্ষুদ্রশিল্প ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বিসিক কর্তৃক নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত শিল্পসমূহ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের অধিকাংশ ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান নানা কারণে আজ লোকসানের সম্মুখীন হয়ে কারখানা/শিল্প প্রতিষ্ঠান গুটিয়ে নিচ্ছে। স্বদেশী পণ্য বিদেশী পণ্যের কাছে মার খাচ্ছে। উৎপাদনশীলতা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এর জন্য মূলত দায়ী অনুন্নত

Dhaka University Institutional Repository

কার্যপরিবেশ। কার্যপরিবেশ উন্নয়নের জন্য কারখানা আইন ও বিধিমালা থাকলেও বাস্তবে তা কতটুকু পালন করা হচ্ছে তা আজ বিরাট প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। আলোচ্য গবেষণার মাধ্যমে ঢাকা শহরে বিদ্যমান বিভিন্ন ক্ষুদ্রশিল্পের কার্যপরিবেশ অবহিত হয়ে তা বিস্তারিত বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই গবেষণা চালানো হয়েছে–

১. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিবেশ সম্পর্কে অবগত হওয়া।

২. কারখানা আইন ও বিধিমালা মোতাবেক আইনানুগ কার্যপরিবেশের সাথে প্রকৃত কার্যপরিবেশের তুলনা করা।

৩. আইনানুগ ও আদর্শ কার্যপরিবেশের সাথে এর বিচ্যুতি চিহ্নিতকরণ।

৪. পরিবেশ কিভাবে উন্নত করা যায় তার পদক্ষেপ সুপারিশ করা।

১.৪ তথ্য সংগ্রহের সাথে সংশ্লিষ্ট উপাদানসমূহ

কারখানা আইন ও বিধিমালায় বর্ণিত নিম্নোক্ত উপাদানসমূহের সাথে কার্যপরিবেশের সম্পর্ক রয়েছে বিধায় সেগুলোকে তথ্য সংগ্রহের সাথে সংশ্লিষ্ট উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

ক. শ্রমিক কর্মচারীদের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সুবিধা, যথা-

১. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।

২. আবর্জনা ও দূষিত তরল পদার্থের অপসারণ।

৩. বায়ু চলাচল ও তাপামাত্রা।

৪. ধুলা ও ধোঁয়া।

৫. কৃত্রিম আর্দ্রকরণ।

৬. অতিরিক্ত ভিড়।

৭. আলোর ব্যবস্থা।

৮. খাবার পানি।

৯. পায়খানা ও প্রস্রাবখানা।

১০. পিকদানি।

Dhaka University Institutional Repository

খ. কারখানার নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থা, যথা–

১. আগুনের ক্ষেত্রে সাবধানতা।

২. যন্ত্রপাতি ঘেরিয়ে রাখা বা বেড়া দেওয়া।

৩. চলমান যন্ত্র বা যন্ত্রের নিকটে কাজ করা।

৪. বিপদজনক যন্ত্রে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের নিয়োগ না দেয়া।

৫. মেঝে, সিঁড়ি ও চলাচল পথ সুগম করা।

৬. গর্ত, সাম্পস, মেঝের সুরঙ্গপথ ইত্যাদি।

৭. ত্রুটিপূর্ণ অংশের তথ্যাদির তলব অথবা স্থায়ীত্ব পরীক্ষা করার ক্ষমতা।

৮. বিপদজনক বাষ্পের বিরুদ্ধে সাবধানতা।

৯. বিস্ফোরক বা দাহ্যধুলা, গ্যাস ইত্যাদি থেকে নিরাপত্তা ও অন্যান্য।

গ. শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কিত ব্যবস্থা–

১. ধৌতকরণের সুযোগ সুবিধা।

২. প্রাথমিক চিকিৎসার উপকরণসমূহ।

৩. ক্যানটিন।

৪. আশ্রয় ইত্যাদি।

৫. শিশুদের জন্য কামরা।

ঘ. অন্যান্য অবস্থা, যথা–

১. সাপ্তাহিক কার্যঘন্টা সংক্রান্ত বিধান।

২. ক্ষতিপূরণমূলক সাপ্তাহিক ছুটি।

৩. বিশ্রাম বা আহারের বিরতি।

৪. কাজের সময়ের ব্যাপ্তি।

৫. রাত্রির পালা।

৬. প্রাপ্ত বয়স্ক ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক লোক নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যবস্থা ইত্যাদি।[৪৩]

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি

শিল্পনীতি- ১৯৯৯তে প্রদত্ত সংজ্ঞা আলোচ্য গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে। উক্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ক্ষুদ্র শিল্প বলতে বুঝায় সে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান যেখানে ৫০ জনেরও কম শ্রমিক কাজ

Dhaka University Institutional Repository

করে ।[৪৪] গবেষণায় কিছু তথ্য প্রাথমিক উৎস এবং কিছু তথ্য মাধ্যমিক উৎস থেকে নেয়া হয়েছে। শুধুমাত্র বিসিক কর্তৃক নিবন্ধিত ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানকে গবেষণার জন্য বিবেচনা করা হয়েছে। অনিবন্ধিত ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানকে আলোচ্য গবেষণায় বাদ দেয়া হয়েছে। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বিসিকের হিসাব মোতাবেক বাংলাদেশে সর্বমোট ৪৭,৭০৬টি নিবন্ধিত ক্ষুদ্রশিল্পের ইউনিট রয়েছে। ঢাকা বিভাগে ১৪,৫৬৫টি এবং ঢাকা জেলায় ৫১১৯টি ক্ষুদ্রশিল্পের ইউনিট রয়েছে। সারা দেশে অসংখ্য ক্ষুদ্রশিল্প অনিবন্ধিত অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বিসিক কর্তৃক নিবন্ধিত ক্ষুদ্রশিল্পের সংখ্যা অতি নগণ্য। বিভিন্ন ক্ষুদ্রশিল্পখাতের নামসমূহ নিম্নরূপঃ[৪৫]

সারণী-১

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্পখাতসমূহের নাম

ক্রমিক নং	শিল্প খাতের নাম
১	খাদ্য ও খাদ্যজাত শিল্প
২	বস্ত্র শিল্প
৩	পাট ও পাটজাত শিল্প
৪	বন ও বনজাত শিল্প
৫	পেপার, বোর্ড, প্রিন্টিং পাবলিশিং এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাষ্ট্রি
৬	টেনারী, লেদার এন্ড রাবার প্রডাক্টস
৭	রসায়ন শিল্প
৮	গ্লাস সিরামিক
৯	প্রকৌশল শিল্প
১০	ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাষ্ট্রিজ
১১	সার্ভিস ইন্ডাষ্ট্রিজ
১২	বিবিধ শিল্প
১৩	শ্রেণীবিন্যাসহীন শিল্প

বিসিকের সংজ্ঞা অনুযায়ী বাংলাদেশের ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানকে ১৩টি শিল্প খাতে (সারণী-১) বিভক্ত করা হয়েছে। ১৩টি শিল্পখাতের মধ্য থেকে ৩টি শিল্পখাতকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নমুনায় আনা হয়েছে। উক্ত ৩টি শিল্পখাতের মধ্য থেকে আবার ঢাকা কেন্দ্রীক ২০টি ক্ষুদ্রশিল্পকে

Dhaka University Institutional Repository

দৈবচেতভাবে বাছাই করা হয়েছে। গবেষণার কার্যকাল ছিল ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সাল। অনুসন্ধানকালে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও একজন শ্রমিককে নমুনা হিসেবে ধরা হয়েছে। গবেষণার জন্য সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে সাক্ষাৎকারের চেয়েও সঠিক ও নির্ভুল তথ্য সংগ্রহের কথা চিন্তা করে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারের জন্য একটি পূর্ব প্রস্তুত প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণা প্রস্তাবনায় উন্মুক্ত ও বদ্ধ প্রশ্নমালা প্রণয়নের কথা বলা হলেও জরিপকালে শুধুমাত্র উন্মুক্ত প্রশ্নমালা ব্যবহৃত হয়েছে। উত্তরদাতাদের কাছ থেকে সঠিক উত্তর প্রাপ্তির আশায় বদ্ধ প্রশ্নমালা বিবেচনায় আনা হয়নি।

তাছাড়া ব্যক্তিগত/অনানুষ্ঠানিক জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমেও তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার প্রথম থেকেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিসিক কর্তৃপক্ষের সাথে ব্যক্তিগত আলোচনা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের পরিদর্শক ও কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা, বিভিন্ন প্রকাশনা, বই, জার্নাল, রিপোর্ট, থিসিস, পত্রিকা, ম্যানুয়েল ইত্যাদি থেকে প্রয়োজনীয় উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। চূড়ান্ত প্রশ্নপত্র প্রণয়নের পূর্বে খসড়া প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ৩টি নির্বাচিত ক্ষুদ্রশিল্পের উপর পাইলট জরিপ চালানো হয়েছে। ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ জানতে পুরোনো ঢাকার সুত্রাপুর ও লালবাগ থানা এবং নতুন ঢাকার ধানমন্ডি থানা, মিরপুর থানা, তেঁজগাও থানা, রমনা থানা ও সবুজবাগ থানায় অবস্থিত বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্পের উপর জরিপ চালানো হয়েছে। উপযুক্ত পরিসংখ্যান পদ্ধতি ব্যবহার করে সংগৃহিত উপাত্ত ও তথ্য শ্রেণীবদ্ধকরণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিম্নে সারণীর মাধ্যমে জরিপকৃত ক্ষুদ্রশিল্পসমূহের প্রকৃতি ও অবস্থান দেখানো হল।[৪৬]

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-২

জরিপকৃত ক্ষুদ্রশিল্পসমূহের প্রকৃতি ও অবস্থান

ক্রমিক নং	শ্রেণী বিভাগ	নাম/ঠিকানা
১	খাদ্য শিল্প (বেকারী এন্ড বিস্কুট ফেক্টরী)	এ্যাপেলো ব্রেড এন্ড বিস্কুট ফেক্টরী, সমিতি বাজার পূর্বনাখালপাড়া, তেঁজগাও শিল্প এলাকা, ঢাকা।
২	খাদ্য শিল্প (বেকারী এন্ড বিস্কুট ফেক্টরী)	আয়ুব বেকারী, সেকশন-১০, মিরপুর, ঢাকা।
৩	খাদ্য শিল্প (বেকারী এন্ড বিস্কুট ফেক্টরী)	মেসার্স বিসমিল্লাহ ব্রেড এন্ড বিস্কুট ফেক্টরী, ৯ সমিতি বাজার, পূর্বনাখাল পাড়া, তেঁজগাও, ঢাকা।
৪	খাদ্য শিল্প (বেকারী এন্ড সুইট মিট)	নাজ চানাচুর এন্ড সুইটমিট, ১৮/১, বনগ্রাম রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০।
৫	খাদ্য শিল্প (বেকারী এন্ড বিস্কুট ফেক্টরী)	ইউসুফ বেকারী, ৫৯/৩, পূর্ববাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা।
৬	খাদ্য শিল্প (বেকারী এন্ড বিস্কুট ফেক্টরী)	মেসার্স রানা ব্রেড এন্ড বিস্কুট ফেক্টরী, ৮৩/এ, হাজারীবাগ, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৭	খাদ্য শিল্প (বেকারী এন্ড বিস্কুট ফেক্টরী)	ফরীদা ব্রেড এন্ড বিস্কুট ফেক্টরী, রোড-১১, মিরপুর-৩, ঢাকা।
৮	বস্ত্র শিল্প (সিল্ক শাড়ি কারখানা)	রোকসানা সিল্ক ইন্ডাষ্ট্রিজ, সেকশন-১০, ব্লক-এ, লেন-১০, বাসা-৪, মিরপুর, ঢাকা।
৯	বস্ত্র শিল্প (সিল্ক শাড়ি কারখানা)	লতিফ সিল্ক ইন্ডাষ্ট্রিজ, সেকশন-১০, রোড-৬, বাসা-২৭, মিরপুর, ঢাকা
১০	বস্ত্র শিল্প (সিল্ক শাড়ি কারখানা)	আমির সিল্ক ইন্ডাষ্ট্রিজ ১০/এ, রোড-৪, প্লট-১৫/২, সেকশন-১০, মিরপুর, ঢাকা।
১১	বস্ত্র শিল্প (বেনারসি শাড়ি কারখানা)	পাই সঙ্গ শাড়ি, সেকশন-১০, ব্লক-এ, রোড-৮, মিরপুর, ঢাকা।
১২	বস্ত্র শিল্প (কাতান শাড়ি কারখানা)	দিয়া কাতান শাড়ি, ৭/১০, ব্লক-এ, সেকশন-১০, মিরপুর, ঢাকা।
১৩	বস্ত্র শিল্প (গার্মেন্টস লেবেল ছাপাখানা)	মেসার্স লেবেলম্যান, ১২৩, কাকরাইল রোড, রমনা, ঢাকা।
১৪	বস্ত্র শিল্প (সুয়েটার কারখানা)	মেসার্স মেহার ট্রেডার্স, ৬২, চানখারপুল লেন, লালবাগ, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

১৫	ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা	মেঘনা ইঞ্জিনিয়ারিং, ৭৩, লালমোহনসাহা স্ট্রীট, সুত্রাপুর, ঢাকা।
১৬	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং	ব্রাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, ২২, তাহেরবাগ লেন, সুত্রাপুর, ঢাকা।
১৭	ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা	বিনিময় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, ১০/১, জোরপুর লেন, ধোলাইখাল, সুত্রাপুর, ঢাকা।
১৮	ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা	সুইস ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, ৩৪, টিপুসুলতান রোড, সুত্রাপুর, ঢাকা।
১৯	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং	শাকিল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, ১২, ফোল্ডার স্ট্রীট ওয়ারী, সুত্রাপুর, ঢাকা।
২০	ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা	মেসার্স মুসলিম এলুমিনিয়াম ইন্ডাষ্ট্রিজ, ৩৪, নবেন্দ্রনাথ বসাকলেন, সুত্রাপুর, ঢাকা।

সারণী-২ এ দেখা যাচ্ছে জরিপকৃত ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ৭টি খাদ্যশিল্প, ৭টি বস্ত্রশিল্প, ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প এবং ২টি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প। খাদ্যশিল্পসমূহ তেঁজগাও, মিরপুর, সুত্রাপুর, সবুজবাগ ও ধানমন্ডি থানায় অবস্থিত। বস্ত্রশিল্পসমূহ মিরপুর, রমনা ও লালবাগ থানায় অবস্থিত। ইঞ্জিনিয়ারিং ও লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পসমূহ সূত্রাপুর থানায় অবস্থিত। যে ৩টি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর পাইলট জরিপ চালানো হয়েছে তা সারণীর মাধ্যমে দেখানো হল।[৪৭]

সারণী-৩

পাইলট জরিপকৃত ক্ষুদ্রশিল্পসমূহের প্রকৃতি ও অবস্থান

ক্রমিক নং	শ্রেণী বিভাগ	নাম ও ঠিকানা
১	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং	এম আর ইঞ্জিনিয়ারিং, ১৮, র‍্যাঙ্কিন স্ট্রীট ওয়ারী, সূত্রাপুর, ঢাকা।
২	খাদ্য শিল্প (রেস্টুরেন্ট)	মেসার্স লাটিমী ফুড প্রডাক্টস, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৩	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং	মকবুল বাবার ওয়ার্কস, ২০/২১, বনগ্রাম লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৩ এ দেখা যাচ্ছে যে, ২টি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ও ১টি খাদ্য শিল্পের উপর পাইলট জরিপ চালানো হয়েছে। তার মধ্যে ২টি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প সুত্রাপুর থানায় এবং ১টি খাদ্য শিল্প ধানমন্ডি থানায় অবস্থিত।

নমুনা নির্বাচনে যে সকল পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় তা এ জরিপে প্রয়োগ করলে জরিপের বিশ্বস্ততা আরো বৃদ্ধি পেতো। সময় ও আর্থিক স্বল্পতার কারণে উদ্দেশ্যমূলক নমুনা পদ্ধতি বেছে নেয়া হয়েছে। খাদ্য, বস্ত্র ও প্রকৌশল শিল্পের সংখ্যা ঢাকা শহরে বেশি থাকায় এবং অন্যান্য শিল্পখাতের বেশিরভাগ ঢাকার বাইরে অবস্থিত হওয়ার কারণে উক্ত ৩টি শিল্পখাতকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এবং ৩টি শিল্পখাতের মধ্য হতে ঢাকা কেন্দ্রীক ২০টি শিল্পকে দৈবচৈতভাবে বাছাই করা হয়েছে। পাইলট জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলে অধিক সংখ্যক উত্তরদাতাগণের সাক্ষাৎকার প্রদানে অনীহার কথা বিবেচনা করে অধিক সংখ্যক উত্তরদাতাকে নমুনায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

১.৬ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান বলতে কি বোঝায় তার সঠিক সংজ্ঞা সুস্পষ্ট নয়। তাই সংজ্ঞার বিড়ম্বনার কারণে গবেষণাকর্ম পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়নি। জরিপ করার জন্য নির্ধারিত অনেক ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায়নি। ভাড়া করা বাড়িতে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কারণে স্থানান্তর, অর্থাভাবে ও দেনায় জর্জরিত হয়ে কিছু প্রতিষ্ঠান গুটিয়ে ফেলার কারণে এসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কোন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব না হওয়ায় নতুন নতুন ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানকে নমুনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অথচ ঐ সকল প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হলে জরিপের বিশ্বস্ততা আরো বৃদ্ধি পেতো। আর্থিক ও সময়ের স্বল্পতার কারণে অধিক সংখ্যক ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানকে নমুনায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। কতিপয় প্রতিষ্ঠানে নমুনায়িত ব্যক্তিদের সহযোগিতার অভাবে জরিপ কাজ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। কিছু প্রতিষ্ঠান সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণে বাধা প্রদানকরায় নতুন প্রতিষ্ঠানকে নমুনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণার বিষয়ে অতীতে ব্যাপকভাবে কোন গবেষণা না হওয়ায় এবং গবেষণা সংশ্লিষ্ট যথেষ্ট বইপত্রের অভাব থাকায় গবেষণা কর্ম পরিপূর্ণ হয়নি। সকল শিল্পের জন্য অভিন্ন আইন বিদ্যমান থাকার কারণে গবেষণাকর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তরের কতিপয় কর্মকর্তা গোপনীয়তার দোহাই দিয়ে সাক্ষাৎকার প্রদান করেননি।

সর্বোপরি বিভিন্ন সমস্যার কারণে এবং অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে নমুনায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব না হওয়ায় গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল সামগ্রিকভাবে বিষয়টিকে প্রতিফলিত করেছে কি-না তা সাধারণী করা সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. লতিফুর রহমান, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, ১ম সংস্করণ, রয়েল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৪০৬।

২. Maier, N.R.F., Psychology in Industry, 3rd Edition, Oxford and IBH Publishing Co., New Delhi-Calcutta, p. 615.

৩. ক্লড এস জর্জ, জুনিয়র, ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার ইতিহাস, ১ম সংস্করণ, (অনুবাদ) পেপার প্রসেসিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৫৩।

৪. ঐ, পৃ. ২৫৩।

৫. ঐ, পৃ. ২৫৪।

৬. ঐ, পৃ. ২৫৫।

৭. ঐ, পৃ. ২৫৫।

৮. Haque, A. B. M. Jahirul, "Quality of Working life of Industrial workers in Bangladesh", Psychology in South Asia, Shakil Prokashoni, Dhaka, 1996, P. 164.

৯. মোঃ আতাউর রহমান ও নজরুল ইসলাম, সাংগঠনিক আচরণ, ২য় সংস্করণ, উত্তরা পাবলিককেশন্স, নাটোর, ১৯৯৬, পৃ. ৬৪।

১০. ঐ, পৃ. ৬৭।

১১. ১১. মোঃ হাবিবুল্লাহ, সাংগঠনিক ব্যবহার ও শিল্প মনোবিজ্ঞান, ৩য় সংস্করণ, ছাত্রবন্ধু পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২৮৭।

১২. আবদুল খালেক, শিল্পমনোবিজ্ঞান, ১ম সংস্করণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২০০।

১৩. ঐ, পৃ. ২০৩।

১৪. ঐ, পৃ. ২০৪।

১৫. ঐ, পৃ. ২০৪।

১৬. Hossain, M. and others, Job satisfaction of Garment workers : A Case study on selected Factories in Narayanganj, Islamic University studies, Volume 4, No-1, 1995, p. 50.

১৭. Likert, Rensis, The Human organization : Its Management and value, McGraw-Hill Book Co., New york, 1967, P.3

Dhaka University Institutional Repository

১৮. মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, সাংগঠনিক ব্যবহার ও শিল্পমনোবিজ্ঞান, ৩য় সংস্করণ, ছাত্রবন্ধু পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২০৫।

১৯. Davis, K. Human Behavior at Work, 5th Edition, Tata Mc Graw-Hill Publishing Co., New Delhi, 1977. P.8.

২০. ঐ, পৃ. ৮।

২১. ঐ, পৃ. ৮।

২২. Frankel, Leek and Fleisher, Alexander. The Human Factor in Industry, The Macmillan Company, New York, 1920. P.8.

২৩. Ure, Andrew. The Philosophy of Manufacturers, Charles Knight, London, 1835.

২৪. Taylor, F.W., The Principles of Scientific Management, Harper and Brothers, Newyork, 1911.

২৫. Mayo, Elton, The Human Problems of an Industrial Civilization, Mass : Harvard university press, Boston, 1933.

২৬. আবদুল আউয়াল খান ও অন্যান্য, ব্যবস্থাপনা, আবীর পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১।

২৭. নেসার আহমেদ, শিল্পমনোবিজ্ঞান, ১ম সংস্করণ, তানিম প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১৯৭ ও ১৯৮।

২৮. মোঃ আতাউর রহমান ও নজরুল ইসলাম, সাংগঠনিক আচরণ, ২য় সংস্করণ, উত্তরা পাবলিককেশন্স, নাটোর, ১৯৯৫, পৃ. ৪।

২৯. Ferree, C.E., and Rand, G. Good working Conditions for Eyes. Personnel J., 1937, P. 333.

৩০. Bethel Lawrence L., and others, Industrial Organization and Management, Fourth Edition, McGraw-Hill Book Company, Newyork, 1979, P. 181.

৩১. শফিকুর রহমান, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, ১ম সংস্করণ, রয়েল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৪০৭।

৩২. ঐ, পৃ. ৪০৭।

Dhaka University Institutional Repository

৩৩. Kidd, J. S., Line Noise and Man-machine System Performance. J. Engr. Psychol, 1962, p. 13.

৩৪. Kornhauser, A. W., The effects of Noise on Office Output. Indust. Psychol, 1927 p. 621.

৩৫. লতিফুর রহমান, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, ১ম সংস্করণ, রয়েল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৪০৭।

৩৬. ঐ, পৃ. ৪০৮।

৩৭. ঐ, পৃ. ৪০৮।

৩৮. রওশন জাহান, শিল্পে মনোবিজ্ঞান ঃ কর্মবিজ্ঞান, ১ম সংস্করণ, আমাদের বাংলা প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ২৪৮ ও ২৪৯।

৩৯. Kerr, W. A., Accident Proneness in Factory Departments, Journal of Applied Psychology, 1950 p. 167.

৪০. Ewell, J. M., 1955, Ayard Stick for `56 Proctor and Gamble Safety Bulletin, January, 1956.

৪১. রওশন জাহান, শিল্পে মনোবিজ্ঞান ঃ কর্মবিজ্ঞান, ১ম সংস্করণ, আমাদের বাংলাপ্রেস লিঃ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ২৭৬ ও ২৭৭।

৪২. লতিফুর রহমান, কারবারের ব্যবস্থাপনা, ১০ম সংস্করণ, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৫৯৪।

৪৩. কাজী ফারুকী ও অন্যান্য, বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন, ৩য় সংস্করণ, কাজী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৬১৯-৬৩৫।

৪৪. শিল্পমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিল্পনীতি-১৯৯৯, ঢাকা, পৃ. ৬।

৪৫. বিসিক সম্প্রসারণ বিভাগ, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

৪৬. ঐ।

৪৭. ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-২

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-২

ক্ষুদ্রশিল্প ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের পর্যালোচনা

শিল্প উৎপাদনের বাহন। যে কর্মপ্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়ার দ্বারা বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য আহরণ করা হয় এবং এর পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী করা হয় তাকেই শিল্প বলা হয়। অর্থাৎ প্রকৃতি প্রদত্ত পদার্থকে রূপান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করার সাথেই শিল্প সম্পর্কিত। শিল্পনীতি ১৯৯৯তে বলা হয়েছে, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংযোজন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ পণ্যের মেরামত পুনঃসংস্কার সাধন প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। এতে আরও বলা হয়েছে ব্যাপক অর্থে প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও সেবা শিল্প এই দু'ধরনের শিল্পই শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংজ্ঞায়িত।[১]

২.১ বাংলাদেশের শিল্পের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ

বাংলাদেশের শিল্পের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে চারটি ধারায় তা বিশ্লেষণ অত্যাবশ্যক। এ চারটি ধাপ হল, মুগল আমল, বৃটিশ আমল, পাকিস্তান আমল ও বাংলাদেশ আমল।

স্বাধীন সুলতান আমলে বাংলাদেশ শিল্প সমৃদ্ধ ছিল। মুগলশাসনকালে তা আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। মুগলপূর্বযুগে পর্তুগীজ বাংলায় একমাত্র ইউরোপীয় বণিক ছিল। মুগল যুগে ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী বণিকরা এই প্রদেশের বাণিজ্যে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। এটির উদ্বৃত্ত শিল্পজাত দ্রব্য ব্যাপকভাবে বিদেশে রপ্তানি হয় এবং এটির প্রচুর অর্থাগম হয়। ব্যাপক রপ্তানী বাণিজ্যের ফলে বাংলার শিল্পের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়।[২]

চৈনিক দূতগণ বাংলার সুতীবস্ত্র বয়নের উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন এবং এ প্রদেশে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের সুতীবস্ত্রের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। তারা ছ'প্রকারের সুতীবস্ত্রের উল্লেখ করেছেন। ১. 'পি-পো' নামে বিভিন্ন রঙের এক প্রকার কাপড় ছিল। এটা প্রস্থে ছিল দু থেকে

Dhaka University Institutional Repository

তিন ফুট এবং দৈর্ঘ্যে ছিল ছাপ্পান্ন ইঞ্চি। এই বস্ত্র খুবই সূক্ষ্ম এবং মিহিন ছিল। ২. চারফুট বা তারও অধিক চওড়া এবং পঞ্চাশফুট লম্বা 'মান-চে-তি' ছিল আদার রঙের মত হলদে বস্ত্র। এ কাপড় খুব ঠাসা বুনান ও মজবুত ছিল। ৩. 'শাহ-না-কিয়ে' (শাহ-না-পা-ফু) নামক বস্ত্র ছিল পাঁচফুট প্রশস্ত ও বিশফুট লম্বা এবং চীনা কাপড় 'লু-পু' (শেঙ্গ-লো) কাপড়ের অনুরূপ ছিল। ৪. তিনফুট প্রশস্ত ও ষাট ফুট লম্বা এক প্রকার বস্ত্রের বিদেশী নাম ছিল 'হিন-পেইটাঙ্গ-টা-লি' (ফি-পাই-লাই-টালি)। এটা ছিল মোটা ধরনের কাপড়। ৫. 'শা-তা-হউল' ছিল দু'রকমের; একটির মাপ ছিল প্রস্থে পাঁচ ইঞ্চি ও দৈর্ঘ্যে চল্লিশ ফুট এবং অন্যটি ছিল আড়াইফুট প্রস্থ ও চারফুট লম্বা। এটি চীনা 'সান-সো' বস্ত্রের অনুরূপ ছিল। ৬. 'মা-হেই-মালি' বস্ত্র তৈরি হ'ত বিশ বা ততোধিক ফুট দৈর্ঘ্যে এবং চারফুট প্রস্থে। এর একদিকে আধ ইঞ্চি লম্বা আবরন ছিল। এটি দেখতে চীনা 'তুলো-ফিয়া' বস্ত্রের মত ছিল।[৩]

বাংলার বয়ন শিল্প প্রসঙ্গে বারবোস বলেন, 'এদেশে প্রচুর সুতা আছে। তারা সুক্ষ্ম ও মিহিন অনেক প্রকারের বস্ত্র তৈরি করে; এসব বস্ত্র তারা নিজেদের ব্যবহারের জন্য রঙ্গিন করে এবং ব্যবসায়ের জন্য সাদা রাখে। এগুলো খুবই মূল্যবান কাপড়। কিছু বস্ত্রকে তারা 'ইসত্রাভানতিশ' (estraventes) বলে; এটা এক বিশেষ ধরনের অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাপড় যা' আমাদের মধ্যে মহিলারা শিরোভূষণের জন্যে এবং মূর, আরব ও ইরানীরা পাগড়ির জন্য খুবই পছন্দ করেন। অন্যান্য যে সব কাপড় তারা তৈরি করে সেগুলো 'মামুনা' 'দুগুয়াজা' 'চৌতারী' এবং 'সিনাবাফা' নামে পরিচিত ছিল। সিনাবাফা সর্বোৎকৃষ্ট কাপড় বলে মনে করা হয়।[৪]

উত্তম শ্রেণীর বস্ত্রের কথা বলতে গিয়ে বারথেমা, 'বৈরাম', 'নামোনী', 'লিজাতি', 'কায়েনতার', দত্তজার' এবং 'সিনাবাফের' উল্লেখ করেছেন। বাংলার মত এত বেশি সুতীবস্ত্রের প্রাচুর্য তিনি পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখেননি বলে মন্তব্য করেন।[৫]

বাংলাদেশে 'মসলিন' নামে পরিচিত সবচেয়ে উত্তমমানের সুক্ষ্ম সুতীবস্ত্র তৈরি হত। আমির খসরু বাংলার এই বস্ত্র তৈরির উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'এ বস্ত্র এত বেশি সুক্ষ্ম ও মিহিন ছিল যে, এর একশত গজ কাপড় মাথায় জড়ানোর পরেও তার ভেতর দিয়ে মাথার চুল দেখা যেতো।' তিনি আরো লক্ষ্য করেন যে, এ কাপড়ের পুরো একখন্ড একজন তার নখের মধ্যে ধারন করতে পারত; অথচ যখন এর ভাঁজগুলো খোলা হ'ত তখন এটি দ্বারা পৃথিবী আবৃত করা যেত।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

আবুল ফজলের বর্ণনায় আমির খসরুর উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, 'সোনারগাঁও সরকারে এক প্রকার মিহিন মসলিন প্রচুর পরিমানে প্রস্তুত হয়। এগারসিন্ধু শহরে একটি বড় পুকুর আছে। এই পুকুরে ধোয়া কাপড় খুব চমৎকার সাদা হয়।' তিনি আরো বলেন যে, বারবাকাবাদ সরকারের (রাজশাহী, দক্ষিণ বগুড়া ও দক্ষিণ পূর্ব মালদাহ) গঙ্গাজল নামে এক রকম খুব মিহিন কাপড় তৈরি হয়।[৭]

মোগল আমলে মসলিনের স্বর্ণযুগ হলেও বাংলাদেশের বয়নশিল্পের বুনিয়াদ গড়া হয়েছিল হাজার হাজার বছর আগে। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের দিকে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ক্ষোম, দুকূল, পত্রোনা ও কার্পাসিক বস্ত্রের উল্লেখ আছে। এর মধ্যে কার্পাসিক সুতীবস্ত্র দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে তৈরি হতো। বার্ডউড তার ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস অব ইন্ডিয়া গ্রন্থে মসলিনকে সোলেমানের পর্দার মত লাবণ্যময় ও মুনসংহিতার চাইতে প্রাচীনরতর বলে অভিহিত করেন। কম করে দু'হাজার বছর থেকে এই মসলিন বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে প্রচলিত হয়ে আসছে।[৮]

বেইন্স তাঁর 'কটন ম্যানফ্যাকচার অফ গ্রেট ব্রিটেন' গ্রন্থে মন্তব্য করেন ঃ অনেকে সত্যিই মনে করত যে, ঢাকাই মসলিন জিন পরীদের মত অশরীরী জীবেরাই তৈরি করত। আর একটু অগ্রসর হলে মনে হবে যে অশরীরী আত্মা যেন ভর করেছে। জেমস টেলারের 'টপগ্রাফী অব ঢাকা' (১৮৪০) ও উইলিয়াম বোল্টের 'কনসিডারেশন অব ইন্ডিয়ান এফেয়ার্স' (১৭৭৮) গ্রন্থে যথাক্রমে সম্রাট জাহাঙ্গির ও আওরঙ্গজেবের জন্য ৫ গজ লম্বা ও একগজ প্রস্থ আবরোঁয়া মসলিন বয়নের উল্লেখ আছে, যার মূল্য ৪০০ টাকা করে। আবরোঁয়া সুক্ষ্ম সুতী মসলিন, সোনারূপার কাজ করা কিংখাব বা গোলাবতন নয়। তাহলে ১০ হাতী একটা সুতী কাপড়ের থানের দাম আজকাল দরে দাঁড়ায় ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা। ইউরোপীয়রা যাকে বলত মসলিন, এদেশের ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠতম স্মারক, মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বাংলাদেশের এক অনন্য অবদান। দুঃখের বিষয় স্বচক্ষে কিংবা ক্যামেরা দিয়ে দেখার মত এই লুপ্ত শিল্পের আজ আর কিছু অবশিষ্ট নেই।[৯]

সুতরাং বলা যায়, এককালে এদেশ কুটির শিল্পে সমৃদ্ধ ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর বৃটিশ বনিকগণ বৃটিশ সরকারের আনুকূল্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য বিস্তৃত এলাকা দখল করে বসে এবং বৃটিশ সরকারের সহায়তায় এখানকার ছোট ছোট শিল্পগুলো ধ্বংস করার যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে। এই উপমহাদেশের শিল্পগুলোকে বিলেতে ৮১% হিসেবে আমদানি শুল্ক

Dhaka University Institutional Repository

দিতে হত, অথচ বিলেতী মাল এখানে বিনা শুল্কে অথবা মাত্র আড়াই শতাংশ শুল্কে আমদানি করতে দেয়া হত। ঐতিহাসিক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার বলেন, 'যদি ভারতীয় দ্রব্যগুলোর উপর অতি উচ্চ হারে আমদানি শুল্ক বসানো না হত, তবে ম্যাঞ্চেষ্টারের কলগুলো প্রথমেই অচল হয়ে পড়ত এবং বাষ্পীয় শক্তির সাহায্য পেলেও এগুলোকে কদাচিৎ চালানো যেত। ভারতীয় শিল্পগুলোর অপমৃত্যু ঘটিয়েই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল। এ দলিলের সাহায্যে বলা যায় যে, বৃটিশ সরকার তার রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা উপমহাদেশ তথা বর্তমান বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলোর অপমৃত্যু ঘটিয়ে তাদের অর্থনৈতিক শোষণের পথ পরিষ্কার করে। রাজনৈতিক অবিচার ছাড়াও উপমহাদেশের শিল্পের অবনতি ও আধুনিক শিল্পজগতে অনগ্রসরতার কতকগুলো অর্থনৈতিক কারনও ছিলঃ

১) শিল্প বিপ্লব;

২) ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সরকারের ভ্রান্ত বাণিজ্যনীতি;

৩) কাঁচামালের উৎস হিসেবে কাজ করা;

৪) বৃটিশের জাতীয় স্বার্থরক্ষা ইত্যাদি।[১০]

১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত ইংরেজরা এদেশ শাসন করে। এসময় কলকাতায় কিছু বৃহদায়তন শিল্প গড়ে ওঠে। বর্তমান বাংলাদেশ এলাকা ছিল ঐ সব শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনকারী অঞ্চল। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন আনয়ন করে। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো পড়ে ভারতীয় অংশে এবং কাঁচামাল উৎপাদনকারী অঞ্চল পড়ে পাকিস্তান অংশে অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের অংশে। সে সময় হতেই এদেশে কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল শিল্প ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে শুরু করে। শিল্পোন্নয়নের গতি তবুও মন্থর ছিল।[১১]

বাংলাদেশের অধিকাংশ শিল্প পাকিস্তানী নাগরিকদের মালিকানাধীন ছিল। তবে মাত্র ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত কিছু কিছু বাঙালী বাংলাদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যখন তৎকালীন পাকিস্তানী মালিকগণ তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান অযত্নে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে দেশে ত্যাগ করেন তখন শিল্পের শ্রমিকেরাই মিল কারখানাগুলো চালানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১২]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ২নং ধারার ক্ষমতাবলে সমস্ত ভারি ও মাঝারি শিল্পখাতকে জাতীয়করণ করে সরকারি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। কিন্তু পাবলিক সেক্টর প্রত্যাশিত লক্ষ্য হাসিলে ব্যর্থ হয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ তখন প্রচুর পরিমাণে লোকসান দিতে থাকে। সরকার ভর্তুকী দিতে থাকেন। ফলশ্রুতিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, উৎপাদন হ্রাস পেতে থাকে। উক্ত পরিস্থিতি নতুন দর্শনের আবির্ভাব ত্বরান্বিত করে। নীতি ও প্রণেতাগণ তখন চিন্তা করেন যে, The Economy might be stimulated by giving a some what expanded role to the private sector.[১৩] তখন তারা রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের পাশাপাশি ব্যক্তি মালিকানায়ও শিল্প প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অনুভব করেন। এ লক্ষ্যে পরবর্তী সরকার নতুন শিল্পনীতি প্রণয়ন করেন। বেসরকারি কথাটি বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এম. ইউ আহমেদ তার "Privatisation and Development" নামক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'In most cases privatisation means the reduction of government participation in the production and distribution of goods and services, increase competition and relax controls and regulation.'[১৪]

বিভিন্ন শিল্পনীতির ধারাবাহিকতায় সরকার সম্প্রতি ১৯৯৯ সালের নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করেছেন। শিল্পনীতি ১৯৯৯তে বলা হয়েছে, আগামী এক দশকের মধ্যে বাংলাদেশে উল্লেখ্যযোগ্য একটি শিল্পখাত গড়ে উঠবে এবং আশা করা যায় শিল্প খাতের অংশ দাড়াবে কমপক্ষে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদের (GDP) ২৫ শতাংশ এবং কর্মরত জনশক্তির ২০ শতাংশ। এর ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের অবদান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে, কারণ বিগত দুই শতকেরও বেশি সময় ধরে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদে (GDP) কর্মরত জনসংখ্যায় শিল্পের অংশ ছিল মাত্র ১০ শতাংশ। বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে একটি উদ্দীপ্ত ও গতিশীল ব্যক্তিখাতের ভূমিকাই হবে প্রধান। বাংলাদেশের শিল্পখাত বিনিয়ন্ত্রিত অভ্যন্তরীণ বাজার এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতাক্ষম হয়ে উঠবে। রপ্তানিমুখীতা হবে বাংলাদেশের শিল্পখাতের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিকেন্দ্রায়িত বিকাশ হবে বাংলাদেশের বর্তমান শিল্পনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

২.১.১ শিল্পনীতির উদ্দেশ্য

শিল্পনীতি ১৯৯৯-এর উদ্দেশ্য নিম্নরূপ–

• উচ্চতর মাত্রায় শিল্প বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতিতে উৎপাদনের ভিত্তি প্রসারিত করা।

• শিল্প-উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিনিয়োগে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য ব্যক্তিখাতকে উৎসাহিত করা।

• বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টিতে সরকারের সহায়ক ভূমিকা তুলে ধরা।

• ব্যক্তিখাতকে উৎসাহিত করার জন্য যে সব শিল্প ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ দরকার এবং অথবা যেসব ক্ষেত্রে জনস্বার্থে সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার কেবলমাত্র সেসব ক্ষেত্রেই সরকারি উদ্যোগ গ্রহণের অনুমতি প্রদান।

• দেশীয় বিনিয়োগের অপ্রতুলতা পূরন, ক্রমবিবর্তনশীল প্রযুক্তি আহরণ এবং রপ্তানি বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির জন্য রপ্তানি ও দেশীয় বাজারমুখী উভয়শিল্পের ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা।

• শিল্পখাতে দ্রুত কর্মসংস্থান বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং শ্রমঘনশিল্পে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা।

• দক্ষতা উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে দক্ষতার উচ্চতর পর্যায়ে মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

• শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং দক্ষতা ও প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে উচ্চতর মূল্য সংযোজিত পণ্যের উৎপাদন প্রসার।

• ব্যবস্থাপনার পূনর্গঠন ও বাজারমুখী নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে সকল রাষ্ট্রায়ত্ব উৎপাদন শিল্পের কার্যকরি দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

• শিল্পপণ্যের বহুমুখীকরণ ও দ্রুত রপ্তানি বৃদ্ধি।

• দেশীয় বাজারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পুরনের জন্য আমদানি বিকল্প শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতাকে উৎসাহিত করা।

Dhaka University Institutional Repository

• পরিবেশ উপযোগী এবং দেশের সম্পদ কাঠামোর সাথে সংগতিপূর্ণ শিল্পায়ন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা।

• যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন ও প্রনোদনা প্রদানের মাধ্যমে দেশব্যাপী সুষম শিল্পোন্নয়ন উৎসাহিত করা।

• বিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতার সর্বাত্মক ব্যবহার।

• বাণিজ্য ও আর্থিক নীতির সাথে সমন্বয় সাধন।

• দেশীয় প্রযুক্তির উন্নয়ন ও দেশীয় কাঁচামাল ভিত্তিক উৎপাদন সম্প্রসারণ।

• পুনর্বাসনযোগ্য রুগ্ন শিল্পের পুনর্বাসন।[১৬]

২.১.২ বেসরকারিকরণ এবং রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প সংস্কার নীতি

শিল্পনীতি ১৯৯৯-এ বেসরকারি এবং রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প সংস্কার নীতিতে নিম্নোক্ত বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

সরকারি শিল্প বেসরকারিকরণের বর্তমান নীতি গুরুত্বসহকারে অনুসরণ করা হবে।

রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ সংরক্ষিত খাতে সীমাবদ্ধ থাকবে। ভবিষ্যতে শিল্পখাতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগকে অবশেষ বিনিয়োগ হিসেবে উৎসাহিত করা হবে।

বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় শিল্পকে সঠিক বাণিজ্যনীতির মাধ্যমে পরিচালিত করার জন্য স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হবে। সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শিল্পের ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য সরকার প্রচেষ্টা চালাবে এবং এসব শিল্পখাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রযুক্তি বা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের চুক্তিভিত্তিক সহযোগিতা প্রদানে কোন বিদেশী সহযোগী বা বিনিয়োগকারীকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।

EOSP (Employee owned stock programme) এর আওতায় ক্ষেত্র বিশেষে শ্রমিকদের অনুকূলে বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হবে।[১৭]

২.১.৩ বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিবেশ

বিনিয়োগ পরিবেশ দ্বারা কোন একটি দেশে বা এলাকায় ব্যবসার মূলধন আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে কতকগুলো উপাদানের অনুকূল বা প্রতিকূল প্রভাবকেই বুঝায়। যখন কোন ব্যক্তি বিনিয়োগের

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তা করেন তখন তিনি বিনিয়োগের নিরাপত্তা, তারল্য, বিনিয়োজিত মূলধন থেকে রিটার্নের পরিমান যাচাই করতে চেষ্টা করেন। মূল্যায়নের পর যদি দেখা যায়, এগুলো তার অনুকূলে তাহলে বলা যায় বিনিয়োগ পরিবেশ অনুকূল। প্রতিকূল বিনিয়োগ পরিবেশ-এর উল্টোটাই নির্দেশ করে।

বিনিয়োগ পরিবেশের কয়েকটা দিক রয়েছে। যেমন ঃ

১. রাজনৈতিক দিক;

২. অর্থনৈতিক দিক;

৩. আইনগত দিক;

৪. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক; ও

৫. কারিগরি দিক।

স্বাধীনতার আড়াই যুগ ধরেও অর্থনীতির পরিবর্তন, ক্ষমতার পরিবর্তন, রাজনৈতিক দলের দর্শন এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রভৃতি কারণে সুষ্ঠু ও অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। স্বাধীনতার পর সকল শিল্পকারখানা ঢালাওভাবে রাষ্ট্রীয়করণের ফলে ব্যক্তি-উদ্যোগ নিরুৎসাহিত হয়। পরবর্তীতে এ নীতির পরিবর্তন হলেও ক্ষমতার পরিবর্তন, দুর্নীতি, ব্যাংকের ত্রুটিপূর্ণ নীতি, প্রকৃত শিল্পোদ্যোগ চিহ্নিতকরণের অক্ষমতা, ঋণের অর্থ ফেরত না দেবার প্রবণতা এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সুষ্ঠু বিনিয়োগের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করেছে।[১৮]

সারণী-১

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রত্যাশিত বেসরকারি বিনিয়োগ

(মিলিয়ন টাকায়) (১৯৮৯-৯০ মূল্যে)

১৯৮৯/৯০	১৯৯০/৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯০-৯৫
৪,৫০০	৫,০৬০	৬,৩৪০	৭,৯০০	১০,৫০০	১৪,১০০	৪৪,২০০

উৎস ঃ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৯৭-২০০২, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

Dhaka University Institutional Repository

বিনিয়োগ পরিবেশের উপর অর্থনৈতিক উপাদানের প্রভাবের দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে দেখা যায়, বাংলাদেশ ভাল অবস্থানে রয়েছে। এ দেশের বিরাট জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা শিল্পে বিনিয়োগের সহায়ক। বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত পণ্যের চাহিদা বিদেশের বাজারেও বিদ্যমান। বিভিন্ন ধরনের শিল্প স্থাপনের জন্য কাঁচামাল এবং সুলভে দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিকও রয়েছে। মূলধনের স্বল্পতা মেটানোর জন্যে সুষ্ঠু ব্যাংকিং ব্যবস্থা, শেয়ার বাজার এবং অন্যান্য মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। সরকার কার্যকর রাজস্বনীতি, মুদ্রানীতি ও শিল্পনীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে শিল্পখাতে বেসরকারি পুঁজি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছেন। বিনিয়োগের উপর রিটার্নের হারও আশাব্যঞ্জক। কিন্তু এতদসত্ত্বেও চলমান রাজনৈতিক সংকট বিনিয়োগ পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত খোলাবাজার নীতি দেশের ছোট-খাট শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারকে ব্যাহত করছে।

দেশে সুষ্ঠু আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা উত্তম বিনিয়োগ পরিবেশের অন্যতম সহায়ক। বিনিয়োগের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট আইন যেমন, কারখানা আইন, দোকান বা প্রতিষ্ঠান আইন, কোম্পানি আইন, ব্যাংকিং আইন রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আইনের যথার্থ প্রয়োগ না থাকাতেও শিল্পোদোক্তারা নানা রকম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। অর্থ-ঋণ আদালতের রায় বাস্তবায়নে অনেক ক্ষেত্রে বিলম্ব হচ্ছে। চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসীদের ভয়ে বিনিয়োগকারীদের সর্বদা স্বত্রস্ত থাকতে দেখা যায়। ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অনুন্নতির কারণে বিনিয়োগ ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

সারনী-২

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পরবর্তী শিল্পখাতে বিনিয়োগ

(মিলিয়ন টাকায়) (১৯৮৯-৯০ মূল্যে)

১৯৮৯/৯০	১৯৯০/৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯০-৯৫
৪,৫০০	১৪,০৩৫	১৭,১৮৮	১৯,৭৯২	১৯,৯১৫	২৮,০৯২	৯৯,০২২

উৎস ঃ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৯৭-২০০২, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

Dhaka University Institutional Repository

যে কোন দেশের সামাজিক ও সংস্কৃতির প্রধান ভিত্তি সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, জনসাধারনের মূল্যবোধ, প্রথা ও ধর্মীয় বিশ্বাস। সাম্প্রতিক কালের মূল্যবোধের অবক্ষয়, ব্যক্তিস্বার্থ, পূর্বসুরিদের দুর্নীতির অনুকরণ, ঋণ পরিশোধ না করার মানসিকতা, অল্প পরিশ্রমে বেশি পাওয়ার মানসিকতা প্রভৃতি বিনিয়োগ পরিবেশকে প্রভাবিত করছে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাও একটি স্বাধীন জাতির জন্য যথোপযুক্ত নয়। এদেশের লোকেরা ভাগ্যে বিশ্বাসী হওয়ায় সাধারণত তারা কঠোর পরিশ্রম করতে চায় না। সনাতন সংস্কৃতির ধারণাকেও তারা লালন করে। এসব কারণ এদেশে যথার্থ শিল্পোদ্যোগ বিকাশের পরিপন্থী।

বাংলাদেশে শিল্পস্থাপনের জন্য নতুন প্রযুক্তি আমদানি ও ব্যবহারে কোন বাধা নেই। অনেক শিল্পের জন্য দক্ষ শ্রম শক্তি ও কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন শ্রমিকের উপস্থিতি আছে। কাজেই প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে বিনিয়োগ পরিবেশ অনুকুলে বলা যায়।

সারণী-১ ও ২ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ১৯৯০-৯১ সালের জন্য প্রত্যাশিত বিনিয়োগ ধরা হয়েছিল ৫,৩৬০ মিলিয়ন টাকা কিন্তু প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ১৪,০৩৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯১-৯২ সালের জন্য বিনিয়োগ ধরা হয়েছিল ৬,৩৪০ মিলিয়ন টাকা। অন্যদিকে প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ১৭,১৮৮ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯২-৯৩ সালের জন্য বিনিয়োগ ধরা হয়েছিল ৭,৯০০ মিলিয়ন টাকা। অপরদিকে প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ১৯,৭৯২ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৩-৯৪ সালের জন্য বিনিয়োগ ধরা হয়েছিল ১০,৫০০ মিলিয়ন টাকা। অন্যদিকে প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ১৯,৯১৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৪-৯৫ সালের জন্য বিনিয়োগ ধরা হয়েছিল ১৪,১০০ মিলিয়ন টাকা। অপর পক্ষে প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ২৮,০৯২ মিলিয়ন টাকা।

সারনী দুটি ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে, ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত মোট প্রত্যাশিত বিনিয়োগ ধরা হয়েছিল ৪৪,২০০ মিলিয়ন টাকা। অন্যদিকে প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ৯৯,০২২ মিলিয়ন টাকা। অর্থাৎ প্রত্যাশিত বিনিয়োগ অপেক্ষা প্রকৃত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৪,৮২২ মিলিয়ন টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৩

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শিল্পখাতে প্রত্যাশিত বিনিয়োগ

(Projected Investment)

পাবলিক সেক্টর	টাকা	মোট বিনিয়োগ (%) হার
	২,১১,৭৯৩.৭০	১.৩৭
প্রাইভেট সেক্টর	২,৯৮,৭৭৬.১৬	২৭.১৫
মোট	৩,১০,৫৬৯.৮৬	১৫.৮৫

উৎস ঃ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৯৭-২০০২, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

সারণী-৩ এ দেখা যাচ্ছে, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পাবলিক সেক্টরে বিনিয়োগ ধরা হয়েছে শতকরা ১.৩৭%, প্রাইভেট সেক্টরে বিনিয়োগ ধরা হয়েছে শতকরা ২৭.১৫% এবং উভয় সেক্টরে মোট বিনিয়োগ ধরা হয়েছে শতকরা ১৫.৮৫%।

২.২ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্পের পরিচিতি

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে ক্ষুদ্র শিল্পের সংজ্ঞা ও কাঠামো সম্পর্কে আলোকপাত অত্যাবশ্যক। 'ক্ষুদ্র শিল্প' এ শব্দটি বিশ্লেষণ করলে 'ক্ষুদ্র' এবং 'শিল্প'-এ দুটো বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়। 'ক্ষুদ্র' মানে হচ্ছে ছোট এবং 'শিল্প' বলতে উৎপাদন প্রক্রিয়া বা সেবামূলক কর্ম তৎপরতায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়।

তাই সাধারণভাবে বলা যায়, যে সমস্ত শিল্প আকৃতি ও উৎপাদনের দিক দিয়ে বৃহৎ শিল্প অপেক্ষা ছোট সেসব শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প বলে। এরা তুলনমূলকভাবে কম পুঁজি ও শ্রম নিয়োগ করে। আধুনিক উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করলেও এদের সংগঠন ব্যবস্থা কিছুটা পশ্চাৎপ্রদ। ভিন্নতর বিশ্লেষণে এ শিল্পগুলোকে মাঝারি শিল্প হিসেবেও অভিহিত করা যায়। যেমন- হাল্কা প্রকৌশল শিল্পগুলো আকারে অত্যন্ত ছোট। আবার খাদ্য শিল্প যেমন বেকারী শিল্পের আকার অনেকটা বড়। তাই এ ধরনের শিল্পকে মাঝারি শিল্পনামেও অভিহিত করা যায়। তথাপিও শ্রমসংখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে এসব শিল্পকে মাঝারি শিল্প হিসেবে গণ্য না করে ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবেই গণ্য করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন দেশে এবং একই দেশে বিভিন্ন সময়ে ক্ষুদ্রশিল্পের সংজ্ঞায় পার্থক্য দেখা দেয়। বিসিকের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, Small-scale industry means an industrial undertaking engaged either in manufacturing process or service activity within a total investment of taka 15 million inclusive of investment in machinery and equipment not exceeding taka 10 million excluding tax and duties. In case of BMRE (Balancing, Modernization, Replacement and Expansion) the total investment will not exceed taka 22.5 million.[২০]

শিল্পনীতি ১৯৯৯ মোতাবেক, ক্ষুদ্র শিল্প বলতে বোঝায় সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান যেখানে ৫০ জনেরও কম শ্রমিক কাজ করে (কুঠির শিল্পের মত পরিবারের লোকজন নয়) এবং/অথবা স্থায়ী বিনিয়োগের পরিমান ১০ কোটি টাকার কম।[২১]

S.V.S Sarma বলেন, "There are two criteria in defining a small enterprise- (a) Total investment made interms of plant and machinery and (b) The size of employment other conditions are location, economic, strategic, technique employeed i.e. manual skill and or use of machinery, extent of market nature of the working time etc.[২২]

উল্লেখিত সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে শিল্পনীতি ১৯৯৯তে প্রদত্ত সংজ্ঞাটিই অত্যাধুনিক। উক্ত সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি ক্ষুদ্র শিল্প বিশেষত বাংলাদেশের ক্ষুদ্রশিল্পের কাঠামো সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা লাভ করা যায়, যেমন–

- ক্ষুদ্র শিল্পে ৫০ জনের বেশি শ্রমিক নিয়োগ করা হয় না;
- ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির শিল্প এক নয়;
- ক্ষুদ্র শিল্পে ১০ কোটি টাকার বেশি পুঁজি বিনিয়োগ করা হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

২.২.১ ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির শিল্পের মধ্যে পার্থক্য

সাধারণভাবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রায় একই শ্রেণীভুক্ত মনে হলেও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করলে এদের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

সাধারণত পারিবারিক মালিকানায় কুটির বা গৃহ অভ্যন্তরে পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতায় যে শিল্প পরিচালিত হয় তাকে কুটির শিল্প বলে। অন্যদিকে পারিবারিক মালিকানা ছাড়াও অংশীদারী অথবা সমবায় ভিত্তিক মালিকানায় পরিচালিত শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়।

কুটির শিল্পে ব্যবহৃত পুঁজি প্রায় ক্ষেত্রে পারিবারিক উৎস থেকে আসে। কিন্তু ক্ষুদ্র শিল্প কারখানায় বিভিন্ন ঋণদানকারী সংস্থা থেকে ঋণ সংগৃহীত হয়।

কুটির শিল্প সাধারণত কুটির বা গৃহে অবস্থিত হয়। অন্যদিকে ক্ষুদ্র শিল্প ছোট কারখানায় অবস্থিত হয়।

কুটির শিল্পে নিয়োজিত শ্রম ও মূলধনের পরিমান খুবই কম হয় এবং যেখানে গৃহ পরিবেশ বজায় থাকে। অপরপক্ষে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে মোটামুটিভাবে কারখানার পরিবেশ বিরাজ করে এবং তা বেশি শ্রম ও মূলধন দ্বারা পরিচালিত হয়।

কুটির শিল্পে খুবই হালকা যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় না। অন্যদিকে ক্ষুদ্র শিল্পে আধুনিক ও ভারী যন্ত্রপাতি উন্নত প্রযুক্তি, বিদেশী কাঁচামাল এবং বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়।

কুটির শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। এখানে পরিবারের বাইরের থেকে খুব কম শ্রমিকই নিয়োগ করা হয়। অন্যদিকে ক্ষুদ্র শিল্পে বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। তাই এখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি।

কুটির শিল্পের আয়তন খুবই ছোট। এর সংগঠন ও কৃষি সংগঠনের কাছাকাছি। অন্যদিকে ক্ষুদ্রশিল্পের আয়তন অপেক্ষাকৃত বড় হয়ে থাকে। এর সংগঠন ও প্রায় বৃহৎ শিল্পের সংগঠনের ন্যায়।

Dhaka University Institutional Repository

২.২.২ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ক্ষুদ্রশিল্প[২৩]

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র শিল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ক্ষুদ্রশিল্পের বিকেন্দ্রীকরণে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র শিল্পের প্রধান উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

- বিশেষত পল্লী এলাকার জনগণের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকার সমস্যা হ্রাস করা;
- দেশজ সম্পদ ও প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের দ্বারা দরিদ্র জনগণের আয় বৃদ্ধি করা;
- উদ্যোগমূলক কর্মকাণ্ডের উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা;
- প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর জন্য স্থানীয় চাহিদা পূরণ করা;
- পল্লী শিল্পায়নের মাধ্যমে পল্লী এলাকার জনগণকে শহর মুখী হতে নিরুৎসাহিত করা;
- ভৌগোলিকভাবে শিল্পায়নের বিস্তৃতিকে উৎসাহিত করা এবং সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা;
- সাব-কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের বৃহৎ, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে সংযোগের প্রসার ঘটানো;
- কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প পণ্য দ্রব্যাদি উৎপাদনে উৎসাহিত করা;
- জিডিপিতে ক্ষুদ্র শিল্পের অবদান বৃদ্ধি করা।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ প্রস্তাব করা হয়েছে ঃ[২৪]

- বিনিয়োগের পূর্বে ও পরে প্রসার ও সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা করা;
- ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের মাধ্যমে মহিলা উদ্যোক্তাসহ ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোক্তাদের দক্ষতার উন্নয়ন সাধন করা;

Dhaka University Institutional Repository

- বিদ্যমান শিল্পের সামঞ্জস্য বিধান, আধুনিকীকরণ, পুনর্বাসন ও প্রসারণের মাধ্যমে বিদ্যমান ক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহার অর্জন করা;
- আমদানি-রপ্তানি শুল্কের যৌক্তিক নিরূপন এবং যথাযথ রাজস্ব নীতির মাধ্যমে তুলনামূলক সুবিধা দিয়ে স্থানীয় শিল্পকে সাহায্য করা ও অনুপ্রেরণা যোগানো;
- বিভিন্ন শিল্পের সহায়ক শিল্প ও সাব-কন্ট্রাক্টিং, কৃষিভিত্তিক ও কৃষি সহায়ক শিল্প, রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প শিল্প, প্রকৌশল, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক্স প্রভৃতি শিল্পসমূহের উন্নয়ন উৎসাহিত করা;
- ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোক্তাগণের জন্য ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণ করা;
- ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর মান উন্নয়ন সাধন করা;
- ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদিত পণ্য দ্রব্যাদির বাজারজাতকরণ সুবিধার উন্নয়ন সাধন করা;
- কৃষি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সেক্টরের সাথে ক্ষুদ্র শিল্পের শক্তিশালী সমন্বয় সাধন করা;
- নতুন সম্ভাব্য এলাকায় শিল্পীয় কার্যাবলীর মাধ্যমে নতুন নতুন পণ্য দ্রব্য উৎপাদন করা;
- স্থানীয় এবং বৈদেশিক সহযোগিতায় যৌথ উদ্যোগের প্রসার ঘটানো; এবং
- বিদ্যমান শিল্পীয় ভূসম্পত্তির সৃষ্ট সুবিধার কাম্য সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা; আঞ্চলিক প্রয়োজন যাচাই করে প্রয়োজনবোধে নতুন ভূ-সম্পত্তি স্থাপন করা।

উল্লেখিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচির প্রস্তাব করা হয়েছে। এই কর্মসূচিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। পাবলিক সেক্টর কর্মসূচি ও প্রাইভেট সেক্টর কর্মসূচি।

পাবলিক সেক্টরের জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে (বিনিয়োগ) ১,০৮৯.৮৯ মিলিয়ন এবং প্রাইভেট সেক্টরের জন্য বিনিয়োগ ধরা হয়েছে ১২৫,২৪৬.৯৭ মিলিয়ন। উক্ত ১,২৫,২৪৬.৯৭ মিলিয়নের মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাত। তার ভিতর ক্ষুদ্র শিল্প খাতে বিনিয়োগ ধরা হয়েছে ১,১৬,৫৮২.৪৫ মিলিয়ন টাকা।

প্রাইভেট সেক্টরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের জন্য পঞ্চম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৬,১৪৪.৪ মিলিয়ন টাকা বৈদেশিক ঋণসহ ক্রেডিট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১২,৮০০ মিলিয়ন টাকা।[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

২.২.৩ ক্ষুদ্র শিল্পে অর্থায়ন

অন্যান্য অনেক দেশের মতোই বাংলাদেশের ক্ষুদ্রশিল্পের খাতে অর্থায়নের উৎসমূলত তিনটি। যথা-ক. ব্যক্তিগত সঞ্চয়, খ. অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ এবং গ. প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ।

ক. ব্যক্তিগত সঞ্চয় ঃ বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ১৯৯৫ সালের হিসাব অনুযায়ী এখনো মাত্র ২৩০ ডলার,[২৬] ফলে সঞ্চয়ের হারও অত্যন্ত নিম্নবর্তী- মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা মাত্র ৭.৭৫ ভাগ,[২৭] যা পৃথিবীর মধ্যে তো বটেই। এশিয়ার এ অঞ্চলের মধ্যেও সর্বনিম্ন। সঞ্চয়ের এ নিম্নহার স্বভাবতই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিকূলতা। ফলে বাংলাদেশের শিল্পখাতে তথা ক্ষুদ্র শিল্পে ব্যক্তিগত সঞ্চয়সূত্রের বিনিয়োগ প্রায় নেই বললেই চলে। তবে সাম্প্রতিক কালে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সৃষ্ট পরিবর্তনের ফলে পরিস্থিতির অনিবার্যতায় একান্ত ব্যক্তিগত উৎস থেকে কিছু কিছু বিনিয়োগ ক্ষুদ্রশিল্প খাতে আসছে। তবে তা তৃণমূল পর্যায়ে। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে একান্ত বেঁচে থাকার তাগিদে তৃণমূল পর্যায়ের এসব উদ্যোক্তারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিনিয়োগে এগিয়ে আসছেন কিন্তু তার পরিমান এতই নগন্য যে, সেটার উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিগত সঞ্চয়সূত্রের বিনিয়োগকে খুব একটা সম্প্রসারণ করা যাবে-এমনটি আশা করা যায় না। অথচ বিপরীতে যাদের মধ্যে সঞ্চয়ের হার কিছুটা উচ্চবর্তী, তারা আবার এ ক্ষেত্রে সরকারি নীতির অস্বচ্ছ ব্যবহারের কারণে সঞ্চয় সূত্রের অর্থ শিল্পে বিনিয়োগের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত বোধ করে থাকেন। কারণ, শুধু ব্যক্তিগত সঞ্চয়সূত্রের অর্থের মাধ্যমে কোন উদ্যোক্তা শিল্প স্থাপনে এগিয়ে এলে প্রথমেই মুখোমুখি হতে হয় সরকারের রাজস্ব দপ্তরের কর্মচারীদের হয়রানির। উদ্যোক্তাকে তারা নানাভাবে হেনস্তা করেন উক্ত বিনিয়োগকৃত অর্থের বৈধতা, আয়কর পরিশোধের বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়েছে কিনা ইত্যাদি প্রশ্নে। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিমাত্রই যথাযথ বৈধতা ও নিয়ম-নীতি মেনে চলবেন এবং নিয়মানুযায়ী সেটা সরকারি কর্মচারীগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবেন- সে ব্যাপারে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা এক্ষেত্রে যেভাবে উদ্যোক্তাদেরকে অহেতুক হয়রানী করে থাকেন, তাতে ব্যক্তিগত সঞ্চয়সূত্রে বিনিয়োগে সক্ষম উদ্যোক্তারাও আর নিজস্ব অর্থে শিল্পকারখানা স্থাপনে এগিয়ে আসেন না।

সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে দেশের বর্তমান আর্থিক নীতিমালা এখনো যথেষ্ট উৎসাহ ব্যঞ্জক নয়। সুদের হার হ্রাসের বিষয়টি বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে যেভাবে ঢালাওভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, তা

Dhaka University Institutional Repository

অতীব নীচু সঞ্চয় হারের এ দেশে সঞ্চয়কে আরো নিরুৎসাহিত করবে বলেই ধরে নেয়া যায়, প্রকারান্তরে যা ব্যক্তি-পুঁজির বিনিয়োগকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে-বিশেষ করে ক্ষুদ্র শিল্পখাতে। কারণ, এ ধরনের ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের বিনিয়োগের পরিসীমা ক্ষুদ্র শিল্প খাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উপরোক্ত অবস্থায় বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্পখাতে ব্যক্তিগত সঞ্চয়সূত্রের বিনিয়োগ বলতে গেলে খুবই অপ্রতুল, তবে সম্ভাবনাহীন নয়।[২৮]

খ. অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ঃ বাংলাদেশে অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উৎসের মধ্যে রয়েছে আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ধার দেনা, লগ্নী সূত্রের ধার, দাদন প্রভৃতি। তন্মধ্যে শেষোক্তটির প্রভাবই সর্বাধিক এবং এর ফলাফলও সবচেয়ে করুন।

অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উৎসটি বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্পখাতে সীমিত পরিসরে বিদ্যমান। এগুলোর নির্ভরশীলতাও ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। তন্মধ্যে দাদন প্রথার বিলুপ্তির বিষয়টি নৈতিক কারণেই কাম্যও বটে।[২৯]

গ. প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ঃ বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে পুঁজি সহায়তার ব্যাপারে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ভূমিকাই মুখ্য। অবশ্য বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের ন্যায় ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে এ ভূমিকাটা সীমিত।

ক্ষুদ্র শিল্প খাতে ঋণ দানের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সত্তর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মূলত সরকারি খাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং একাজে নিয়োজিত রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ভূমিকাও বেসরকারি শিল্পখাতে অর্থায়নের ব্যাপারে খুব একটা অগ্রণী ছিল না, তৎকালীন রাজনৈতিক ব্যবস্থার কারণেই। তবে বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (বিএসআরএস) এবং বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের (বিএসবি) মত প্রতিষ্ঠান সে সময়ে এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তন্মধ্যে বিএসআরএস-এর ভূমিকাই ছিল মুখ্য। কারণ বিএসবি মূলত বড় শিল্পগুলোতেই অর্থ যোগান দিয়েছে।

সত্তর দশকের শেষার্ধ থেকে দেশের সামগ্রীক শিল্পখাতের অংশ হিসেবে ক্ষুদ্র শিল্প খাতেও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের পরিসর বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে উৎসাহিত করার সরকারি নীতির ফলেই এটি ঘটতে থাকে। এসময়ে দেশে রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতেও ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় অনুমতি প্রদান করা হয়। ফলে সামগ্রীক ব্যাংকিং

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে ক্ষুদ্র শিল্প খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং এর ভৌগোলিক পরিধিও কিছুটা বিস্তার লাভ করে। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, সরকারি ও বেসরকারি খাতের এসব ব্যাংকের শাখা এখন পর্যন্ত মূলত শহরকেন্দ্রিক। শহরের বাইরে বিশাল বিস্তৃত গ্রামাঞ্চল এ ধরনের ব্যাংকিং কাঠামোর বাইরেই রয়েছে। ফলে অন্যান্য খাতের ন্যায় ক্ষুদ্র শিল্প খাতের ঋণের ব্যাপারে নীতিগত সহায়তার সময় বৃদ্ধি পেলেও এক্ষেত্রে কাঠামোগত সহায়তার সম্প্রসারণ এখনো তেমন একটা হয়নি বললেই চলে। ক্ষুদ্র শিল্পখাতের শহর কেন্দ্রিক উদ্যোক্তারাই মূলত এ ধরনের সুযোগ থেকে সীমিত পর্যায়ে উপকৃত হয়েছেন বা হচ্ছেন।

ব্যাংকিং সুবিধা কাঠামোর সম্প্রসারণের পাশাপাশি সত্তর দশকের শেষার্ধ থেকে দেশে আরো এক ধরনের ঋণ সহায়তা কাঠামো বিস্তার লাভ করে। আর সেটি হচ্ছে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা এনজিও পরিচালিত কার্যক্রম। সাম্প্রতিককালে এসে এনজিও কার্যক্রম খুবই ব্যাপকতা লাভ করেছে যদিও এসব এনজিও কার্যক্রমের ধরন, কৌশল ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনেকেই অনেক ধরনের সন্দেহ পোষণ করে থাকেন, যার কিছু কিছু তথ্যভিত্তিকও। ব্রাক ও মাইডাস-এর মত দু'চারটি এনজিওই শিল্পখাতে বিশেষ করে ক্ষুদ্র শিল্পখাতে ঋণ প্রদান করে থাকে।

এমনকি গ্রামীন ব্যাংকের মত বহুল আলোচিত প্রতিষ্ঠানেরও শিল্পোন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্তি খুবই সামান্য। অতএব বলা চলে যে, এনজিও কাঠামোর আওতায় বর্তমানে ক্ষুদ্র শিল্পখাতে ঋণদান কার্যক্রমের বিস্তৃতি খুবই সীমিত।

মধ্য সত্তরের পর থেকে দেশে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় শিল্প খাতে ঋণ সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু দেখা গেছে যে, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের এ প্রবাহ বড় ও মাঝারি শিল্পে যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ক্ষুদ্র শিল্পে সে অনুপাতে বাড়েনি। অথচ দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর বিবেচনায় এ খাতেই নতুন শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠার তথা বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল অধিক এবং এখনো তা আছে।[৩০]

স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত সব সময়ই এবং সব পরিকল্পনাকালেই বিনিয়োগের পরিমাণ বিবেচনায় বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প থেকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাত উচ্চতর হারে জিডিপিতে

Dhaka University Institutional Repository

অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৯৫ সালের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, জিডিপিতে শিল্প খাতের মোট অবদান যেখানে ১১.৩৪%[৩১] সেখানে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের অবদান হচ্ছে ৫.৫%।[৩২] কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে চিত্রটি আরো অধিক লক্ষ্যণীয়। সেই একই সূত্রের হিসাব অনুযায়ী ঐ সময়ে শিল্পখাতে নিয়োজিত মোট শ্রম শক্তির ৮২.২ শতাংশই[৩৩] হচ্ছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে। অথচ বিপরীতে স্বাধীনতা-উত্তরকাল থেকে এ পর্যন্ত সময়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে বিতরণকৃত ঋণের পরিমান কখনোই শিল্প খাতে বিতরণকৃত মোট ঋণের ১০ শতাংশ বেশি হয়নি।

ক্ষুদ্র শিল্পখাতের উদ্যোক্তারা সুসংগঠিত নয়, যেমনভাবে সুসংগঠিত বড় শিল্পের উদ্যোক্তা এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। ফলে ঋণ নিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে সম্মিলিতিভাবে দরকষাকষির ক্ষমতা নেই, যেমনটি অন্যদের রয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্পখাতে আশানুরূপ হারে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি না পাওয়ার এটিও একটি বড় কারণ।[৩৪]

২.২.৪ ক্ষুদ্র শিল্পে অর্থায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাবলী

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্পে অর্থায়নের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা রয়েছে। নিম্নে বিভিন্ন বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

উদ্যোক্তাবৃত্তির সমস্যা ঃ বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে প্রথম সমস্যা হচেছ সঠিক উদ্যোক্তা খুঁজে পাওয়া। বৃহৎ ও মাঝারি এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উভয় ধরনের শিল্পের ক্ষেত্রেই বিষয়টি প্রযোজ্য। কারণ ঝুঁকি গ্রহণে সক্ষম মেধাবী, পরিশ্রমী ও দক্ষ উদ্যোক্তার সংখ্যা বাংলাদেশে এখনো পর্যাপ্ত নয়। অধিকাংশ উদ্যোক্তারই একটি লক্ষ্য থাকে স্বল্প পরিশ্রমে তড়িঘড়ি করে উচ্চ হারে মুনাফা অর্জন, যা সহজতো নয়ই সম্ভবও নয়। কারণ শিল্পখাতে বিনিয়োগ করে রাতারাতি প্রত্যর্পণ পাওয়ার ধারণা বিশ্বের কোথাও স্বীকৃতি পায়নি। শিল্প বিনিয়োগের সাথে জড়িত রয়েছে একটি দীর্ঘমেয়াদী চিন্তা-ভাবনা, যার সুফল পাওয়াটা যেমনি কঠিন, তেমনি আবার তার স্থায়ীত্ব সুদৃঢ়। ফলে এমন একটি কঠিন কিন্তু স্থায়ী সাফল্য অর্জনের জন্য ধৈর্য্য, শ্রম ও নিষ্ঠায় গড়া যে মেধাবী ও দক্ষ উদ্যোক্তার প্রয়োজন, সত্য স্বীকারে কুণ্ঠা না থাকলে মানতেই হবে যে, সে ধরনের উদ্যোক্তার সংখ্যা এদেশে এখনও খুবই সীমিত। ফলে প্রত্যাশিত মানের সে উদ্যোগ বৃত্তি এদেশের উদ্যোক্তাদের মধ্যে গড়ে তুলতে না পারলে এ

Dhaka University Institutional Repository

খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির সম্ভাবনা যেমনি হ্রাস পাবে, তেমনি তা প্রদত্ত ঋণের সদ্ব্যবহারকেও অনিশ্চিত করে তুলবে। দেশের গত ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা সে সাক্ষ্যই বহন করে। ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা না গেলে চক্রাবর্তিত নতুন ঋণ তহবিলের যোগান যেমন বৃদ্ধি পাবে না, তেমনি তা শিল্প খাতের উৎপাদনশীলতাকেও বিঘ্নিত করবে। শিল্পখাতের দুর্বলতার বিষয়টি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যখন দেখা যায় যে, ব্যাংকগুলোর কোটি কোটি টাকা এখনও অবিতরণকৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে উদ্যোগ ও উদ্যোক্তার অভাবে। আর এদেশের আর এক শ্রেণীর উদ্যোক্তাতো রয়েছেনই যাদের মূল টানটা বর্ধিত সরকারি আর্থিক সুবিধার প্রতি, যার মধ্যে ঋণ নিয়ে পরে মাপ পেয়ে যাবার প্রচেষ্টা অন্যতম। কিন্তু এর বিপরীতে বিশ্ববাজারের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য নিজেদেরকে উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে প্রায় নেই বললেই চলে।[৩৫]

সঠিক প্রকল্প বাছাইয়ের সমস্যা ঃ বাংলাদেশের শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য একটি বড় সমস্যা হচ্ছে সঠিক প্রকল্প খুঁজে পাওয়া, যেখানে সে আস্থার সাথে বিনিয়োগ করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতা পর্বত প্রমাণ। উদ্যোক্তা হয়তো বিনিয়োগের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে ব্যাংক বা এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে গেলে প্রকল্প বাছাইয়ের ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণের জন্য। কিন্তু দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে-সব প্রতিষ্ঠান উদ্যোক্তাগকে সন্তোষজনক পর্যায়ের পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছে না। কোন্ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা কিরূপ লাভজনক বা ঝুঁকিপূর্ণ, কোন পণ্যের বাজার-পরিস্থিতি স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কিরূপ, কোন খাতে চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে, কোন খাতে ব্যবহারের জন্য কি ধরনের প্রযুক্তি বাজারে সহজ লভ্য ইত্যাদি প্রায় কোন বিষয়েই তারা উদ্যোক্তাদেরকে পর্যাপ্ত তথ্য বা পরামর্শ প্রদানে ব্যর্থ হচ্ছে। এটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় তথ্য না থাকার কারণে যেমনটি ঘটছে, তেমনটি ঘটছে এ সব ব্যাপারে ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের অদক্ষতা ও এসব বিষয়ে পর্যাপ্ত আর্থ-কারিগরি জ্ঞানের অভাবেও। এমনি পরিস্থিতিতে স্বভাবতই ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট বর্ধিত সংখ্যক ঋণ প্রস্তাব আসছে না, কিংবা যেসব প্রস্তাব আসছে সেগুলোর ক্ষেত্রে তারা (ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান) আস্থার সাথে বিনিয়োগ করতে সক্ষম হচ্ছে না। ফলে এরূপ ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাংকারদের মধ্যে একধরনের নিরুৎসাহমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজ করে।[৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প বনাম শিল্প বহির্ভূত প্রকল্প ঃ বাংলাদেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অভিজ্ঞতা মূলত শিল্প বহির্ভূত অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রকল্পে ঋণ দানের। সে তুলনায় শিল্প প্রকল্পে ঋণ দানের অভিজ্ঞতা তাদের যেমনি অল্প, তেমনি এ ক্ষেত্রে দক্ষতার মানও যথেষ্ট উচ্চবর্তী নয়- হয়তো অভিজ্ঞতা কম বলেই। ফলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দৃষ্টিভঙ্গিতে মূলত শিল্প বহির্ভূত ব্যবসায়িক প্রকল্পে ঋণদানের একটি প্রবণতা প্রবলভাবে জেঁকে আছে। এ প্রবণতার ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনে শিল্প প্রকল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর আগ্রহ বৃদ্ধি করা না গেলে বা তাদের আগ্রহ সৃষ্টি না হলে বড় ও মাঝারি কিংবা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কোন শিল্পের ক্ষেত্রেই ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে না।[৩৭]

ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে দক্ষ লোকবলের অভাব ঃ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিল্প ঋণের ব্যাপারে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীবাহিনী গড়ে ওঠেনি এবং এ জাতীয় লোকজন নিয়োগের বা তার কর্মীবাহিনী সেভাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে ব্যাংকগুলো এখনো পর্যন্ত খুব একটা উদ্যোগী বলে জানা যায় না। ফলে ব্যাংকের নিকট পেশকৃত ঋণ প্রস্তাবের বিবেচনা ও প্রক্রিয়াকরণের কাজটি দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কারিগরি লোকবলের অভাবে যেমনি বিলম্বিত হয়, তেমনি আবার অনেক ক্ষেত্রে তারা এসব বিষয়ে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উদ্যোক্তাকে সন্তোষজনক বিনিয়োগ পরামর্শ প্রদানে সক্ষম হয় না। প্রদানকৃত ঋণ সঠিক খাতে বিনিয়োগ হলেও তা সঠিকখাতে ব্যবহৃত হচ্ছে কি-না, সে বিষয়েও বহু ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো তার নিজস্ব কারিগরি লোকবলের অভাবে যাচাই করে দেখতে পারে না। অথচ যথানিয়মে ঋণ ফেরত পাবার স্বার্থেই বিষয়টি তাদের জন্য প্রয়োজনীয়।[৩৮]

প্রক্রিয়াজাত জটিলতা ও আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা ঃ ঋণ প্রদান প্রক্রিয়াকে সহজতর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে বহু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তা সত্ত্বে এ প্রক্রিয়াটি এখন পর্যন্ত নানা জটিলতায় আক্রান্ত, যে জটিলতার মোকাবেলা করা বড় উদ্যোক্তাদের তুলনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদের জন্য অধিক কঠিন কাজ। ঋণের জন্য নির্ধারিত আবেদন ফর্ম পুরণ করা থেকে শুরু করে আনুষঙ্গিক কাগজপত্র ও দলিল দস্তাবেজ সরবরাহ করা পর্যন্ত যে নানা আনুষ্ঠানিকতা জড়িত রয়েছে, তার মোকাবেলা করা ক্ষুদে উদ্যোক্তাদের জন্য একটি বিরাট সমস্যা, যা তাদেরকে রীতিমত হতচকিয়ে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংক কর্তৃক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াগত জটিলতা ছাড়াও রয়েছে এক ধরনের আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘ সূত্রিতা, যার কিছুটা রাষ্ট্রকাঠামোর ফসল, কিন্তু বেশির ভাগই ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজেদের দ্বারা সৃষ্ট। এই আমলাতান্ত্রিক ভোগান্তির শিকার হয়ে বহু উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণের চেষ্টায় মাঝপথ থেকে স্বেচ্ছায় নিষ্ক্রান্ত হন বলেও আর্থিক ও অন্যান্যভাবে যথেষ্ট চড়ামূল্য দিতে হয়।[৩৯]

নিবিড় তত্ত্বাবধান ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ঃ বাংলাদেশের অধিকাংশ ব্যাংক এবং ঋণদান প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানই (যেমন, বিসিক) উদ্যোক্তাকে ঋণ দিয়েই তাদের দায়িত্ব খালাস করে। প্রদত্ত ঋণের কিছুটা বা পুরোটাই উদ্যোক্তা অন্যখাতে সরিয়ে নিলো কি-না (ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়), সরিয়ে না নিলেও যথাযথভাবে তার সদ্ব্যবহার হল কিনা বা উদ্যোক্তা তা দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে কতটুকু সমর্থ, অর্থ ব্যবহার প্রক্রিয়ায় উদ্যোক্তার সমস্যা কোথায় ইত্যাদি বিষয়ে ঐসব প্রতিষ্ঠান আর কোন খোঁজ-খবরই রাখে না। অথচ তাদের প্রত্যাশা, তারা দপ্তরে বসেই যথাসময়ে ঋণের কিস্তি ফেরত পেয়ে যাবেন। এটি ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর অব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিরই ফসল। প্রদত্ত ঋণের টাকা যথাসময়ে সঠিক পরিমানে ফেরত পাওয়ার স্বার্থেই ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ ব্যাপারে নিবিড় তত্ত্বাধান তৎপরতা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন এবং রাখলে সত্যি সত্যি যে যথাসময়ে ঋণের টাকা ফেরত পাওয়া যায় গ্রামীন ব্যাংক, ব্র্যাক, বিসিকের ইউডিপি প্রকল্প তার চাক্ষুস প্রমাণ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্লিপ্ততা পাথরের স্থবিরতাকেও হার মানায়।[৪০]

সামাজিক ক্ষমতার অভাব ঃ দেশের ক্ষমতা-কাঠামোয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদের অবস্থানবোধগম্য কারণেই পশ্চাৎবর্তী। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাধরদের সাথে তাদের ওঠাবসা যেমনি কম, তেমনি সেই ক্ষমতাধরদের প্রভাবিত করতে পারেন, সে সামাজিক ক্ষমতাও তাদের নেই। ফলে ব্যাংক বা অন্য যেকোন প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের প্রবেশাধিকার খুবই সীমিত। বাংলাদেশের বিকেন্দ্রীকরণ উদ্যোগের ফলাফল মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিশ্ব ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, দেশের শিল্প ও ব্যবসায়ের সিংহ ভাগই এখন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ৩৬টি ব্যবসায়িক পরিবার দ্বারা। এরাই ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে পানির দামে সরকারি খাতের বিরাষ্ট্রীয়কৃত শিল্প-কারখানা কিনছে এবং ব্যাংক থেকে নতুন ঋণ

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহনের ক্ষেত্রেও তাদেরই একচেটিয়া আধিপত্য। বিশ্বব্যাংকের এ মন্তব্য থেকে ব্যাংক ঋণ লাভের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।[৪১]

দুর্বল প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি ঃ শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের অধিকাংশই হচ্ছেন প্রথম প্রজন্মের প্রতিনিধি। ফলে বাংলাদেশের শিল্পখাতে, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে বর্ধিত সংখ্যক উদ্যোক্তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের মাধ্যমে শিল্প স্থাপনে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে প্রয়োজন ব্যাপক প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে যে, এখন পর্যন্ত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের বহু সম্ভাবনাময় নতুন উদ্যোক্তারাই ঋণ গ্রহণের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের খবরাখবর সম্পর্কে তেমন কিছুই অবগত নন। আর ঋণের সূত্র বা উৎস সম্পর্কে যদি বা ভাসা-ভাসা কিছু জানেন, কিন্তু যেসব ঋণ গ্রহণের জন্য কি ধরনের নিয়ম-কানুন চালু আছে, এ ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক করণীয় কি, তজ্জন্যে কি ধরনের প্রস্তুতি গ্রহন আবশ্যক, সে সব বিষয়ে সে খুবই অল্প জানে এবং তা জানার সুযোগও খুবই সীমিত।[৪২]

বন্ধকী সমস্যা ঃ প্রচলিত ব্যাংকিং পদ্ধতিতে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাংক তার প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে উদ্যোক্তার কাছ থেকে জামানত দাবি করে থাকে। কিন্তু ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদের পক্ষে এ ধরনের বন্ধকী বা জামানত প্রদান করাটা প্রকৃতই একটা সমস্যা, বিশেষ করে নবীন উদ্যোক্তাদের পক্ষে, সাধারণভাবে যাদের নিজস্ব সম্পত্তি থাকবার কথা নয়। সমস্যাটি নিরসনকল্পে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদের পক্ষে ব্যাংককে নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে বিসিকের আওতায় একটি ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম প্রবর্তনের কথা শিল্পনীতি ১৯৯১তে বর্ণিত আছে।[৪৩] কিন্তু অদ্যাবধি তা বাস্তবায়িত হয়নি।

শিল্পনীতি ১৯৯৯তে বলা হয়েছে, বিসিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বিশেষ ঋণ প্রাপ্তির (ক্রেডিট লাইনের) ব্যবস্থা করবে।[৪৪]

তবে সম্প্রতি সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে সীমিত পরিসরে কতিপয় বাণিজ্যিক ব্যাংকের আওতায় ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম চালু করেছে। কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে এখনো অনেক উদ্যোক্তাই জানেন না। অধিকন্তু এটিকে ব্যাপক পরিসরে বাস্তবায়নের ব্যাপারে ব্যাংকগুলোর

Dhaka University Institutional Repository

উদ্যোগ এখনো পর্যাপ্ত নয়। এর কার্যকারিতা বা সুফল নিশ্চিত করতে হলে এ স্কিমের পরিধি যেমন বাড়ানো দরকার, তেমনি প্রয়োজন সম্প্রসারিত পর্যায়ে এর বাস্তবায়ন।

বন্ধকী গ্রহণই ঋণ আদায়ের একমাত্র রক্ষাকবচ নয়। উপযুক্ত প্রকল্পে উপযুক্ত উদ্যোক্তাকে ঋণ দিয়ে সঠিক পন্থায় তত্ত্বাবধান করলে বন্ধকী ছাড়াই ঋণ আদায় হওয়া সম্ভব এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে এ ধরনের তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করা খুবই সহজ। আর এটি করতে না পারলে বন্ধকী রেখেও যে ঋণ আদায় হয় না, ব্যাংকগুলোর কোটি কোটি টাকার ঋণ বকেয়া পড়ে থাকার দৃষ্টান্ত সেটিও প্রমাণ করে।[৪৫]

খেলাপী সংস্কৃতির দ্বিবিধ প্রভাব ঃ খেলাপী ঋণের যে সংস্কৃতি এদেশের আর্থিক খাতের ওপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে আছে, তার পেছনে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি যেমনি রয়েছে, তেমনি রয়েছে ঋণ পরিচালনা ব্যবস্থার ব্যর্থতাও। কিন্তু কারণ যাই থাকুক, ফলাফল দাড়াচ্ছে যে, প্রথমত বিপুল অঙ্কের খেলাপী ঋণের কারণে ব্যাংকের নতুন ঋণের উৎসে টান পড়ছে (টাকা পড়ে থাকা সত্ত্বেও উদ্যোক্তারা যে তা নিচ্ছেন না, সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ।) দ্বিতীয়ত ঋণ প্রদানের ব্যাপারে উদ্যোক্তাদের প্রতি ব্যাংকের আস্থা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে, অধিকাংশ খেলাপী ঋণ গ্রহীতা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তা না হয়েও অন্যদের ব্যর্থতা ও অপকর্মের দায়ভার তাদের বহন করতে হচ্ছে। কিন্তু বিরল ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে ঋণ আদায়ের হার এখনো অন্যান্য খাতের তুলনায় সন্তোষজনক এবং এ খাতের অভ্যন্তরে আবার উদ্যোক্তা যত ছোট ঋন পরিশোধের হার ততো ভালো। বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তাই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের ঋণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কিভাবে ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করা যায়- ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর তা ভেবে দেখা উচিত। আর বাজার অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণমুক্ততার শর্ত মেনে নিয়ে এবং ব্যাংকের বাণিজ্যিক মুনাফার সাথে আপোষ না করেও সেটা সম্ভব বলে তথ্যভিত্তিক মহল মনে করেন।[৪৬]

উপযুক্ত প্রশিক্ষণ সুবিধার অভাব ঃ ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার প্রাকযোগ্যতা ও দক্ষতার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নের ব্যাপারে বিসিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কিছু সীমিত কর্মসূচি থাকলেও সেগুলোর গুণগত মান আরো উন্নত করার প্রয়োজন রয়েছে। অন্যদিকে, শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য সীমিত পরিসরে হলেও যে প্রশিক্ষণ সুবিধা রয়েছে,

Dhaka University Institutional Repository

ট্রেড ভিত্তিক কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সে ধরনের প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), বাংলাদেশ প্রযুক্তি ইনষ্টিটিউট (বিআইটি) এবং পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের বাইরে দেশে যে সকল কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলোর প্রশিক্ষণের মান খুবই নিম্নস্তরের। তদুপরি সে সব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষিতরা কিভাবে শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে পারেন, সে বিষয়ে তাদের মধ্যে প্রশিক্ষণকালে কোনরূপ সমন্বিত ধারণা প্রদান করা হয় না। বিষয়টি অবশ্য বুয়েট, বিআইটি এবং পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটগুলোর ক্ষেত্রেও সত্য। এ ব্যাপারে বিসিক ও অন্যান্যরা এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে ঐ সকল শিক্ষায়তনের ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য উদ্যোক্তা বৃত্তিমূলক সমন্বিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। আর এ ধরনের প্রশিক্ষণের ফলে উদ্যোক্তাদের মধ্যে কারিগরি ও ব্যবস্থাপনাগত জ্ঞানের যে বিকাশ ঘটবে, তা নতুন শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক হবে এবং তাতে ব্যাংকগুলোর পক্ষে সহজে তাদের অনুকূলে ঋণ ছাড় করা সম্ভব হবে ও এক্ষেত্রে তারা আস্থা খুঁজে পাবেন।[৪৭]

২.৩ ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়নের জন্য সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ

ক্ষুদ্র শিল্পে সহায়তাকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে রয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোক্তাগণ বেশির ভাগ অশিক্ষিত হওয়ার কারণে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের খবর তাদের অনেকেই জানেন না।

১. বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ঃ বাংলাদেশকে দ্রুত শিল্পায়িত করার উদ্দেশ্যে নতুন শিল্প স্থাপন, চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর সুষমকরণ/ আধুনিকীকরণ, যন্ত্রপাতি পরিবর্তন ও সম্প্রসারণের জন্য শিল্পোদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদান ও পরামর্শ দেওয়া শিল্পব্যাংকের প্রধান কাজ। শিল্পব্যাংক শিল্পোদ্যোক্তাদের প্রকল্প নির্বাচন, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে পরামর্শ দান করে থাকে।[৪৮]

২. বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা ঃ শিল্পখাতে ঋণদানের সুযোগ সৃষ্টি, শিল্প সম্পর্কিত সহযোগিতা বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ ক্ষেত্র সম্প্রসারনের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা স্থাপন করা হয়। এ সংস্থা প্রধানত এ সংস্থার সাহায্য প্রাপ্ত প্রকল্প সমূহের সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য অর্থ সাহায্য প্রদান করছে। সাম্প্রতিকালে এ সংস্থা ব্যাংকিং কার্যাবলী পরিচালনারও অনুমোদন লাভ করছে।[৪৯]

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৪

স্বাধীনতাযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকে জুন ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্পঋণ সংস্থার ঋণের আকার বন্টন।

ঋণের আকার	শিল্পের ইউনিটের সংখ্যা	%	ঋণের পরিমাণ মিলিয়ন টাকা	%
২৫ লাখ পর্যন্ত	৪৮৬	৪২.৪৫	৫৭৯.৯৩	৭.৩২
২৫-৫০ লাখ	২৫৮	২২.৫৩	৯৬৭.৮৫	১২.২১
৫০-১০০ লাখ	২৩৪	২০.৪৪	১৭৪৮.০৩	২২.০৬
১০০-২০০ লাখ	৮৭	৭.৫৯	১২১০.৯৩	১৫.২৮
২০০-উপরে	৮০	৬.৯৯	৩৪১৮.৪০	৪৩.১৩
মোট	১১৪৫	১০০.০০	৭৯২৫.১৪	১০০.০০

উৎস ঃ BSB Research and Statistics department, March, 1981.

৩. **ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ ঃ** আইসিবি বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ১৯৭৬ সালের ১ অক্টোবর নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়-

- বিনিয়োগ ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান ও সম্প্রসারণ করা;
- পুঁজি বাজার উন্নয়নে সাহায্য করা;
- সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে অর্থ সংক্রান্ত কাজে লাগানো; এবং
- উপরি-উক্ত কাজে সকল প্রকার সাহায্য প্রদান।[৫০]

৪. **বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ঃ** কৃষির সামগ্রীক উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদান ছাড়াও কৃষিভিত্তিক এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসমূহকে এ ব্যাংক আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। সারা দেশে এদের অনেক শাখা রয়েছে।[৫১]

৫. **বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) ঃ** বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে নিয়োজিত সরকারি মুখ্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠান। এ সংস্থার প্রধান কাজ এ শিল্প সমূহের উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ পূর্ব পরামর্শ দান, শিল্প সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ, উদ্যোক্তা সনাক্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প নির্বাচন, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা, প্রকল্পের অর্থ সংস্থান ও ঋণ সরবরাহ, শিল্প নগরী স্থাপন, অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান, ম্যাশিনারী চিহ্নিতকরণ ও সংগ্রহে সাহায্য, সাব-কন্টাকটিং পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন, যথোপযুক্ত উৎপাদন প্রক্রিয়া নির্ধারণ, বাজার সমীক্ষা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংক্রান্ত প্রকাশনা প্রভৃতি। এ সংস্থা নিজস্ব উৎস এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা করে। শিল্পোদ্যোক্তাদের কাছে সংস্থার সাহায্য সমূহ পৌছে দেওয়ার জন্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শাখা স্থাপন করা হয়েছে।[৫২]

৬. রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ ঃ শিল্প ও ব্যবসা উন্নয়নে দেশের চারটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক যথা-সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক ও রূপালী ব্যাংক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এ সব ব্যাংক দেশব্যাপী শাখা বিস্তারের মাধ্যমে সর্বস্তরের শিল্পোদ্যোক্তাদের চলতি পুঁজির সিংহভাগ চাহিদা মেটানো ছাড়াও অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে। বিগত কয়েক বছর এসব ব্যাংক ক্ষুদ্রশিল্প ও বহু আয় অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানকে মধ্য মেয়াদী ভিত্তিতে স্থায়ী পুঁজি সরবরাহের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো চলতি পুঁজি সরবরাহের পাশাপাশি ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মধ্য মেয়াদী ঋণ প্রদান করছে। গবাদি পশু পালন ও দুগ্ধ খামার স্থাপন, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী খামার প্রতিষ্ঠা, আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি এবং আয় উপার্জনকারী কর্মসূচির জন্য রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক অর্থ যোগান দিয়ে গ্রামীন অর্থনীতির উন্নয়নে অবদান রাখছে। মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পে অর্থ সংস্থানের জন্য বিশেষ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে।[৫৩]

৭. ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাষ্টিজ এন্ড কমার্স (বেসিক) ঃ বেসিক প্রথমে বাংলাদেশ সরকার ও বেসরকারি খাতের যুগ– প্রচেষ্টা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে একটি সরকারি ব্যাংক। এর প্রধান কাজ নিজস্ব উৎস এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তহবিল থেকে ক্ষুদ্র শিল্প খাতকে মধ্য মেয়াদী ও চলতি পুঁজির ঋণ সরবরাহ করা। অতি সম্প্রতি এ ব্যাংক মাইক্রো এন্টারপাইজ উন্নয়নের লক্ষ্যে মাইক্রো ক্রেডিট কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে এ ব্যাংকের শাখা রয়েছে।[৫৪]

Dhaka University Institutional Repository

৮. বেসরকারি ব্যাংকসমূহ ঃ দেশী-বিদেশী ব্যাংক মিলে বাংলাদেশে বর্তমানে বেসরকারি খাতে অনেকগুলো ব্যাংক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এ সবের মধ্যে ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ, দি সিটি ব্যাংক লিঃ, ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ, ন্যাশনাল কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ, আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক, গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক, ইন্দোসুয়েজ ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, (আমেরিকা), ন্যাশনাল ব্যাংক (পাকিস্তান) লিঃ, এবি ব্যাংক লিঃ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, আল বারাকা ব্যাংক লিঃ, প্রাইম ব্যাংক লিঃ, নর্থ-সাউথ ব্যাংক লিঃ, ঢাকা ব্যাংক লিঃ, সোসাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ প্রভৃতি। উল্লেখযোগ্য শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদান এসব ব্যাংকের অন্যতম কাজ।[৫৫]

৯. বীমা কোম্পানী ঃ সাধারণ বীমা করপোরেশন ও জীবনবীমা করপোরেশন দুটি সরকারি বীমা কোম্পানীর পাশাপাশি বেসরকারি খাতে বেশ কয়েকটি বীমা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। এরা বিভিন্নভাবে শিল্প ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছে।[৫৬]

১০. ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট লিজিং কোম্পানী (আইডিএলসি) ঃ দেশের শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নয়নের জন্য লিজিং কোম্পানীর ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। আইডি এলসি ইজারা চুক্তির ভিত্তিতে ম্যাশিনারি ও অফিস ইকুইপমেন্ট প্রভৃতি সরবরাহের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়নে সাহায্য করছে।[৫৭]

১১. শিল্প ও বণিক সমিতি ঃ শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্যের উন্নয়নে ও প্রসারের ক্ষেত্রে শিল্প ও বণিক সমিতির ভূমিকা অপরিসীম। বিভিন্ন সমিতি তাদের ব্যবসায় সংক্রান্ত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের ব্যবস্থা করেন। ব্যবসায় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার স্থাপন, সদস্যদের স্বার্থ সংরক্ষণ প্রভৃতি সমিতির কাজ। এসব সমিতির মধ্যে ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাষ্ট্রিজ (এফবিসিসিআই) মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স (এমসিসি), ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাষ্ট্রিজ (ডিসিসিআই) ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব স্মল এন্ড কটেজ ইন্ড্রাষ্ট্রিজ (নাসিব) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৫৮]

১২. কন্ট্রোলার অব ইমপোর্টস ও এক্সপোর্টস (সিআইই) ঃ শিল্প স্থাপন ও পরিচালনা করতে একজন উদ্যোক্তাকে ম্যাশিনারী, কাঁচামাল এবং খুচরো যন্ত্রাংশ আমদানি করতে হয়। রপ্তানিমুখি শিল্পগুলোকে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করার পূর্বে সরকারের অনুমোদন ও

Dhaka University Institutional Repository

রপ্তানির প্রধান নিয়ন্ত্রক বিদেশে থেকে দ্রব্যসামগ্রী আমদানির লাইসেন্স এবং রপ্তানিকারককে এক্সপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইস্যু করে থাকে।[৫৯]

১৩. ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) ঃ এ করপোরেশন শিল্পোদ্যোক্তাদের কাঁচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত পণ্য রপ্তানিতে সাহায্য করে। এছাড়াও কাঁচামালের নতুন উৎসের সন্ধান ও উৎপাদিত পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।[৬০]

১৪. বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সাইন্টিফিক এন্ড ইন্ড্রাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ (বিসিএসআইআর) ঃ বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের বাস্তব প্রয়োগের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ পরিষদ শিল্প প্রতিষ্ঠানে গবেষণা সেল স্থাপন, দেশীয় প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়া উন্নয়ন এবং শিল্প ক্ষেত্রে প্রয়োগের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে।[৬১]

১৫. বাংলাদেশ ইন্ড্রাষ্ট্রিয়াল টেক্নিক্যাল এসিসট্যান্স সেন্টার (বিটাক) ঃ বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়ক কেন্দ্র সংক্ষেপে বিটাক দেশের শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতার জন্য প্রশিক্ষণ দান, নতুন যন্ত্রপাতি ও ডিজাইনের সাথে টেকনিশিয়ানদের পরিচিত করা, যন্ত্রপাতি স্থাপনের সময় উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে উপদেশ প্রদান, কারিগরি সংক্রান্ত পুস্তিকা প্রকাশ, সেমিনার সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা করা, প্রদর্শনী চলচ্চিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে আধুনিক কারিগরি ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত জ্ঞান এ প্রতিষ্ঠান দান করে।[৬২]

১৬. বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেষ্টিং ইনষ্টিটিউট (বিএসটিআই) ঃ এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে উন্নতমানের দ্রব্য উৎপাদনে সহায়তা করা যাতে দেশী ও বিদেশী বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে। বাংলাদেশের উৎপাদিত দ্রব্য দেশী ও বিদেশী বাজারে প্রতিযোগিতার সামর্থ্য অর্জনের জন্য উৎপাদিত দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য এ সংস্থা ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।[৬৩]

১৭. বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজম্যান্ট (বিআইএম) ঃ শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দক্ষ ব্যবস্থাপক সরবরাহের জন্য এ সংস্থা প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে। এসব কোর্সে

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পোদ্যোক্তা নিজে বা তার ফার্মের ব্যবস্থাপকগণ অংশগ্রহণ করে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারে।[৬৪]

১৮. গ্রামীন ব্যাংক ঃ গ্রামীন ব্যাংক ক্ষুদ্র শিল্পের বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদান করে থাকে। নিম্নের সারণীতে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত ক্ষুদ্রশিল্পের বিভিন্ন খাতে গ্রামীন ব্যাংকের ঋণ প্রদানের নমুনা নিম্নে দেখানো হলঃ (হাজার টাকায়)

সারণী-৫

ক্ষুদ্রশিল্পের বিভিন্ন খাতে গ্রামীন ব্যাংকের ঋণ

প্রদানের পরিমাণ (হাজার টাকায়)

সেক্টর	পরিমান	% (মোট)
এগ্রিকালচার এন্ড ফরেস্ট্রি	১,৩৮২	১.৪
লিভস্টক এন্ড ফিশারিজ	২৫,৮৫০	২৬.০
প্রসেসিং এন্ড ম্যানুফেকচারিং	২৫,৯৩৬	২৬.২
ট্রেডিং এন্ড সপ কিপিং	৩৭,৬৩৮	৩৭.৯
ট্রান্সপোর্ট সারভিসেস	৫,৮৩০	৫.৯
কালেকটিভ এন্টারপ্রাইজেস	২,৬১২	২.৬
মোট	৯৯,২৪৮	১০০.০

উৎস ঃ Momtaz Uddin Ahmed, The Financing of Small Scale Industries A Study of Bangladesh and Japan.

১৯. মাইক্রোইন্ড্রাষ্টিজ ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড সার্ভিসেস (মাইডাস) ঃ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন প্রচেষ্টা (মিডি)-এর আওতায় মাইডাস সহজ শর্তে স্বল্প মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। বর্তমানে ব্যবসায় চালিয়ে যাচ্ছে এমন উদ্যোক্তাদেরকে তাদের ব্যবসায় প্রসার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে এ সমস্ত ঋণ প্রদান করা হয়।[৬৫]

Dhaka University Institutional Repository

২.৩.১ মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্প

চলমান সময়ে অর্থনীতির জগতে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়ের নাম মুক্তবাজার অর্থনীতি (Free market Economy)। বিশেষত আশির দশকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের পতনের পর মুক্তবাজার অর্থনীতির বিষয়টি ফুলে-ফলে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। তার কারণ হলো সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো আদেশমূলক অর্থনীতিতে (Command Economy) বিশ্বাসী ছিল। পক্ষান্তরে মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রধান শর্তই হচ্ছে সরকারি আদেশমূলক প্রবণতার উচ্ছেদ। তাই বলে মুক্তবাজারের সরকারি কোন নিয়ন্ত্রণই থাকবে না এটা ঠিক নয়। মুক্তবাজার হচ্ছে মুক্ত প্রতিযোগিতার কার্যক্ষেত্র। অতএব, এই মুক্তপ্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টিতে সরকারের যা যা করা প্রয়োজন সরকার সেটা করবেই। কিন্তু ফলাফল নিয়ন্ত্রণে হাত দেবে না। কারণ, এতে ফলাফল স্বতঃস্ফুর্ত হতে পারে না।

ফুটবল খেলার রেফারী কখনো ফলাফল নিয়ন্ত্রণে প্রভাব খাটায় না। শুধু সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে মাত্র।[৬৬]

আশির দশকের মাঝামাঝি বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ প্রভাবিত সংস্কার কর্মসূচি বাংলাদেশে মুক্তবাজার প্রতিষ্ঠার এক ব্যাপক অধ্যায়ের সূচনা করে। কেননা সংস্কার কর্মসূচির চারটি প্রধান স্তম্ভ ছিল। ১. আন্তর্জাতিকায়ন (Globalization), ২. উদারিকরণ (Liberalization), ৩. নিয়ন্ত্রণ মুক্তি (Dencgulation), ৪. ব্যক্তিগতায়ন (Privatization).

এগুলো মুক্তবাজারকে ত্বরান্বিত করে। নব্বই দশকের শুরু থেকে মুক্তবাজারের আদর্শ থেকে বাংলাদেশ অবাধ বৈদেশিক বিনিয়োগ আহ্বান করে। শেয়ার বাজারও বিদেশীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ১৯৯৪ সালে গ্যাট-এ স্বাক্ষর করেছে এবং ১৯৯৫-এর ডিসেম্বর থেকে সাপটা কার্যকর হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ একই সাথে দক্ষিণ এশিয়া এবং বিশ্ব প্রেক্ষাপটে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রবেশ করেছে।[৬৭]

মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে কিভাবে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও নতুন নতুন শিল্পকে এগিয়ে নেয়া যায়, সে বিষয়ে বিশদ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বহু উপায়ে দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করা যায়। এর মধ্যে বিদেশী পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক বসিয়ে এবং দেশী শিল্পকে ভর্তুকী বা অর্থ সাহায্য করাই প্রধান সংরক্ষণ নীতি কিনা, সে বিষয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। জার্মান লেখক বলেন, শিশুকে যেমন সংরক্ষণ ও লালন পালন করা প্রয়োজন, দেশের শিশু শিল্পকে

Dhaka University Institutional Repository

শিশু অবস্থাতেও তেমনি বিদেশী প্রতিযোগিতা হতে রক্ষা করা উচিত। শিশুগুলোও শিশু অবস্থায় অনেকটা অসহায়। অনেক শিল্পেরই ভবিষ্যত হয়ত উজ্জ্বল। উৎপাদন ব্যয় বেশি হলেও বড় হবার পর উৎপাদন ব্যয় কমতে পারে। কিন্তু শিশু অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতার মুখে বাংলাদেশের শিল্প সমূহ দাড়াতে বা বাড়তে পারে না। প্রাথমিক পর্যায়ে শিশু শিল্পের অনেক অসুবিধা দেখা দেয়। এ সময় যদি তাদের সংরক্ষণ করা হয়, তবে ভবিষ্যতে এরা বিদেশী উৎপাদকের সাথে প্রতিযোগিতা চালাতে পারবে। সংরক্ষণের ফলে সাময়িক ক্ষতি হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হলে সে ক্ষতি পুষিয়ে যাবে। বিভিন্ন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের লোকের শারিরীক ও মানসিক বৃত্তির পূর্ণবিকাশ ঘটবে। যার যে ধরনের বৃত্তি সে ঠিক সেই ধরনের কাজ খুঁজে নিতে পারবে।[৬৮]
আমেরিকা, জাপানের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যের ভারসাম্যের পার্থক্য আকাশ পাতাল। অথচ মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে সমগ্র দেশকেই বিদেশীদের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের ইনফ্যান্ট ইন্ডাষ্ট্রিগুলোর সংরক্ষণ প্রয়োজন। সে লক্ষ্যেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কিছু কিছু রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ রেখে সুনির্দিষ্ট কিছু কিছু ক্ষেত্রেই কেবল বিদেশীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া যেতে পারে। অন্যদিকে বিদেশী বিনিয়োগ/বিদেশী পুঁজি, বিদেশী প্রযুক্তি, বিদেশী-পণ্য ও সেবার ওপর দেশ এমনভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে যে, বিদেশী মুদ্রার ভান্ডার এখানে মওজুদ না হয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে। অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে সংগঠিত শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে মুক্তবাজার অর্থনীতির ধারণাটি স্বচ্ছভাবে রূপ নিতে শুরু করে।[৬৯]

গ্যাট চুক্তি অর্থনৈতিক শক্তিধর দেশসমূহের পক্ষে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এ চুক্তিতে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ স্বাক্ষর করলেও প্রধান লাভটা হয়েছিল মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের। তার পণ্য বিক্রি করার দরকার, তার একটা বাজার দরকার। জাপানের দ্রব্যে যুক্তরাষ্ট্র ছেয়ে গেছে কিন্তু তারা জাপানকে চাপ দিয়ে যাচ্ছে মার্কিন পন্যের উপর বিধিনিষেধ তুলে নিতে হবে। মূলকথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য, বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সব কিছুই করছে।[৭০]

বস্তুত, মুক্তবাজার অর্থনীতির ব্যাপারে নবীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের এখনই এতটা হওয়া উচিত ছিল না। কারণ বিদেশী পণ্য ও বাজার-এর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে না থাকায় এদেশের বাজার ক্রমশ বিদেশের পন্যে ছেয়ে যাচ্ছে এবং উল্টা পথে বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে কড়া শর্ত আরোপ করতে না পারায় বাংলাদেশ বিদেশে তার পন্যের বাজার সৃষ্টি করতে পারছে

Dhaka University Institutional Repository

না। নিজ দেশে নিয়ন্ত্রণ থাকলে বিদেশে বাজার সৃষ্টি করা বাংলাদেশের জন্য সহায়ক ছিল। ফলে নিজ দেশও বিদেশী বাজারে পরিনত হল। বিদেশী বাজারও ধরা গেল না। বাস্তবিকই এ পাবার অক্ষমতাটা হলো মুক্তবাজার অর্থনীতির হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দেয়ার পরিনাম। এটা মনে রাখা দরকার যে, মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে নিজেদের সদয় বানিয়ে ফেলা কোনক্রমে কাম্য নয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশের নীতি নির্ধারক ও রাষ্ট্রীয় কর্নধারদের ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহন করা আবশ্যক।[৭১]

২.৩.২ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র শিল্পের ভূমিকা

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র শিল্পের গুরুত্ব বাড়িয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। এই শিল্পগুলো শ্রম গভীর এবং দেশজ কাঁচামাল মূলধন সরঞ্জামের উপর নির্ভরশীল। অধিকাংশ উন্নয়ন কর্মসূচিতে এই সেক্টর মূলধন বাঁচায় এবং এতে আংশিকভাবে শ্রমশক্তি নিয়োজিত থাকে।[৭২]

R.K. Vepa লিখেছেন, The Small-scale industry as a powerful tool to activate the weaker regions and sections of the country.

তিনি আরও বলেন, It needed to be called poor peoples development.[৭৩]

এ প্রসঙ্গে M.R. Kamal এর মন্তব্য হচ্ছে, The Contribution from small-scale and cottage industries to the economy of Bangladesh is significant and its future potential is very great.[৭৪]

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রয়েছে গৌরবময় ঐতিহ্য। ঢাকার মসলিন ও টাঙ্গাইল শাড়ি চমৎকার বস্ত্র হিসেবে বর্হিবিশ্বে সমাদৃত। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প, স্বর্ণ, রৌপ্য, সিল্ক, কটন, চামড়া ইত্যাদি বিখ্যাত কাজও ক্ষুদ্র শিল্পের আওতাভুক্ত।[৭৬]

ক্ষুদ্র শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক অদ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। দারিদ্র দূরীকরণে এ শিল্পের অবদান অপরিসীম। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান ধরা হয়েছিল ০.৪ মিলিয়ন কিন্তু ক্ষুদ্র শিল্পে প্রকৃত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ০.৩৫ মিলিয়ন। বর্তমানে ক্ষুদ্র শিল্প খাতে ৫ মিলিয়ন লোক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নিয়োজিত করেছে, যা মোট শিল্পীয় শ্রম শক্তির শতকরা ৮২%।

Dhaka University Institutional Repository

বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্র শিল্পে তুলনামূলকভাবে বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

- কম মূলধন বিনিয়োগ;
- একক প্রতি বিনিয়োগকৃত মূলধনের তুলনায় অধিক কর্মসংস্থান;
- উৎপাদন অনুপাতে কম মূলধন;
- কম অবকাঠামো প্রয়োজন হয়;
- সময় বাঁচায়;
- ক্ষুদ্র মেধাবী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করে;
- কমশক্তি ভোগ হয়;
- পরিবেশগত ঝুঁকি হ্রাস করে; এবং
- ব্যক্তিগত সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে এবং গ্রামীন সংযোগ শিল্পের প্রসার ঘটায়।[৭৭]

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এখনও কৃষির ভূমিকা সর্বাধিক। কিন্তু ভূমির স্বল্পতা ও অন্য নানাবিধ কারণে কৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ ক্রমশ সীমিত হয়ে আসায় এবং এখাতে নয়া কর্মসংস্থান সৃষ্টির আর তেমন কোন সুযোগ না থাকার প্রেক্ষাপটে শিল্পায়নকেই এখন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। তবে সে ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি যে সব দিক থেকে সহজ বিকাশের উপযোগী, এমনটি বলা যাবে না। পুঁজির স্বল্পতা, অবকাঠামোগত পশ্চাৎপদতা, প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতা, দক্ষ জনশক্তির অভাব সর্বোপরি ঝুঁকি গ্রহণে আগ্রহী সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তার অভাব প্রভৃতি কারণে বৃহৎ শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রচুর প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে এ সমস্যাগুলো তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম। অন্যদিকে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লী উন্নয়ন প্রভৃতি দিকের বিবেচনায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের একটি স্বতন্ত্র ভূমিকা রয়েছে। আর বিশ্ব অর্থনীতির অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর সব শিল্পোন্নত দেশই তাদের শিল্পায়নের প্রাথমিক স্তরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নকেই শিল্পোন্নয়নের অন্যতম কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে। এটি বৃহৎ শিল্পের একটি নির্ভরযোগ্য ভিত্তি গড়ে তুলবার জন্য তেমনি প্রয়োজন, তেমনি শিল্পের গতিশীল বিকাশকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে অগ্র ও পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পের

Dhaka University Institutional Repository

সমর্থন নিশ্চিত করার জন্যও অপরিহার্য। আর এসব দিকের বিবেচনা থেকেই বলা চলে যে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ভূমিকা শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয় শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে এদেশের জাতীয় প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের প্রেক্ষাপটে এবং একই সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের টেকসই কৌশল হিসেবে এর পরিকল্পিত বিকাশও একান্তই অপরিহার্য। স্বল্প মাথা পিছু আয় ও নিম্ন সঞ্চয় হারের কারণে যে কোন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে পুঁজি একটি বড় সমস্যা। অথচ ব্যাপক দারিদ্র্য পীড়িত বিপুল বেকারত্বের এদেশে উৎপাদন বৃদ্ধি ও নয়াকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন দ্রুত বিনিয়োগ, বিশেষ করে শিল্পখাতে। কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য চাই বিরাট অংকের পুঁজি, যার জন্য প্রতিনিয়ত এখন বাংলাদেশকে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের পেছনে হন্যে হয়ে ছুটতে হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের নিজস্ব সীমিত পুঁজিতে যে ধরনের এগিয়ে যাওয়া সম্ভব সেটি হচ্ছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প। এখানে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ সর্বাধিক মূল্য সংযোজনের হার সর্বোচ্চ, বিনিয়োগের তুলনায় উৎপাদনের এবং বিনিয়োগ থেকে উৎপাদনে যাবার কাল এখানে সর্বনিম্ন। সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, দেশে শিল্পখাতে মোট বিনিয়োগের ৭২% ব্যবহৃত হচ্ছে বৃহদাকার শিল্পে এবং তা রিটার্ন দিচ্ছে মোট শিল্পোৎপাদনের ৫৮%। পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে বিনিয়োগের পরিমান শিল্পখাতে মোট বিনিয়োগের মাত্র ২৮% হলেও এখান থেকে রিটার্ন পাওয়া যাচ্ছে মোট শিল্পোৎপাদনের প্রায় ৪২%। মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপিতে শিল্পখাতের মোট অবদান এখন প্রায় ১২%। এর মধ্যে ৫.৫% ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের অবদান। কর্মসংস্থানের চিত্রটিও প্রায় অনুরূপ। শিল্পখাতে নিয়োজিত মোট শ্রমশক্তির ৮২%ই নিয়োজিত রয়েছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে যদিও এখাতে বিনিয়োগের পরিমান শিল্প খাতে মোট বিনিয়োগের মাত্র ২৮% যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর বিনিয়োগের পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে উৎপাদন বা রিটার্ন পাওয়ার ক্ষেত্রে উৎপাদনমূলক কর্মকান্ডে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কোন বিকল্প নেই বললেই চলে।[৭৮]

রাস্তাঘাট, রেল, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদি অবকাঠামোগত ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে পশ্চাৎপদতা রয়েছে তাতে বৃহৎ শিল্প স্থাপনের বিষয়টি এখানে এখনও আশানুরূপ অনুকূল নয় তবে সীমিত অবকাঠামোগত সুবিধা নিয়েও কিন্তু ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের বিষয়টির কথা চিন্তা করার সুযোগ রয়েছে। তদুপরি অবকাঠামোগত সুবিধা লাভের জন্য ভারি শিল্পের ন্যায়

Dhaka University Institutional Repository

এখানে শিল্পের কেন্দ্রীভূতকরণ ও শ্রমশক্তি স্থানান্তরের কারণে আবাসিক সমস্যাসহ যে বহুবিধ সামাজিক সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে তার সম্ভাবনা খুবই অল্প। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারগত দিকের সাথে সুপরিচিত দক্ষ শ্রমিক ও কারিগরের সংখ্যা এখানে বাস্তবে অত্যন্ত সীমিত। অথচ ভারী শিল্পের মূল শর্তই হচ্ছে আধুনিক বা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি পরিচালনায় সক্ষম দক্ষ শ্রমশক্তির সংশ্লিষ্টতা। বাংলাদেশের প্রচলিত ধাচের শ্রমশক্তি এবং তাদের দক্ষতার যে স্তর, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারি শিল্পের জন্য উপযোগী নয়। অথচ বিপুল বেকারত্বের এদেশে তাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাটা আজ এক অপরিহার্য জাতীয় কর্তব্য। অন্যদিকে বাংলাদেশে বিদ্যমান ঐতিহাসিক সূত্রের দক্ষতার বিকল্প ব্যবহারের যে কোন সুযোগ বা বাজারের চাহিদা নেই সরাসরি এমনটি বলা যাবে না। উল্লেখিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের বাজারে প্রাপ্য প্রচলিত ধাচের শ্রমশক্তি ব্যবহারের সর্বোত্তম বিকল্প ক্ষেত্র হচেছ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প। একইভাবে প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে অগ্রসরতা এবং যে ক্ষেত্রে প্রায় পরিপূর্ণ নির্ভরতা এদেশের আমদানিকৃত প্রযুক্তির উপর, সেখানে প্রচলিত ধাচের লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ ও সম্ভাবনা বলতে গেলে মূলত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পেরই বিদ্যমান।[৭৯]

মানবজাতির নিজস্ব স্বার্থেই শিল্প ও অন্যান্য দূষণ থেকে এ ভূমন্ডলকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এখন বিশ্বব্যাপী পরিবেশ রক্ষার যে ব্যাপক তৎপরতা তার সাথে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিরোধ খুবই অল্প, যে বিরোধ ভারি শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে শুধু বিপুলই নয়- প্রকটও। ফলে সেদিক থেকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প শুধু বাংলাদেশ কেন, শিল্পোন্নত দেশগুলোতেও বিনিয়োগ নীতি নির্ধারকদের অন্যতম পছন্দ। তাছাড়া শিল্পায়নের সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী এবং নীতি নির্ধারকদের প্রধান নির্ভরতা ও ক্ষুদ্রশিল্প। এশিয়ার তথা বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশসমূহের অন্যতম জাপান তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। জাপানের মোট শিল্পকারখানার ৯৬% হচ্ছে ক্ষুদ্র শিল্প। (যেখানে ইউনিট প্রতি শ্রমিকের সংখ্যা ৫০ জনের কম) এবং সেখানকার মোট শিল্প জনশক্তির ৬৬%-ই এ খাতে নিয়োজিত। শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে আজ জাপানের যে বিস্ময়কর সাফল্য সেটা মূলত অর্জিত হয়েছে শিল্পায়নের কৌশল হিসেবে সেখানে ক্ষুদ্র শিল্পকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়ার কারণে। সে প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে সেখানে শিল্পায়নের একটি মজবুত ভিত্তি গড়ে উঠেছে। শ্রম বিভাজনের (Division of labour) আধুনিক ধারণাকে কাজে লাগিয়ে ছোট ছোট অসংখ্য শিল্প

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপনের মাধ্যমে বিশেষায়িত দক্ষতা (Specialisation of skill) ব্যবহার করে তারা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে শিল্পখাতে বিশ্বের সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতার হার। অগ্র ও পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পের সুষম বিকাশের ধারাটিকেও তারা নিশ্চিত করেছে এই ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে। আর আধুনিক বিশ্বে শিল্পখাতে সাবকন্ট্রাটিং সংযোগ ব্যবস্থার সফল প্রবর্তনের অগ্রদূত জাপানের এ উদ্যোগটিও প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষুদ্র শিল্পের দক্ষ বিকাশের ধারণাই সমার্থক। যেসব বিবেচনা থেকে জাপান তার শিল্পোন্নয়নের বিকাশে ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশের উপর এতটা গুরুত্বারোপ করেছে সে একই বিবেচনা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শুধু সমান ভাবেই নয়, বরং অধিকতর হারে প্রযোজ্য। কারণ উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির তাগিদ ছাড়াও এদেশের রয়েছে বিপুল বেকার জনশক্তি মোকাবেলার চাপ, সে জনশক্তিকে কাজে লাগাবার সুযোগ মূলত এই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পেই রয়েছে। পরিসংখ্যানের মাত্রা নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও বিভিন্ন মতের সমন্বিত ফলাফল হিসেবে বলা যেতে পারে যে, দেশের অন্তত তিন চতুর্থাংশ (মোট জনসংখ্যার ৭৫%) লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছে। তন্মধ্যে চরম দরিদ্রের সংখ্যা অন্তত ৬০%। যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, দেশের অন্তত ৭.২০ কোটি লোক অতি দরিদ্র ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করছে। দেশের এই বিপুল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটতে না পারলে জাতি হিসেবে এদেশের জনগণের এগিয়ে যাবার পথ অধিকতরভাবে কন্টকাকীর্ণ হতে বাধ্য। কিন্তু এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কোথাও কাজে নিয়োজিত করে তাদের আয়-উপার্জন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ আর যেখানেই থাকুক না কেন, অন্তত কৃষি খাতে যে আর নেই তা মোটামুটি নিশ্চিত করেই বলা যায়। কারণ, কৃষিখাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির অন্তত ৫০% ছদ্মবেকার। ফলে কৃষিতে উচ্চতর উৎপাদনশীলতা অর্জনের স্বার্থে সেখানে নতুন শ্রমশক্তি নিয়োগের পরিবর্তে বরং ছদ্ম বেকারদেরকে যত দ্রুত কৃষি বহির্ভূত খাতে স্থানান্তর করা যাবে ততই মঙ্গল। অন্যদিকে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মদক্ষতার সাধারণ যে স্তর তাতে তাদেরকে আধুনিক ভারি শিল্পে নিয়োগ করা যাবে তাও নয়। এমন পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পই কেবলমাত্র এই বিপুল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও তাদের আয় উপার্জন বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের দারিদ্র দূরীকরণের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।[৮৩]

১৯৯৬-৯৭ সালে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-র আকার হচ্ছে প্রায় সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকা। তন্মধ্যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের একমাত্র পোষাক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)-এর অনুকূলে বরাদ্দের পরিমান হচ্ছে ৩০.৭৪ কোটি টাকা যা মোট এডিপি'র ১% এরও কম। অথচ জিডিপিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অবদানের পরিমাণ প্রায় ৫.৫%। এমতাবস্থায় খাতওয়ারী অবদানের সাথে সঙ্গতি রেখে এডিপিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা না হলে এ খাতের গতিশীল বিকাশকে ত্বরান্বিত করা খুবই কষ্টকর হবে। উল্লেখ্য বিসিক একটি সরকারি সংস্থা হলেও এর কাজ হচ্ছে বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা। ফলে বেসরকারি খাতকে অগ্রাধিকার দান নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রাখার স্বার্থেই বিসিক ও এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডকে আরো সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন তাছাড়া পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে বাজার অর্থনীতির নীতিমালার উদ্যোক্তাদের জন্য নিজস্ব দক্ষতা ও যোগ্যতা দিয়ে প্রতিযোগিতা করে বাজারে টিকে থাকবার সামর্থ্য অর্জনের যে তাগিদ রয়েছে তার প্রেক্ষিতে এদেশের ক্ষুদে উদ্যোক্তাদের মুক্তবাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকবার মত উপযোগী করে গড়ে তুলবার প্রয়োজনেও বিসিকের মত প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডকে জোরদার ও বিস্তৃত করা প্রয়োজন। একই লক্ষ্যে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হওয়া দরকার। কারণ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তাগণ এখনো পর্যন্ত তুলনামূলকভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে কম প্রভাবশালী ও অধিকাংশই গ্রামীন অধিবাসী হওয়ার কারণে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা কাঠামোতে (ঋণ ও অন্যান্য) তাদের প্রবেশাধিকার এখনো খুবই সীমিত। ফলে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানিক বিস্তৃতি গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের বিপুল সংখ্যক বিদ্যমান ও সম্ভাবনাময় নতুন উদ্যোক্তাকে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার দোরগোড়ায় পৌছে দেবে। বিসিকের মত প্রতিষ্ঠান সমূহ বর্তমানে উদ্যোক্তাদেরকে যে সকল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক সহায়তা প্রদান করছে, এ প্রক্রিয়ায় সে সকল সহায়তা অধিক সংখ্যক লক্ষ্য জনগোষ্ঠীর নিকট পৌছানো সহজ হবে। দেশে বর্তমানে (১৯৯৬ সাল পর্যন্ত) প্রায় ৪৭,৭০৬টি ক্ষুদ্র শিল্প ও সাড়ে ৪ লাখ কুটির শিল্প রয়েছে। নতুন নতুন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের জন্য বিসিকসহ অন্যান্য সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং কখনো কখনো উদ্যোক্তাগণ নিজেরাই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে এ সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। অথচ এই বিপুল সংখ্যক উদ্যোক্তার জন্য দেশে কোন বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান নেই যারা এদের-অর্থায়নের জন্য কাজ করবে। ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাষ্ট্রিজ এন্ড কমার্স বাংলাদেশ লিমিটেড (বেসিক) নামে বর্তমানে দেশে যে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংকটি রয়েছে, প্রতিষ্ঠার পূর্বে তা স্থাপনের উদ্দেশ্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে অর্থায়ন হলেও পরবর্তীতে 'কমার্স' তার কর্মকান্ডের আওতাভুক্ত হবার ফলে সেটিও অনেকটা অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতোই অধিক হারে বাণিজ্যিক অর্থায়নে কাজ করছে। ফলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সুষ্ঠু ও গতিশীল বিকাশের স্বার্থে অবিলম্বে দেশে একটি বিশেষায়িত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক (Bank of small and cottage Industries BSCI) স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, ঋণ খেলাপী সংস্কৃতির এ দেশে বৃহৎ শিল্পের উদ্যোক্তাদের তুলনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের উদ্যোক্তাদের ঋণ পরিশোধের হার শুধু সন্তোষজনকই নয়- বরং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা মোটামুটি নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করছে বলেই হয়তো আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো অনেকাংশে টিকে আছে।[৮১]

১৯৮৪ সালে বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়, সেগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রস্তুত শিল্প সামগ্রীর অবদান শতকরা প্রায় ২০ ভাগ। এসবের মধ্যে যে সমস্ত শিল্পজাত সামগ্রী উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে, তার মধ্যে রয়েছে চামড়া, চামড়াজাত সামগ্রী, তৈরি পোষাক, হস্ত শিল্পজাত সামগ্রী প্রভৃতি। বাংলাদেশের ক্রমবিকাশমান অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্পের উপর মন্তব্য রাখতে গিয়ে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়, হালকা প্রকৌশলজাত শিল্পগুলো বিকাশের যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে কারণ বড় বড় শিল্পকারখানাগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামত করে এগলো ভাল ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করতে পারে।

দেশের ক্ষুদ্র শিল্পগুলোর সমস্যার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়, ক্ষুদ্র শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশের স্বার্থে এগুলোকে একদিকে আভ্যন্তরীণভাবে বেশ খানিকটা বাধা অতিক্রম করে আসতে হবে এবং বহিঃসূত্র থেকে অধিকতর সাহায্য প্রাপ্তিও নিশ্চিত করতে হবে। এদেশে শ্রমিকদের মাথাপিছু স্বল্প উৎপাদনশীলতাই শিল্প ক্ষেত্রে দৈন্যদশার প্রধানতম কারণ। বিশ্বব্যাংকের হিসেবে বাংলাদেশে মাথাপিছু শ্রমিকের বার্ষিক উৎপাদনশীলতা মাত্র সাড়ে চার হাজার টাকার সমান।[৮২]

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু বৃহৎ অর্থে এবং বৃহত্তর পরিসরে শিল্প বিকাশের জন্য প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় মুদ্রা, কারিগরী দক্ষতা, সুষ্ঠু যোগাযোগ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি ভোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি। বর্তমানে বাংলাদেশ এই সব কয়টি ক্ষেত্রেই দৈন্যদশায় ভুগছে, সেহেতু বৃহৎ শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্র শিল্পের দিকে অধিক পরিমানে মনোনিবেশ করা আজ জাতীয় প্রয়োজন ও চাহিদায় পরিণত হয়েছে।

মোটকথা, দারিদ্র বিমোচন, পল্লী উন্নয়ন, জনগণের আয় বৃদ্ধি, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যকার আয়-বৈষম্য হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৃহৎ শিল্পের ভিত্তি রচনা, পরিবেশ সহনীয় টেকসই উন্নয়ন, প্রচলিত ধাঁচের দক্ষতা ও প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ, স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহারের সুবিধা, স্বল্প পুঁজি ও অবকাঠামোগত চাহিদা ইত্যাদির বিবেচনায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র শিল্পের গতিশীল বিকাশের কোন বিকল্প নেই। প্রবৃদ্ধির ৪%-এর দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে এসে সরকার ঘোষিত ৭%-এর প্রত্যাশাকে স্পর্শ করতে হলে আগামী দিনগুলোতে ক্ষুদ্রশিল্পের প্রতি সরকারের সামষ্টিক নীতিমালার সমর্থন ও অঙ্গীকারের পাশাপাশি ব্যাষ্টিক পর্যায়ে এখাতে যে সকল সমস্যাদি বিদ্যমান রয়েছে তার সমাধানের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। আর তা করা সম্ভব হলে আশা করা যায় যে, জিডিপিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের অবদান আরো বেড়ে যাবে। এ খাতে সৃষ্টি হবে বহু নতুন লোকের কর্মসংস্থান, বাড়বে রপ্তানি এবং সর্বোপরি তা দৃঢ়তর করবে বাংলাদেশের শিল্পায়নের ভিত্তিতে।

২.৪ বিসিকের পরিচিতি

যে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশ বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল ও শিল্প ক্ষেত্রে অনগ্রসর দেশ হিসেবে এদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন ও বিকাশের উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সনে পার্লামেন্টের এ্যাক্ট ১৭-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন সাবেক ইপসিক প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিসিকের লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
- বিদ্যমান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।
- আর্থিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।

Dhaka University Institutional Repository

- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান।
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পণ্যের বিপনন সুবিধা সৃষ্টি করা।
- পণ্য উৎপাদনের নতুন নতুন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- কারিগরদের দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত করা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করা।[৮৩]

শিল্পনীতি ১৯৯৯তে বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন বা বিসিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে দেখাশোনা ও সহায়তা করবে। বিসিক নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করবেঃ

ক) বিশেষ ঋণ প্রাপ্তির (ক্রেডিট লাইনের) ব্যবস্থা করবে;

খ) বিসিকের নিজস্ব শিল্পনগরীতে প্লট বরাদ্দ করবে;

গ) মহিলা, বেকার যুবক, দক্ষ কারিগর, বিদেশ প্রত্যাগত শ্রমিক এবং ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর উপর গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে শিল্পোদ্যোগ বিষয়ক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করবে;

ঘ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে অবকাঠামোগত সুবিধা প্রসারে যত্নশীল থাকবে;

ঙ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে উৎপন্ন পণ্যের বাজার উন্নয়ন কর্মসূচিতে সহায়তা করবে;

চ) ইউনিট নিবন্ধীকরণ এবং উপখাতের কাজ পরিবীক্ষণ করবে।[৮৪]

২.৪.১ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে বিসিকের ভূমিকা

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে নিয়োজিত সরকারি খাতের মুখ্য প্রতিষ্ঠান। বিসিক ৪টি বিভাগীয় সদরে অবস্থিত ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয় (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা) ৬৪টি জেলা সদরে অবস্থিত ৬৪টি শিল্প সহায়ক কেন্দ্র এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ৩১টি শিল্পনগরীর (মিরপুর, ঢাকায় অবস্থিত ১টি ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্সসহ) মাধ্যমে শিল্প উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরনের সেবা ও সুবিধাদি প্রদান করে আসছে। এছাড়া বিসিক কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে থানা পর্যায় পর্যন্ত তার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও সম্প্রসারণ সেবা বর্ধিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে সংশোধিত রাজস্ব বাজেটে বিসিকের মোট বরাদ্দ ছিল ২১৭১.৮০ লক্ষ টাকা (সরকারি অনুদান ১৩৭০.০০ লক্ষ টাকা এবং বিভিন্ন সূত্র হতে বিসিকের নিজস্ব আয় ৮০১.৮০ লক্ষ টাকা)।

এসময় রাজস্ব বাজেটের আওতায় ব্যয় হয় ২১৪৬.৮০ লক্ষ টাকা (সরকারি অনুদান ১৩৭০.০০ লক্ষ এবং নিজস্ব আয় ৭৭৬.৮০ লক্ষ টাকা।

১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বিসিকের ১০টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ২৮৫০.০০ লক্ষ টাকা (বাংলাদেশ সরকারের ২১৭৭.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৬৭৩.০০ লক্ষ টাকা।) উক্ত অর্থের মধ্যে মোট ২৭২২.৬০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয় (বাংলাদেশ সরকারের ২১০৪.২৩ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ৭৭২.৩৮ লক্ষ টাকা) খরচ করা হয় যা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে সরকারি খাতের বিনিয়োগ।

১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৩০০.০০ কোটি টাকা। এর বিপরীতে বিনিয়োগ হয়েছে ৪২৬.৬৭ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার একই সময়ে এই খাতে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা ৭২,০৯২ জনের স্থলে প্রকৃত কর্মসংস্থান হয়েছে ৬৪,০২৪ জনের যা লক্ষ্য মাত্রার ৮৮.৮০ ভাগ।[৮৫]

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন বিভিন্ন সময়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর জরিপ চালিয়েছে। নিম্নে ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বিসিকের হিসাব মোতাবেক ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা দেয়া হলঃ

সারণী-৬

বিসিকের হিসাব মোতাবেক বিভিন্ন সময়ে ক্ষুদ্রশিল্পের সংখ্যা

সন	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা
১৯৬২	১৬,৩৩১
১৯৭৮	২৪,০০৫
১৯৯১	৩৮,২৯৪
১৯৯৬	৪৭,৭০৬

উৎস ঃ প্রধান কার্যালয়, বিসিক, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুদ্র শিল্পখাত, বিশেষ করে পল্লী ও মফস্বল শহরে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এই খাতের অবদান নিম্নের সারণীতে দেখানো হলঃ

সারণী-৭

বিভিন্ন সময়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ক্ষুদ্রশিল্পের অবদান

সন	ক্ষুদ্র শিল্পে কর্মসংস্থান
১৯৬২	২,১৯,১৬২ জনের
১৯৭৮	৩,২২,১২৬ জনের
১৯৯১	৫,২৩,৪৭২ জনের
১৯৯৬	৭,৩১,৮৯৭ জনের

উৎস ঃ প্রধান কার্যালয়, বিসিক, ঢাকা।

শিল্পনগরীর ধারণাটি শিল্পবিকাশ ও বিস্তৃতি এবং সুষম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য একটি কার্যকরী মাধ্যম বলে বিবেচিত। অবকাঠামো সুবিধাদি সৃষ্টি অর্থাৎ বিভিন্ন সেবার সুযোগসহ শিল্পনগরী উন্নয়ন বিসিকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। বিসিক ১৯৬০ সালের গোড়ার দিকে শিল্পনগরী কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং ১৯৯০ সালে ২৯টি শিল্পনগরীর কাজ সম্পন্ন করে। বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদের চাহিদা এবং সুষম শিল্প প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারি নীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিসিক তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে হোসিয়ারীসহ আরো ২১টি শিল্পনগরী স্থাপন এবং পুরাতন ২০টি শিল্পনগরী পুনর্বাসনের লক্ষ্যে এই কর্মসূচিটি হাতে নেয়।

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল শিল্প কারখানার জন্য আবশ্যকীয় বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, সড়ক ইত্যাদি অবকাঠোমগত সুবিধা সৃষ্টি ও তা সুদক্ষভাবে রক্ষণাবেক্ষণ। নিম্নে ২১টি শিল্পনগরীর নাম দেয়া হলঃ

১. নিজ কুঞ্জরা, ২. গোপালগঞ্জ, ৩. টাঙ্গাইল, ৪. ফরিদপুর, ৫. ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ৬. নরসিংদী, ৭. নাটোর, ৮. ঠাকুরগাঁ, ৯. চৌদ্দগ্রাম, ১০. লালমনিরহাট, ১১. কুড়িগ্রাম, ১২. খাদিমনগর (সিলেট), ১৩. মানিকগঞ্জ, ১৪. হবিগঞ্জ, ১৫. মৌলভীবাজার, ১৬. সিরাজগঞ্জ, ১৭. সাতক্ষীরা, ১৮. গাইবান্ধা, ১৯. চাঁদপুর, ২০. ঝিনাইদহ এবং ২১. হোসিয়ারী শিল্পনগরী, নারায়নগঞ্জ।[৮৬]

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সুবিধাসহ শিল্পনগরী উন্নয়ন বিসিকের অন্যতম প্রধান কর্মকান্ড। বিসিকের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় সম্ভাবনাময় এবং কম উন্নত এলাকায় আরো শিল্পনগরী স্থাপন করে দেশের সুষম প্রবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতার বিস্তৃতি নিশ্চিত করা সম্ভব।

শিল্পনগরী স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে সরকার দেশের প্রতিটি জেলাকে এই কর্মসূচিভুক্ত করার লক্ষ্যে ৬,৪৮০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দে তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদকালে বাস্তবায়নের জন্য আরো ২৪টি শিল্পনগরী স্থাপনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করে ২৪টি শিল্পনগরীর মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১২টি শিল্পনগরীর কাজ পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু অনুমোদিত প্রকল্প ছক অনুযায়ী নিম্নলিখিত শিল্পনগরীর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছেঃ

১. কিশোরগঞ্জ, ২. লক্ষ্মীপুর, ৩. নবাবগঞ্জ, ৪. নওগাঁ, ৫. ঝালকাঠি, ৬. বাগেরহাট, ৭. মুন্সিগঞ্জ, ৮. ভোলা, ৯. নারায়ণগঞ্জ, ১০. জয়পুরহাট, ১১. শেরপুর, ১২. শরীয়তপুর, ১৩. সুনামগঞ্জ, ১৪. খাগড়াছড়ি, এবং ১৫. পঞ্চগড়।

এই শিল্পনগরীগুলোর কাজ সম্পন্নের পর পরবর্তীতে নিম্নলিখিত ৯টি শিল্প নগরীর কাজ হাতে নেয়া হবেঃ

১. চুয়াডাঙ্গা, ২. মাগুরা, ৩. নড়াইল, ৪. নেত্রকোনা, ৫. বরগুনা, ৬. বান্দরবান, ৭. মেহেরপুর, ৮. ঢাকা ও ৯. রাঙ্গামাটি।[৮৭]

মানুষ, যন্ত্র ও সামগ্রীর সুষ্ঠু ব্যবহারের উপর ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। শিল্প ব্যবস্থাপনা, দক্ষতার উন্নয়ন এবং শিল্প উদ্যোক্তাদের মান-উন্নয়ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

এই লক্ষ্যে তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা ১৯০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এই প্রকল্পটির প্রথম পর্যায় গ্রহণ করা হয়। প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তির পর ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উত্তরোত্তর গুরুত্ব ও প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়। এই জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ে তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনায় বাস্তবায়নের জন্য ৯৪৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

• ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে সুদক্ষ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সেবা প্রদানমূলক সংগঠনে নিয়োজিত জনশক্তির দক্ষতার মান-উন্নয়ন।

• ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে নিয়োজিত জনশক্তির দক্ষতা ও জ্ঞানের মান-উন্নয়ন।

• শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের সার্বিক কর্মকান্ডের উন্নতি সাধন এবং এভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।[৮৮]

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নির্দিষ্ট এলাকার জনগণের জীবনের মান-উন্নয়নের জন্য ১৫৭৮.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্যসহ ২৮৭৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বাস্তবায়নের জন্য বিসিক এই প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পটির চারটি অঙ্গ প্রকল্প রয়েছে। এগুলো হচ্ছে– ১. মহিলা শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি (৩য় পর্যায়), ২. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কুটির ও গ্রামীন শিল্প উন্নয়ন (৫ম পর্যায়), ৩. লবণ শিল্প উন্নয়ন ও ৪. মৌমাছি পালন।

শিক্ষিত, দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের জন্য ঋণ সুবিধাসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ৫২৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বিসিক আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এ ধরনের প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে প্রকল্পটি ১৯৩০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ তহবিল সহ ২২৮৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সংশোধন করা হয়। দেশের ঐতিহ্যবাহী জামদানী শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে ৪৮০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বিসিক জামদানী শিল্পনগরী ও গবেষণা কেন্দ্র প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

শিল্পনগরীসমূহে গ্যাস সরবরাহের জন্য জানুয়ারি ১৯৯৫ থেকে ডিসেম্বর ১৯৯৮ পর্যন্ত মেয়াদে বিসিক ৪৩৩.০০ লক্ষ টাকায় বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

এছাড়াও বিশেষ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বিসিক ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।[৮৯]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিল্পনীতি-১৯৯৯, ঢাকা, পৃ. ৬।

২. মোঃ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৪১৯।

৩. ঐ, পৃ. ৪২০।

৪. Arshad and Rahman, History of Indo-Pakistan, 1st Ed., Ideal Publications, Dacca, 1962, p. 121.

৫. ঐ, পৃ. ১২২।

৬. ঐ, পৃ. ১২৩।

৭. ঐ, পৃ. ১২৪।

৮. তোফায়েল আহমেদ, যুগে যুগে বাংলাদেশ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১৩৮।

৯. ঐ, পৃ. ১৩৭ ও ১৩৮।

১০. শফিকুর রহমান, বাংলাদেশের অর্থনীতি, বাংলা একাডেমী, ৩য় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃ. ৭৫।

১১. লতিফুর রহমান, আধুনিক বাণিজ্যিক ভূগোল, ১০ম সংস্করণ, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৮৪।

১২. মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, বাণিজ্যিক ভূগোল, ৫ম সংস্করণ, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৩৭০।

১৩. Humphrey, C.E., Privatisation in Bangladesh Economic Transition in a poor country, The university press Ltd., Dhaka, Bangladesh, 1992.

১৪. Ahmed, M. U., Privatisation and Development : An overview of the Fundamental Issues, Social science Review, Vol. X No. 1, Dhaka, June 1993.

১৫. শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিল্পনীতি ১৯৯৯, পৃ. ২।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. ঐ. পৃ. ৩।

১৭. ঐ, পৃ. ৮।

১৮. এ, এইচ, হাবিবুর রহমান, ব্যবসায় উদ্যোগ, ১ম সংস্করণ, এইচ, কে, এস, পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৪৩, ৪৪ ও ৫১।

১৯. ঐ, পৃ. ৫১ ও ৫২।

২০. BSCIC, 1990, Bangladesh small and cottage industries- In Retrospect, september, p. 5. 10.

২০. শিল্পমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিল্পনীতি-১৯৯৯, ঢাকা।

২১. Sarma S.V.S., Small Enterprencurial Development in some Asian countries, A Compartive study, Light and life publishers, New Delhi and Jammu, P. 12.

২২. Planning commission, Govt. of the Peoples Republic of Bangladesh. The fifth five year plan, 1997-2002. p. 320.

২৩. ঐ, পৃ. ৩২০।

২১. ঐ, পৃ. ৩২১।

২২. Bangladesh Bureau of Statistics, Statistical Pocket Book, 1995, p. 6.

২৩. বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক রিপোর্ট ঃ ১৯৯৪-৯৫, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯৬, পৃ. ৮৬।

২৪. আবু তাহের খান, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে অর্থায়ন ঃ সমস্যা ও করণীয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, অক্টোবর- ৯৭, জুন-৯৮, পৃ. ১৯০ ও ১৯১।

২৫. ঐ, পৃ. ১৯৯১ ও ১৯৯২।

২৬. ঐ, পৃ. ১৯৯২-১৯৪।

২৭. বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৯৪-৯৫, ঢাকা, এপ্রিল, ১৯৯৬, পৃ. ৮৬।

২৮. Planning Commission, Ministry of Planning Govt. of the Peoples Republic of Bangladesh, Participatory Perspective Plan for Bangladesh : 1995-2010, July, 1995, p. 24.

Dhaka University Institutional Repository

২৯. Planning Commission, Ministry of Planning, Govt. of the Peoples Republic of Bangladesh, Fourth five year Plan, 1990-1995, p. VI-VII.

৩০. আবু তাহের খান, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে অর্থায়ন ঃ সমস্যা ও করণীয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, অক্টোবর-৯৭, জুন-৯৮, পৃ. ১৯৫।

৩১. ঐ, পৃ. ১৯৫ ও ১৯৭।

৩২. ঐ, পৃ. ১৯৭।

৩৩. ঐ, পৃ. ১৯৮।

৩৪. ঐ, পৃ. ১৯৮।

৩৫. ঐ, পৃ. ১৯৯।

৩৬. ঐ, পৃ. ১৯৯ ও ২০০।

৩৭. ঐ, পৃ. ২০০।

৩৮. ঐ, পৃ. ২০০ ও ২০১।

৩৯. শিল্পমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিল্পনীতি ১৯৯৯, পৃ. ১৬।

৪০. ----, শিল্পনীতি-১৯৯৯, পৃ. ১২।

৪১. আবু তাহের খান, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে অর্থায়ন ঃ সমস্যা ও করণীয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, অক্টোবর-৯৭, জুন-৯৮, পৃ. ২০১ ও ২০২।

৪২. ঐ, পৃ. ২০২।

৪৩. ঐ, পৃ. ২০২ ও ২০৩।

৪৪. এ, এইচ, হাবিবুর রহমান, ব্যবসায় উদ্যোগ, ১ম সংস্করণ, এইচ, কে, এস, পাবলিকেশন্স, পৃ. ১৩৯।

৪৫. ঐ, পৃ. ১৩৯।

৪৬. ঐ, পৃ. ১৩৯।

৪৭. ঐ, পৃ. ১৪০।

৪৮. ঐ, পৃ. ১৪০।

৪৯. ঐ, পৃ. ১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

৫০. ঐ, পৃ. ১৪০।

৫১. ঐ, পৃ. ১৪২।

৫২. ঐ, পৃ. ১৪৩।

৫৩. ঐ, পৃ. ১৪৩।

৫৪. ঐ, পৃ. ১৪৩।

৫৫. ঐ, পৃ. ১৪১।

৫৬. ঐ, পৃ. ১৪১।

৫৭. ঐ, পৃ. ১৪১।

৫৮. ঐ, পৃ. ১৪১।

৫৯. ঐ, পৃ. ১৪১ ও ১৪২।

৬০. ঐ, পৃ. ১৪২।

৬১. ঐ, পৃ. ১৪৭।

৬২. বিরূপাক্ষপাল, মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বাংলাদেশ, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৮৭।

৬৩. ঐ, পৃ. ৮৮।

৬৪. মোহাম্মদ রফিকুল্লাহ এমরান, মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন সমস্যা, সম্ভাবনা ও কৌশল, দৈনিক অর্থনীতি, ৬৮৩ম সংখ্যা, ১৯৯৯, পৃ. ৪।

৬৫. ঐ, পৃ. ৪।

৬৬. ঐ, পৃ. ৪।

৬৭. ঐ, পৃ. ৪।

৬৮. BSCIC, Survey on Small industries on Bangladesh, 1991, p.1.

৬৯. Vepa, R.K. Small Industry : The Challenge of the Eighties, Vikas Publishing house Pvt. Ltd. New Delhi, 1983.

৭০. Kamal, M.R., Problems of Small-scale and Cottage Industries in Bangladesh, The University of Nagoya, Japan, 1985.

৭১. Kayemuddin, Md., Evaluation of Factors Affecting productivity

Dhaka University Institutional Repository

in Small Industries in Bangladesh, PHD Thesis, Deptt. of Accounting, University of Dhaka, 1992, P. 15.

৭২. Saraf, D. N., 'Marketing of Small and Cottage Industries Products', A paper presented in The Seminar on Development of Small and Cottage Industries in Bangladesh, Dec. 1987, p. 2.

৭৩. Planning Commission, Ministry of Planning, Govt. of the Peoples Republic of Bangladesh, The Fifth Five year Plan, 1997-2002.

৭৪. মোহাম্মদ আবদুস সামাদ, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রশিল্পের ভূমিকা, বিসিক বার্তা, ৪র্থ সংখ্যা, জানু-মার্চ, ১৯৯৭।

৭৫. ঐ, পৃ. ৬।

৭৬. ঐ, পৃ. ৬-৭।

৭৭. ঐ, পৃ. ৭।

৭৮. জগলুল আলম, বিশ্বব্যাংকের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পখাত, শিল্পজার্নাল, ২য় সংখ্যা, বিসিক, অক্টোবর, ১৯৮৪, পৃ. ৪২ ও ৪৩।

৭৯. বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, শিল্প নগরী ডাইরেক্টরী, ১৯৯৫, পৃ. ৫।

৮০. শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিল্পনীতি-১৯৯৯, পৃ. ১২।

৮১. BSCIC : Annual Report, 1995-96, p. 1.

৮২. ঐ, পৃ. ৯, ১০ ও ১৪।

৮৩. ঐ, পৃ. ১৬।

৮৪. ঐ, পৃ. ১৮।

৮৫. ঐ, পৃ. ২২, ৩৫ ও ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৩

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৩

কার্যপরিবেশ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ের পর্যালোচনা

৩.১ কার্যপরিবেশ পরিচিতি

কার্যপরিবেশ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উন্নততর কার্যপরিবেশের উপর শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ও ব্যর্থতা অনেকটা নির্ভর করে। ব্যবস্থাপনার 'সিক্সএম' এর মধ্যে মানুষ অন্যতম প্রধান সম্পদ। আর মানুষ বলতে এখানে উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মীদের বুঝায়।

কর্মবিজ্ঞানীর কাজ হচ্ছে কর্মকে উন্নত করা। কর্মকে উন্নত করার অন্যতম একটি উপায় হচ্ছে কর্মপদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করা। অন্য কথায় বলতে গেলে কর্মীর কর্মদক্ষতা অর্জনের জন্য সুষ্ঠু কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন অপরিহার্য। মানুষের কর্মআচরণ অতি জটিল। কর্মের প্রকৃতিও বৈচিত্রময়। মানুষ সব সময় একই গতিতে কিংবা একই মান বজায় রেখে কাজ করতে পারে না। দেখা গেছে সময়ের সাথে সাথে কিংবা নিছক একঘেয়েমীর জন্যও কর্মদক্ষতা ব্যাহত হয়, উৎপাদন হ্রাসপ্রায়।[১]

কার্য বলতে সমস্ত উৎপাদন প্রক্রিয়া ও সেবামূলক কর্মতৎপরতাকে বুঝানো হয়। এখানে শ্রমিক কর্মীগণ যে যার যোগ্যতা অনুসারে কাজ করে থাকে। মনোবিজ্ঞানীদের ভাষায় কাজ বলতে বোঝায় কোন লক্ষ্য অর্জন করার জন্য শারিরীক ও মানসিক তৎপরতা।[২] অন্যভাবে কর্ম বলতে বুঝায় একজন ব্যক্তির বিশেষ কোন লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য তার শারীরবৃত্তীয় ও মানসিক প্রক্রিয়াসমূহের ব্যবহার। এই লক্ষ্য হতে পারে একজন ব্যবস্থাপকের সিদ্ধান্ত নেওয়া, রাজমিস্ত্রির দালান তোলা, অথবা একজন দোকানদারের পণ্য বিক্রয় করা। কার্যের এই

Dhaka University Institutional Repository

সংজ্ঞাকে অনেক সময় সমালোচনা করা হয় কারণ এই সংজ্ঞা অতি ব্যাপক।[৩] দৈনন্দিন জীবনে একটি প্রবচন শোনা যায় ঃ একজনের কাছে যা খেলা অন্যজনের কাছে তা কাজ। কাজ ও খেলা দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে বলে মনে হলেও বিশেষজ্ঞদের মতে এই দুইয়ের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য যা, তা হচ্ছে উদ্দেশ্য নিয়ে। মোটকথা, কাজ ও খেলার মৌলিক নীতিসমূহ এক ও অভিন্ন।[৪] কাজের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা পাওয়া যায় জড়বিজ্ঞানের বইতে- প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করাকে কর্ম বলে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ভাষায় কর্ম বলতে বুঝায় কর্মশক্তিকে গতি শক্তিকে রূপান্তরিত করা। যখন কোন বস্তুকে গতি প্রদান করা হয় কিংবা কোন শক্তির বিরুদ্ধে গতি প্রয়োগ করা হয়, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ভাষায় তখন একটি কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলা যায়। কিন্তু মানুষের কাজের বেলায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সংজ্ঞা প্রযোজ্য নয়। এতে কেবল দৈহিক শক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় অথচ মানসিকভাবেও মানুষ বহু কাজ সম্পন্ন করে। কিছু কিছু কাজে শারীরিক শক্তি বা বল প্রয়োগের প্রশ্নই আসে না। এই প্রসঙ্গে কেউ কেউ অবশ্য মানসিক শক্তির (Psychic energy) কথা উল্লেখ করেছেন। শারীরিক কাজে শারীরিক শক্তির মতো মানসিক কাজে (অংক করা, পরিকল্পনা করা, সমস্যার সমাধান করা, বই পড়া ইত্যাদি) মানসিক শক্তি প্রয়োগের কথা তারা বলে থাকেন। কিন্তু এই ধারণা বিজ্ঞানসম্মত নয় কারণ মানসিক শক্তি পরিমাপ করা যায় না। এককথায় মানুষের কাজকে যান্ত্রিকভাবে বা জড় বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে সংজ্ঞা দেওয়া উচিত নয়। মানুষের কর্মআচরণ অত্যন্ত জটিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একজন সাধারণ ফলবিক্রেতার কাজের কথাই বলা যাক। আপাততঃদৃষ্টিতে অতি সহজে মনে হলেও কাজটির নানা দিক রয়েছে। বিক্রেতাকে যে শুধু হাত, বাহু, শরীর আন্দোলিত করে কাজ করতে হয় তাই নয়, তাকে অনেক বুদ্ধি বিবেচনাও খরচ করতে হয় যেমন, বিভিন্ন ফল বিভিন্ন ঝুড়িতে রাখা, পাকা-কাঁচা, আকার, রং ইত্যাদি বুঝে বাছাই করা, দামদর করা ইত্যাদি। মানুষের কাজকে কেবল শারীর বৃত্তিয় এবং স্নায়ুতন্ত্রীয় পরিবর্তনের দিক থেকে বিবেচনা করা তাই ঠিক হবে না, বরং আরও উচ্চধাপে মানসিক এমনকি বৃহত্তর সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকেও দেখতে হবে। ইন্দ্রিয়-স্নায়ু-পেশীগত দিক ছাড়াও মানুষ জানে পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের কৌশল। তার রয়েছে চিন্তনের ক্ষমতা, যুক্তি-বুদ্ধি বিচার-বিবেচনা আবেগ অনুভূতির দিক– এইগুলির সাথে আবার যুক্ত হয়

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তির প্রবণতা, দক্ষতা, আগ্রহ বা প্রেষণা ইত্যাদি। তাই কর্মের সংজ্ঞা সংকীর্ণভাবে না দিয়ে এই সংজ্ঞায় ব্যাপকভাবে শারীরিক ও মানসিক উপাদানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৫]

'পরিবেশ' ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত একটি শব্দ। মানুষের চারপাশে যা আছে তা নিয়েই পরিবেশ। মাটি, বায়ু, পানি, প্রাণীজগৎ, উদ্ভিদ জগৎ সবকিছু মিলিয়েই পরিবেশ। তাই পরিবেশ বলতে কেবল আলো, তাপ, গোলমাল এসবই বুঝায় না। পারিপার্শ্বিক নানা উপাদানের প্রভাব এড়ানো যায় না ঃ জনাকীর্ণ শহর, জনসংখ্যার ঘনত্ব ও কোলাহল, কলকারখানা ও অফিস আদালতের বদ্ধ পরিবেশ, রাস্তার ধুলোবালি ও যানবাহনের ধোঁয়া, উচ্চস্বরের আওয়াজ, রাসায়নিক বর্জ্যপদার্থ– এসব পরিবেশগত উপাদান এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবন, কর্মজীবন, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর এগুলির প্রভাব পড়ছে। আজকাল পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে। বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন এবং পরিবেশকে উন্নত বা স্বাস্থ্যসম্মত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মনোবিজ্ঞানীরাও আচরনের উপর পরিবেশের প্রভাব নিয়ে গবেষণা করছেন। মনোবিজ্ঞানীদের কাছে 'পরিবেশ' শব্দটির গুরুত্ব অপরিসীম। এ পরিবেশ প্রধানতঃ সামাজিক পরিবেশ। কর্ম বিজ্ঞানে অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ অর্থে পরিবেশকে ধরা হয়েছে। এখানে পরিবেশ বলতে কেবল কর্ম পরিবে ষ্টনীকে বুঝানো হয়েছে।[৬] অন্যভাবে বলা যায়, শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরিবেশ বলতে বোঝানো হয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ যা কিছু রয়েছে তার সব কিছুকে। তাই ব্যাপকভাবে বলা যায়, সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তাকেই কার্যপরিবেশ বলে।

বর্তমানে বাংলাদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় ক্ষেত্রেই ভয়াবহভাবে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। কিন্তু পরিবেশ সুরক্ষায় কার্যকর কোন পদক্ষেপ আজও গ্রহণ করা হয়নি। আবাসিক এলাকার বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে নির্গত ধোঁয়া, আবর্জনা ও ময়লা পানি থেকে বায়ু ও পানি দূষিত হচ্ছে। শিল্পীয় আবর্জনা দ্বারা বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষা, কর্নফুলি এবং রূপসা নদীর পানি দূষিত হচ্ছে। টেনারী থেকে নির্গত ময়লা পানি মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর কেননা এগুলোতে উচ্চ মাত্রার ক্রোমিয়াম মিশ্রিত উপাদান রয়েছে। ঢাকা শহরের হাজারীবাগ এলাকার প্রায় ২৫০টি টেনারীতে মারাত্মকভাবে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। এবং এটি

Dhaka University Institutional Repository

স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকির সৃষ্টি করেছে এবং বর্তমানে উক্ত এলাকা মানুষ বসবাসের উপযোগী নয়।[৭]

যেখানে মানুষ কাজ করে এবং বসবাস করে সেখানে বেশীর ভাগ বিলাপ এবং কান্নাই হচ্ছে পরিবেশ নিয়ে। যাবতীয় নালিশ ও স্পষ্টভাবে এ পরিবেশ নিয়েই।[৮]

৩.২ কর্মক্ষেত্র সংগঠন এবং কর্মস্থল পরিকল্পনা

একথা খুবই সুস্পষ্ট যে কর্মক্ষেত্র এমনভাবে সংগঠন করা উচিত যেন শ্রমিকদের দক্ষতা এবং কর্মক্ষমতা সবচেয়ে ভালভাবে ব্যবহৃত হয় এবং অকারণে অসুবিধা না ঘটে। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় অনেক কাজই প্রয়োজনের তুলনায় বেশি কঠিন হয়ে পড়ে। কর্মক্ষেত্রে সংগঠন এবং কর্মস্থল পরিকল্পনার উন্নয়ন উৎপাদনশীলতার সাথে বিশেষভাবে জড়িত।[৯]

৩.২.১ কর্মস্থল

কর্মস্থল বলতে বুঝানো হয় এমন একটি বিশেষ জায়গাকে যেখানে একজন শ্রমিক তার কাজ করেন। এ জায়গাটি সর্বক্ষণই বা মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হতে পারে। কর্মস্থলগুলিতে শ্রমিকরা অনেকবার একই কাজ করে থাকেন। তাই কাজগুলি নির্বিঘ্নে এবং স্বচ্ছন্দে করার জন্য শ্রমিক-কর্মস্থল সম্পর্কটি ভাল হওয়া দরকার। তবে প্রায়ই এমন হয়ে থাকে যে মালামাল রাখার জায়গা বা বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রক (Control) অনেক দূরে থাকে, টেবিলটি নড়বড় করে, প্রত্যেকবার কাজের সময় শ্রমিককে বেকায়দাভাবে নড়াচড়া করতে হয়, অথবা প্রয়োজনীয় মিটার বা নিয়ন্ত্রক দেখার সময় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই ধরনের প্রত্যেকটি অনুপযুক্ত ব্যবস্থা সময়ের অপচয়, অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং দ্রব্যের নিম্নমানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা যেমন কোমর ব্যথার শিকার হন। অনেক সময় এর ফলে দুর্ঘটনাও ঘটে।[১০]

কর্মস্থলগুলো প্রত্যেক শ্রমিকের নিজস্ব ক্ষমতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী হওয়া উচিত। যেমন টেবিলের উচ্চতা মানুষের উচ্চতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া দরকার। টেবিলটির উচ্চতা যদি খুব বেশী হয় এবং তা পরিবর্তন করা সম্ভব না হয়, তবে পা রাখার প্লাটফর্মের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়াও একটি কাজের জন্য যে শক্তি ও দক্ষতা দরকার কর্মরত শ্রমিকটির ক্ষমতা ও তার উপযুক্ত হতে হবে। তাই বিদেশ থেকে মেশিন আমদানি করলে বা স্থানীয় লোকের বিশেষ

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনের বিষয়ে চিন্তা না করে কর্মস্থল ডিজাইন করলে প্রায়ই কিছু না কিছু পরিবর্তন করতে হয়।[১১]

কাজের সময় শ্রমিকদের চলাচল, অঙ্গ সঞ্চালন এবং বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রকের অবস্থান ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলে কর্মস্থল উন্নয়নের সুযোগগুলো খুঁজে পাওয়া যায়। এ সমস্ত উন্নয়নের অনেকগুলিই স্বল্প ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। যেমন, মালামাল, যন্ত্রপাতি এবং নিয়ন্ত্রকগুলি শ্রমিকের হাতের নাগালের মধ্যে রেখে তার সময় বাঁচানো যায়। প্রয়োজনীয় জিগ এবং ফিক্সচার ব্যবহার করে শ্রমিকের হাত অন্য কাজ করার জন্য মুক্ত রাখা যায়। একইভাবে, টেবিলের উচ্চতা পরিবর্তন করে অথবা প্লাটফর্ম ব্যবহার করে শ্রমিকদের কাজ আরো সহজ করে তোলা যায়। বিভিন্ন ধরনের সুইচ বা সিগনালের জন্য বিভিন্ন রং এবং আকৃতি ব্যবহার করে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমানো যায়। এই ধরনের সব প্রচেষ্টাই উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এবং ক্লান্তি ও দূর্ঘটনা কমাতে সাহায্য করবে।[১২]

৩.২.২ মালামাল নাড়াচাড়া

কলকারখানার শ্রমিকদের সাময়িক বা পূর্নসময়ের জন্য মালামাল নাড়াচাড়া করতে হয়। সাধারণত হাত দ্বারাই এসব নাড়াচাড়া করা হয়। অবশ্য মাঝে মাঝে যান্ত্রিক ব্যবস্থার সহযোগীতা নেওয়া হয়। মালামাল স্থানান্তর যদি দক্ষতার সাথে করা না হয় তাহলে অনেক কল-কারখানায় মালামাল প্রক্রিয়াকরণ ব্যয়কে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় রাখা সম্ভব হয় না। তাই দক্ষভাবে মালামাল নাড়াচাড়া (Handling) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অদক্ষতার অবশ্য অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। যেমন শ্রমসাধ্য অথবা অপটুভাবে মালামাল তোলানো, সরানো ও স্থানান্তর করা, মেশিনে মালামাল যোগানোতে বেশি সময় ব্যয়সহ অসুবিধা অনুভূত হওয়া, মালামাল স্থানান্তরের পথ দীর্ঘকরা এবং হতে পারে যথাযথ যন্ত্রপাতি অথবা নাড়াচাড়ার সাহায্যকারীর অপ্রতুলতা।[১৩]

কর্মক্ষেত্রে আঘাত প্রাপ্তির মধ্যে মালামাল নাড়াচাড়া থেকে প্রাপ্ত আঘাতের পরিমান কম নয়। শুধুমাত্র গোডাউনে নয় বরং সব কর্মক্ষেত্রেই এই আঘাত প্রাপ্তির ঘঁনা ঘটে। সাধারণ আঘাতগুলোর মধ্যে অত্যধিক চাপ পাওয়া, মচকানো অথবা ভেঙে যাওয়াই উল্লেখযোগ্য। তবে দেখা যায় বেশীরভাগ আঘাতপ্রাপ্তির ঘটনা ঘটে আঙ্গুলে, হাতে বা পায়ে। এসকল দুর্ঘটনা

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণত অনিরাপত্তাজনিত কর্মপরিচালনার জন্যই ঘটে যেমন, অতিরিক্ত বোঝা বহন, বেঠিকভাবে ধরা ও উত্তোলন অথবা পা ও হাতকে নিরাপদ দূরত্বে না রাখতে পারা। ব্যক্তিগত নিরাপত্তাজনিত যন্ত্রপাতি, যেমন হেলমেট, হাতমোজা এবং জুতা ইত্যাদির ব্যবহার না করাতেও অনেক দূর্ঘটনা ঘটে। কার্যত: সহজ, দক্ষ ও নিরাপদ পদ্ধতিতে নাড়াচাড়া এবং মালামাল স্থানান্তর একই সাথে সম্পাদিত হয়। বেশিরভাগ কার্যক্ষম উন্নয়ন খুবই সাধারণ ও সস্তা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কর্মপদ্ধতি বা মেশিনের বিন্যাসের সামান্য পরিবর্তন এনে চলমান মালামাল থেকে আঘাত প্রাপ্তির সংখ্যা কমান সম্ভব। বিশেষ নাড়াচাড়া সাহায্যকারী যেমন, ঠিক আকারের বাক্স, পর্যাপ্ত ধরার উপকরণ অথবা জিগ, হুক, ট্রলি বা ঠেলাগাড়ী ইত্যাদির ব্যবহার সময় ও মেহনতকে প্রবলভাবে কমাতে পারে। চলার পথের এবং মেশিনাদির বিন্যাসে পরিবর্তন এনে কর্মসম্পাদনায় উন্নয়ন আনা সম্ভব। যান্ত্রিক পরিকল্পনা যেমন 'কনভেয়র বেল্ট' নিয়োজিত করা সম্ভব। মেশিনে 'যোগান' এর পরিবর্তন এনেও উন্নয়ন করা সম্ভব। কোন যন্ত্রপাতি ছাড়াই তোলার এবং বহন করার পদ্ধতিতে উন্নয়ন আনা সম্ভব।[১৪]

৩.২.৩ গৃহস্থালী, সংরক্ষণ ও কর্মস্থলের প্রবেশপথ

কার্যসম্পাদনে দক্ষতা ও কর্মপরিবেশ রক্ষার জন্য কর্মস্থল সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রবেশ ও বাহির পথ সবসময়ই অবশ্যই বাঁধাহীন হতে হবে। সুগৃহস্থালী শুধুমাত্র ভাল কাজের অবস্থাই তৈরি করে না, সুবিধাজনক স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপত্তা ব্যবস্থার ও সৃষ্টি করে যা সুন্দর কর্মপরিবেশের অপরিহার্য পৃষ্ঠপোষক। কর্মস্থল ও তাতার এলাকায় পরিস্কার স্থানান্তর পথ ও সহজ গমনপথ সচল কর্মপরিবেশ ও অভ্যন্তরীন পরিবহন ব্যবস্থা সুন্দর করতে সাহায্য করে। খারাপ গৃহস্থালী প্রায়ই কর্মতৎপরতাকে ধীরগতি করে এবং অতিরিক্ত কাজ বাড়ায়। খারাপভাবে স্তূপীকৃত বস্তু পড়ে যেতে পারে যার ফলে কাজে দেরী এবং দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। যদি নিয়মিত পরিতাজ্য দাহ্য সরানো না হয় এবং কারখানায় অতিরিক্ত দাহ্য পদার্থ রাখা হয় তবে অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা থাকে। উপরোক্ত খারাপ গৃহস্থালী বড় বড় দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। যেমন- মেঝে সেঁত সেঁতে ও পিচ্ছিল হওয়ার দরুন পড়ে যাওয়া, চলাচলের পথে যন্ত্রপাতি অথবা অন্য কিছু পড়ে থাকার দরুন। আঘাত পাওয়া, টেবিলে বা কেবিনেটে রাখা বাইরে বাড়ানো কোন বস্তু দ্বারা কেটে যাওয়া, পেরেক, সুচালো বস্তু বা ভারী জিনিস পড়ে

Dhaka University Institutional Repository

মেঝে অসমান হওয়ার কারণে আঘাত পাওয়া। যে সমস্ত গুড়া এবং রাসায়নিক পদার্থ স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি সেগুলি অবশ্যই পরিষ্কার করা উচিত।[১৫]

সুগৃহস্থালীর জন্য কম খরচের অনেক ব্যবস্থা আছে। যদি চলাচলের পথ এবং যোগাযোগের এলাকা এবং বাহির পথ সঠিকভাবে চিহ্নিত এবং বর্ণিত থাকে তবে তা হবে সুগৃহস্থালীর বড় পৃষ্ঠপোষক। পৃথক পৃথকভাবে কাঁচামালের ভান্ডার, তৈরি বস্তু বা উৎপাদন, যন্ত্রপাতি এবং খুচরা যন্ত্রাংশের জন্য বিশেষ এলাকা ঠিক করে রাখা। সঠিক স্থানে ভান্ডার তাক স্থাপন কর্মস্থল ঠিক রাখতে সাহায্য করে। সুবিধাজনক জায়গায় বাহ্য ও ময়লা ফেলার পাত্র রাখা উচিত। যদি এ ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয় তবে পরিষ্কার এবং বিন্যাস সঠিক রাখার সুবিধা হয় এবং সহযোগিতা সহজতর করা নিশ্চিত হয়। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে শ্রমিকদের কর্মদিনের শেষে কিছু সময় বলা তেমন ফলপ্রসু হবে না। যে কোন রকম প্রয়োজনেই প্রত্যেকদিনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজের জন্য নির্দিষ্ট লোক ঠিক করা উচিত।[১৬]

৩.২.৪ কাজের বিষয়বস্তু এবং কর্ম তালিকা

শ্রমিকের দক্ষতা সঠিকভাবে কাজে লাগানো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শ্রমিকের দক্ষতার কথা ভেবে একজন ব্যবস্থাপক কর্মনির্দেশ ও কার্যপ্রণালী প্রণয়ন করেন। মাঝে মাঝে কোন কাজে এক ঘেয়েমি অথবা প্রচুর চাহিদা দেখা যায়। এজন্য কর্মসংগঠন ও কাজের বিষয়বস্তুর উন্নয়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শ্রমিকদের উপর অত্যধিক চাপ, অবসাদ ও একঘেয়েমি যত কম থাকবে কর্মদক্ষতা তত বাড়বে। যখন একজন শ্রমিক ভাববে যে তার দক্ষতা সঠিকভাবে কাজে লাগছে তখন সে কাজে যত্নশীল হবে এবং সে ভুল করতে এবং কাজে অনুপস্থিত থাকতে কম পছন্দ করবে। এসব উপাদানগুলি কাজের তৃপ্তি ও কর্মক্ষম শ্রমিক ধরে রাখাকে সম্বন্ধযুক্ত করে। এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে প্রত্যেকটি শ্রমিকেরই আলাদা আলাদা অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং পছন্দ আছে। যেমন একজন শ্রমিকের বেতন, একজন সাথী, এমনকি কেউ কাজ শেখাকে অগ্রাধিকার দিতে পারে। এই প্রয়োজন ও পছন্দ সময়ের সাথে পরিবর্তন হতে পারে।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ ভৌতকাজের পরিবেশ

একটি প্রতিষ্ঠানের ভৌত কাজের পরিবেশ কর্মপ্রক্রিয়া এবং কাজের জায়গার বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল। একটি সুস্থ, নিরাপদ ও আরামদায়ক কাজের পরিবেশ শ্রমিকদের কল্যাণ ও দক্ষতাবে কর্মসম্পাদনায় সহযোগিতা করে। যদি ভৌত কাজের পরিবেশ ঝুঁকিবিহীন না হয় তবে তা প্রতিষ্ঠান ও শ্রমিকের উপর খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে অনুন্নত কর্মপরিবেশের জন্য অনেক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। ফলে, শ্রমিকদের জীবনহানিসহ বেশ ঝামেলা পোহাতে হয় এবং অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের অনেক কর্মদিবস নষ্ট হয়। কম আলো স্বাস্থ্যের জন্য অনেক অসুবিধা সৃষ্টি করে ঃ যেমন চোখে ব্যথা ও শ্রমিকদের দুর্ঘটনায় পতিত করে এবং উৎপাদনশীলতা অথবা উৎপাদিত বস্তুর মান কমায়। অত্যধিক তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা শ্রমিকদের অসুবিধা সৃষ্টিসহ নৈতিকতা নষ্ট করে। উচ্চ শব্দমাত্রা সহসা শ্রমিককে বধিরতার দিকে ঠেলে দেয়। বিপজ্জনক বস্তুর বেঠিকে স্থানান্তর এবং রাখা বিষক্রিয়ার দিকে ধাবিত করতে পারে।[১৮]

অনেক ক্ষেত্রে, অলক্ষ্যের ঝুঁকি ও সমস্যার কৌশলগত সমাধান রয়েছে। যেমন, বিপজ্জনক বস্তুর বিষক্রিয়ার মাত্রা জানা শ্রমিক বা মালিকের পক্ষে সহজ নয়। গোলমাল একজনকে বধিরতার দিকে ধাবিত করে; কিন্তু তার কানে কম শোনার ব্যাপারটা অনেক বৎসর ধরা নাও পড়তে পারে। যখন বিষক্রিয়া বা বধিরতার লক্ষণ বুঝা যায় তখন অনেক দেরী হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে কার্যকর সমাধান বের করার জন্য কৌশলগত উপদেশ নেওয়া প্রয়োজন এবং একই রকম প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও মতবিনিময় সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে পারে। মালিক তার দৈনন্দিন দায়িত্ব হিসাবে অনেকগুলি ব্যবস্থা নিতে পারবেন। যথাযথ ভৌত পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে কর্মস্থলের নকশা এমনভাবে করতে হবে যাতে কর্মস্থলে প্রচুর আলো ও বাতাস থাকে, শব্দ উৎপাদনকারী কৌশলাদি আলাদা থাকে, ঝুঁকিপূর্ণ বস্তু আলাদাভাবে নাড়াচাড়া করা হয় এবং শ্রমিকদের জন্য প্রচুর জায়গা থাকে। স্বল্পমূল্যে এবং সহজে পরিবেশগত সমস্যার সমাধান করা যায়। সাধারণ জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট। তবে কখনও কিছু টাকা বা যন্ত্রের প্রয়োজন হতে পারে। অন্য সময় হয়তো দেখা যাবে, সমস্যা আগে থেকেই আছে। সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান ঝুঁকি পরীক্ষা করে বা শ্রমিকদের অভিযোগের

Dhaka University Institutional Repository

পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ সমস্যার অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারে। শ্রমিকদের উচ্চ হারে চলে যাওয়া, অনুপস্থিতি ইত্যাদি কম মনোবল অথবা কম উৎপাদনশীলতার লক্ষণ। অনেক সময়, শ্রমিক এবং পরিদর্শক অথবা ব্যবস্থাপনার সাথে আলোচনায় ফল দিতে পারে। প্রায়ই সমাধানের ধারণা পাওয়া যায়, কারণ প্রতিষ্ঠানের কেউ পূর্বে এ ধরনের সমস্যা দেখেছে অথবা একই ধরনের সমস্যা সমাধানের কথা পড়েছে। এজন্য পার্শ্ববর্তী প্রতিষ্ঠান অথবা একই ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অভ্যাসে পরিণত করতে পারলে কাজে লাগে।[১৯]

৩.৩.১ আলোকায়ন

কাজের দক্ষতা, সুবিধা এবং নিরাপত্তা বিধানে আলোকায়ন উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। যদিও মানুষের চোখ যে কোন উজ্জ্বলতা মানিয়ে নিতে পারে তবু দক্ষতা ও নিরাপত্তা হ্রাস পায় যদি শ্রমিকরা দেখতে না পায় যে তারা কি করছে।[২০]

ভাল আলোর ব্যবস্থা প্রায়ই কম প্রচেষ্টায় অধিক কাজ সম্পাদন করতে সহায়তা করে থাকে। তাছাড়া অপর্যাপ্ত আলো অধিকাংশ লোকের মন খারাপের কারণ হয়ে থাকে। স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, আলোকায়ন হতে হবে পর্যাপ্ত, স্থির বা অপরিবর্তনীয় এমনকি বিভিন্ন শ্রেণীর এবং তীব্র আলোবিহীন। অনেক ব্যবস্থাপনাই উৎপাদন, পরিমান, ব্যয়, মনোবল এবং নিরাপত্তার উপর আলোকায়নের প্রভাব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। নোংরা বাতি এবং খারাপ আলোর কারণে ধর্মঘট অপেক্ষা অধিক ভয়াবহভাবে উৎপাদনের ক্ষতি হয়। যখন অবহেলিত আলো আলোক সজ্জিতকরণে ব্যর্থ হয় তখন উচ্চ উৎপাদন, মানুষের কার্যঘণ্টা এবং কাঁচামালের প্রতিদিন অপচয় হয়। সকল ধরনের কার্যপরিস্থিতিতে রয়েছে অনন্য সাধারণ আলোর সমস্যা, এবং এটা অনুমান করতে পারা যায় না যে, পরবর্তী শ্রমিক এবং তার কাজের জন্য কি ধরনের ভাল আলো দরকার। আলোর উপর বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে, কারখানায় মোটামুটি ভাল আলোর ব্যবস্থা উৎপাদন বৃদ্ধি করে।[২১]

বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য কতটা পরিমান আলো পর্যাপ্ত বা আদর্শ (optimum) এটা জানার জন্য অনেকদিন আগে থেকে বিজ্ঞানীরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সহজ হয়ে উঠেনি কারণ এ ধরনের অনুসন্ধানের মধ্যে নানা অবাঞ্ছিত চলের প্রভাব অনুপ্রবেশ করার ফলে প্রধান চলের প্রভাবটি পরিষ্কারভাবে ধরা যায় না। এছাড়া বিষয়টি

Dhaka University Institutional Repository

অনুসন্ধানের জন্য বিশেষজ্ঞরা একই পদ্ধতি অবলম্বন করেননি, বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। উৎকর্ষতা বা কর্মদক্ষতা পরিমাপের মাপকাঠির কিছু কিছু গবেষণায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। কাজের প্রকৃতি ও একরকম নয়। এ সবের ফলে কতটা পরিমান আলো মানুষের কার্যসম্পাদনের জন্য সবচাইতে ভাল এ নিয়ে যে বিতর্ক শুরু হয়েছিল ১৯২০ এর দশকের আগেই, আজও তা পুরাপুরি নিরসন হয়নি। এই বিষয়টির উপর আলোক বিজ্ঞানীরা যেমন গবেষণা করেছেন, মনোবিজ্ঞানীরাও কম গবেষণা করেননি।[২২]

আলোক বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে কাজের জন্য অধিক পরিমান আলো সুপারিশ করেছেন। আলো বেশি হলে কাজ আরও ভালভাবে দৃষ্টিগোচর হবে– মোটামুটি এই ছিল তাদের অভিমত। এই জাতীয় গবেষণার পথিকৃত ছিলেন Luckiesh এবং তাঁর সহকর্মীবা।[২৩]

আলোক বিজ্ঞানীদের সুপারিশের প্রতিবাদ করেছেন মনোবিজ্ঞানীসহ অন্যান্য অনুসন্ধানকারীগণ। তাঁদের মতে আলো বাড়লেই কর্মসম্পাদন সব সময় ভাল হবে এমন কোন কথা নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে বরং অধিক আলো চোখের জন্য অসুবিধার সৃষ্টি করে, চোখে ধাঁধাঁ লাগে, চোখের উপর চাপ পড়ে এবং বেশ আলোয় চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এ ছাড়া আজকালকার দিনে যেখানে তেল ও বিদ্যুতের খরচ কমাবার ব্যাপারে মানুষ সজাগ হয়ে উঠেছে, সেখানে বাড়তি আলো ব্যবহারের সুপারিশ গ্রহণযোগ্য নয়।[২৪]

মানুষের কার্যসম্পাদনের উপর আলোর প্রভাব– এই সমস্যা নিয়ে যারা কাজ করেছেন তাঁদের কাজে নানা পদ্ধতিগত জটিলতা দেখা যায়। প্রথম দিকের শিল্প কারখানায় অনুষ্ঠিত অনুসন্ধানগুলিতে দেখা যেত আলোর পরিমান বাড়িয়ে দিলে উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। বেশিরভাগ অনুসন্ধানেই আলো বাড়াবার আগে উৎপাদনের একটি পরিমাপ নেওয়া হতো এবং আলো বাড়িয়ে গবেষকরা আর একটি পরিমাপ নিতেন। দেখা যেতো উজ্জ্বলতর আলোকে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অনুসন্ধানগুলি হয়েছে বিভিন্ন ধরনের কাজেব উপর যেমন কার্ড পানচিং, চিঠি বাছাইকরণ, তাঁতের কাজ, যন্ত্রপাতির কাজ, ইন্সপেকশন, এসেম্বলী বা সংযোজনের কাজ এবং আরও নানারকম দক্ষ ও স্বল্প দক্ষ ম্যানুফ্যাকচারিং এর কাজ। এই পরীক্ষাগুলিতে সাধারণতঃ প্রথমে খুব স্বল্প আলোকে কাজ করতে দেওয়া হতো। উদাহরণস্বরূপ ১ ফুট ক্যান্ডেল এরও কম আলো থেকে ক্রমে বাড়িয়ে ২৮ ফুট ক্যান্ডেল এর উপরে নিয়ে দেখা হতো

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদন বেড়েছে কিনা (বিভিন্ন কাজের জন্য)। সাধারণত দেখা যেত আলোর পরিমান ৫ ফুট ক্যাঃ থেকে ৫০ ফুট ক্যাঃ এ বাড়ালে মোটামুটিভাবে ৪% থেকে ৩৫% বেড়ে যায়। অন্যান্য গবেষণা কর্মে দেখা গেছে এতে ভুলের হার কমে এবং অপচয় ও দুর্ঘটনা হ্রাস পায়।[২৫]

হথর্ন অনুধ্যানের প্রথম অনুধ্যানটিই ছিল আলোক সংক্রান্ত। এই অনুধ্যান ও অন্যান্য হথর্ন অনুধ্যানগুলির ফলাফল থেকে একটি বিশেষ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যা 'হথর্ন ফলাফল' নামে খ্যাত। বর্তমান বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই অর্থে এই বলা যায় যে, আলোর তীব্রতা বাড়ালে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও এই উৎপাদন আলোর জন্যই বেড়েছে তা নয়। অন্য কোন চল এর জন্য দায়ী হতে পারে। বস্তুত হথর্ন অনুধ্যানের কর্মীদের পারস্পরিক সুসম্পর্ক, তত্ত্বাবধায়কের সম্প্রীতিপূর্ণ আচরণ ইত্যাদি সামাজিক উপাদানই উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ ছিল বলে মনে করা হয়।[২৬]

Tinker নিজে ও অন্যদের করা বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজ পর্যালোচনা করে বিভিন্ন কাজের জন্য আলোর বিভিন্ন পরিমান সুপারিশ করেছেন। তিনি আলোর গুরুত্বপূর্ণ মাত্রার কথা উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ যার চাইতে বেশি আলো উপস্থাপন করলে কর্মসম্পাদনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। তিনি মোটামুটি ভাল হরফের ছাপার জন্য ১০ থেকে ১৫ ফুঃ ক্যাঃ এর আলো, চিঠি বাছাই এর কাজের জন্য ২০ থেকে ৩০ ফুঃ ক্যাঃ এবং বুক-কিপিং, খসড়া তৈরি ইত্যাদি কাজের জন্য ৪০ থেকে ৫০ ফুঃ ক্যাঃ এর আলো সুপারিশ করেছেন।[২৭]

এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে কতটা আলো পর্যাপ্ত বা আদর্শ বা কাম্য তা নির্ভর করে কাজের প্রকৃতি এবং মানুষের দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্ষমতার উপর। এদিকে বস্তুসমূহের মধ্যে বৈপরিত্য কম থাকলে অধিক আলোর দরকার হয়। ধূসর পটভূমি থেকে কালো বস্তু খুঁজে পেতে যতটা আলোর দরকার হয় সাদার মধ্যে কালো বস্তুর জন্য তার চাইতে কম আলো লাগবে। যাদের চোখ ত্রুটিপূর্ণ বা দুর্বল, স্বাভাবিকভাবেই তাদের অধিক আলোর প্রয়োজন হয়। তরুণদের চাইতে বৃদ্ধদের অধিক আলোর দরকার হতে পারে।[২৮]

বিভিন্ন কাজের জন্য কতটা পরিমান আলো পর্যাপ্ত, এছাড়াও আলোর আরও বৈশিষ্ট্য চোখে দেখার কাজকে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, আলোর সমরূপতা বা ইউনিফরমিটির মাত্রার কথা বলা যায়। আলো কিভাবে বিচ্ছুরিত হচ্ছে এটা গুরুত্বপূর্ণ। আলোর বন্টনে যদি ত্রুটি

Dhaka University Institutional Repository

থাকে তবে চোখ ধাঁধানো অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে যাকে বলে গ্লেয়ার। এর ফলে চোখে অস্বস্তি অনুভূত হয়, চোখ ক্লান্ত হয়, কার্যসম্পাদন খারাপ হয়, দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। গ্লেয়ার নানা কারণে উৎপন্ন হতে পারে ঃ আলোর উৎস থেকে সরাসরি দৃষ্টিক্ষেত্রে আলোর ঝলক পড়লেও বৈপরিত্য তীব্র হবে, খুব উজ্জ্বল বস্তু থেকে– যেমন চকচকে ধাতু ইত্যাদি। আলোক বিন্যাসে অত্যধিক অভিন্নতা বা সমরূপতাও ভাল নয়। এই ধরনের আলো কর্মীর মধ্যে অবসাদভাব, ঘুমঘুমভাব আনতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা হচ্ছে অপেক্ষাকৃত কম তীব্রতা সম্পন্ন চারদিকে ছড়িয়ে পড়া সাধারণ আলো এবং কাজের জায়গায় বা কেন্দ্রস্থলে বিশেষ আলোর ব্যবস্থা থাকা।[২৯]

আলোর সমরূপতা ও আলোক বিন্যাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে পরীক্ষা করেছেন Ferre এবং Rand এদেরকে এ বিষয়ের পরীক্ষাগুলির পথিকৃত বলা যায়। তাঁরা গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে গ্লেয়ার কমানো ও চারদিকে ছড়িয়ে পড়া আলোর সুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন। একটি পরীক্ষণে তাঁরা আলোর পরিব্যাপ্তির দিক থেকে তিন ধরনের আলোর তুলনা করেছেন। তাঁরা দেখেছেন যে পরীক্ষদের তিন ঘণ্টার ক্রমাগত পাঠে দৃষ্টি তীক্ষ্ণতার ক্ষতি সবচাইতে কম হয়েছে অপ্রত্যক্ষ আলোয়, যে আলো সব চাইতে বেশি পরিব্যাপ্ত। কিছুটা প্রত্যক্ষ ও সরাসরি বা প্রত্যক্ষ আলোয় দৃষ্টি তীক্ষ্ণতার ক্ষতি হয়েছে সব চাইতে বেশি।[৩০]

একই ধরনের কাজে বিভিন্ন কারখানায় আলোকায়নের মাত্রার বিভিন্নতা দেখা যায়। যথাযথ আলোকায়নের মাত্রা কাজের উপর নির্ভর করে। সুক্ষ্মকাজে অন্যান্য কাজের চেয়ে উজ্জ্বল আলোর প্রয়োজন হয়। মাল উঠানো বা শারীরিক শ্রমের জন্য যে আলো পর্যাপ্ত তা মেশিনে অথবা অফিসের কাজের জন্য পর্যাপ্ত হবে না। যেমন সুক্ষ্ম সমাপক অথবা রং করা, সংযোজন অথবা ছোট যন্ত্রাংশের পরীক্ষণ, অংকন এবং ঘোলাটে বস্তু নিয়ে কাজ করার সময় অনেক উজ্জ্বল আলোর দরকার হয়। অন্যদিকে চোখ ধাঁধানো আলো বর্জন করা উচিত কারণ তা চোখের উপর চাপ ফেলে। আলোর প্রতিফলনও কাজে বাঁধা সৃষ্টি করতে পারে। হঠাৎ আলোর পরিবর্তন, যেমন খুব উজ্জ্বল আলো হতে কম আলোতে গেলে, দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বয়স্ক লোকের জন্য প্রচুর পরিমিত আলোর ব্যবস্থা রাখা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।[৩১]

সঠিক আলোকায়নের লক্ষ্যে দিনের আলো এবং কৃত্রিম আলোর যথাযথ সংমিশ্রণ প্রয়োজন। কম খরচে ভাল আলোকায়ন বিভিন্ন উপায়ে করা যায়। স্কাই লাইট লাগানো এবং প্রশস্ত

Dhaka University Institutional Repository

জানালা আলোকায়নে যথেষ্ট সাহায্য করে। জানালা এবং আলোর উৎসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কার্যস্থান পরিবর্তন করে উপকার পাওয়া যেতে পারে। আলো স্থাপনের স্থান পরিবর্তন অথবা উচ্চতার কারণে আলোকায়নে পার্থক্য হতে পারে। দেওয়াল ও তৈজসপত্রের রং হালকা হওয়া উচিত। নিয়মিত জানালা, বাতির শেড অথবা ঢাকনা পরিষ্কার করা এবং পুরানো বাতি অথবা দপদপ করে জ্বলা ফ্লোরোসেন্ট টিউব বাতি সরিয়ে ফেলা দরকার। বাতিতে ঢাকনা অথবা বাতির দিক পরিবর্তন করে শ্রমিকদের চোখ ধাঁধানো আলোর অসুবিধা থেকে অব্যাহতি দেওয়া সম্ভব।[৩২]

৩.৩.২ রং এর প্রভাব

প্রচলিত একটি বিশ্বাস আছে যে কিছু কিছু রং 'উষ্ণ' এবং কিছু কিছু রং 'শীতল'। সাধারণতঃ নীল ও সবুজকে ঠান্ডা রং এবং কমলা ও লাল রংকে উষ্ণ বা উত্তেজক রং বলে মনে করা হয়। নির্ভরযোগ্য তথ্য এই অভিমতকে সমর্থন করে না। Bennett এবং Rey একটি সুনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষণে বিভিন্ন রং এর প্রভাব পারীক্ষণে তাপ সংবেদনে কোন পার্থক্য পাননি।[৩৩]

কয়েক দশক আগে Eysenck মানুষের পছন্দনীয় রং-এর অনুধ্যানগুলিকে একত্রিত করে ২১,০০০ এরও বেশি মতামতের উপর ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মানুষের পছন্দনীয় রং গুলি হচ্ছে ক্রমান্বয়ে নীল, লাল, সবুজ, বেগুনী, কমলা ও হলুদ। ব্যক্তি ভেদে, লিঙ্গ ভেদে, বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা বা কৃষ্টিভেদে, এমনকি বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে রং-এর পছন্দ ভিন্ন হতে পারে।[৩৪]

Acking এবং Kuller বিভিন্ন গবেষণামূলক তথ্য পর্যালোচনা করে দেখেছেন যে, মানুষের উপর রং এর কিছু শারীরবৃত্তিক প্রভাব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, রং-এর প্রভাব দেখা যায় রক্তচাপ, শ্বাস প্রশ্বাসের হার, প্রতিক্রিয়া কাল ইত্যাদির উপর। তবে কোন 'মেকানিজম' এর পিছনে কাজ করে তা জানা যায়নি।[৩৫]

কর্মদক্ষতার উপর রং-এর প্রভাব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। কম্পিত আলো স্থির প্রতীয়মান হওয়া (Critical Flicker Fusion বা সংক্ষেপে CFF) এই প্রত্যক্ষণমূলক কাজটির উপর রং-এর প্রভাব আসছে কিনা এনিয়ে একটি পরীক্ষণ পরিচালিত হয়। এতে লাল আলোয় CFF বাড়ে কিনা তা দেখা হয় কারণ লাল আরো মস্তিষ্ককে উদ্দীপিত করে। কিন্তু ফলাফলে দেখা

Dhaka University Institutional Repository

যায় লাল ও সবুজ আলোর চাইতে সাদা আলোয় CFF বাড়ে কিংবা রঙিন আলোয় CFF কমে।[৩৬]

বিভিন্ন ধরনের কাজের উপর আলোর রং নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে যে সব কাজে রং এর পার্থক্য নির্ণয় করতে হয় সেখানে রঙিন আলো ব্যবহার করা উচিত হয়। এছাড়া, কর্মক্ষেত্রে আলোর রং নির্বাচনের সময়কাজের প্রকৃতি, পটভূমির রং, চোখের অভিযোজন ইত্যাদির বিবেচনা করা উচিত। চোখ যদি অন্ধকারে প্রতি অভিযোজিত হয় তবে লাল রং ভাল ফল দিতে পারে কারণ লাল রং থেকে বিচ্ছুরিত আলো অন্ধকারে চোখকে অভিযোজিত করতে সাহায্য করে। এই মতবাদ পরীক্ষা করার জন্য একটি পরীক্ষণ করা হয়। এই পরীক্ষণে রাতের স্বল্প আলোয় বিভিন্ন রং-এর প্রভাব ডায়াল রিডিং এর উপর পড়ে কিনা এই বিষয়টি অনুসন্ধান করা হয়েছিল। চার রং এর আলো ব্যবহার করা হয়েছিল ঃ হলদে–সবুজ, হলদে-কমলা, কমলা-লাল ও গাঢ়-লাল রং। আলোর দুটি পরিমান পরীক্ষা করা হয়। ডায়াল পাঠের দ্রুততা ও নির্ভূলতা ছিল অপেক্ষী চল। ফলাফলে দেখা গেছে, সাদা আলোর চাইতে সবগুলি রঙিন আলোতেই কর্ম সম্পাদন ভাল হয়েছে।[৩৭]

বিজ্ঞান সম্মত তথ্যের সমর্থন না পাওয়া গেলেও সাধারনভাবে বলা যায় যে, সকল গাঢ় রংই মানুষকে পীড়া দেয়, মনকে ভারাক্রান্ত করে, ক্লান্তি আনে-এই রংগুলি আলোকে শোষণ করে নেয়, এগুলিকে পরিষ্কার রাখা কঠিন। পক্ষান্তরে সব হালকা রংই উজ্জ্বল ও আনন্দদায়ক, এগুলি অধিক আলো বিচ্ছুরণ করে, ঘর উজ্জ্বলতর করে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে উৎসাহিত করে। কর্মবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে এই মনোভাবগুলির মূল্য আছে।[৩৮]

৩.৩.৩ তাপ

বেশীরভাগ উন্নয়নশীল দেশই পৃথিবীর গ্রীষ্মমন্ডলীর অথবা প্রায় গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে অবস্থিত। এ সমস্ত দেশগুলির আবহাওয়া সাধারনতঃ তপ্ত এবং আর্দ্র, যা এদেশগুলির বায়ু চলাচল ও গরমের ন্যায় সমস্যা সৃষ্টি করে। অধিকন্তু, তৈরির সরঞ্জাম ও প্রক্রিয়া সম্ভবত সমানভাবেই তাপ সমস্যার কারণ। তাপ উৎপন্নের সরঞ্জাম ও প্রক্রিয়ার উদাহরণ সমূহের মধ্যে গলানোর ফারনেস, তাপ এবং অন্যান্য কার্যাদি, ঝালাই, বয়লার, কাঁচ তৈরী এবং জেনারেটরস উল্লেখযোগ্য। পরিশ্রমী কাজ শরীরের ভিতর তাপ সৃষ্টি করে যা উষ্ণ কর্মক্ষেত্রে তাপ সমস্যা

Dhaka University Institutional Repository

তৈরিতে সহায়তা করে। তাপ সমস্যা প্রায়ই দেখা যায় যে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের অব্যবস্থা, আবহাওয়া এবং প্রস্তুত প্রক্রিয়ার সমষ্টিগত ফল।[৩৯]

অত্যধিক তাপ আরাম ও উৎপাদনশীলতা বিনষ্ট করে। এতে তারা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, একাগ্রতার ক্ষমতা হারায় অথবা তাদের মাথা ঝিম ঝিম করে। মাঝে মাঝে শ্রমিকদের দেহে বেদনা এবং মাংসপেশীর যন্ত্রণা হতে পারে। ঘামের মাধ্যমে অত্যধিক লবণ ও জল বের হওয়ার ফলেই এ যন্ত্রণা হয়। মাঝে মাঝে তাপ খুব বেশি হয়ে মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে শ্রমিক হঠাৎ করে জ্ঞান হারাতে পারে। এটা মারাত্মক হলে মৃত্যুর কারণও হতে পারে।[৪০]

কর্মীরা কখনও কখনও 'গরম' বা 'ঠান্ডা' লাগছে বলে অভিযোগ প্রকাশ করে। এতে করে কর্মপরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কিংবা তাপমাত্রা কমে যাওয়ার ফলে কর্মীর কর্মদক্ষতা হ্রাস পাচ্ছে অথবা কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে– সাধারণতঃ তাই বুঝায়। এই বিষয়ের উপর গবেষণা করার মধ্যে জটিলতা আছে। কারণ বাতাসে যে আর্দ্রতা আছে তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে। শুধু তাপের প্রভাব দেখা ও আর্দ্রতাকে নিয়ন্ত্রিত রাখা এই ধরনের পরীক্ষণ খুব বেশি হয়নি। ভ্যাপসা গরমই মানুষকে কষ্ট দেয় বেশি। একদল লোককে বিভিন্ন তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার মধ্যে এক ঘণ্টা রেখে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল। যখন আর্দ্রতা মাত্র ১০% তখন ১৪০০ ফারেনহাইট এর তাপও পারীক্ষদের কাছে সহনীয় মনে হয়েছে। পক্ষান্তরে আর্দ্রতা যখন ৮০% এ উন্নীত করা হয় তখন ১১০০ ফাঃ এর তাপ তাদের কাছে অসহ্য লাগে। এই পরীক্ষণে আর্দ্রতার ভূমিকা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে।[৪১]

400864

কাজের উপর তাপমাত্রার প্রভাব নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই। বেশ কিছু বৃটিশ অনুধ্যান এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। এই কাজগুলি হয়েছে কারখানা ও কয়লাখাদে। Industrial Fatigue Research Board (IFRB) এর অধীনে করা কয়েকটি পুরানো অনুধ্যান এখানে উল্লেখ করা যায়। কিছু কিছু অনুধ্যানে Kata thermometer নামে একটি বিশেষ যন্ত্র দিয়ে বাতাসের তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়েছিল (তাপ, আর্দ্রতা ও বায়ুর সচলতার একত্রি ফল)। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন কয়লাখনির তাপমাত্রা কিংবা কয়লা খনির বিভিন্ন গভীরতায় তাপমাত্রা পরিমাপ করা হতো। এই অনুধ্যানগুলির ফলাফলে দেখা যায় বাতাসের শীতলতা যত কমে কিংবা তাপমাত্রা যত বাড়ে দুর্ঘটনার হার এবং মারাত্মক ধরনের দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পায়, শ্রমিকদের নিজ থেকে বিশ্রাম গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন কমে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

যায়।[৪২] কয়লা খনিতে করা অপর একটি অনুধ্যান দেখা যায় তাপের সাথে অনুপস্থিতির সম্পর্ক রয়েছে। বাতাসের তাপমাত্রা ৭০০ ফাঃ এর উপরে উঠলে কর্মীরা অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং অসুস্থ হওয়ার জন্য কর্ম সময়ের শতকরা হার কমে যায়।[৪৩]

সামরিক উপকরণ নির্মানের কারখানায় অনুষ্ঠিত অপর একটি গবেষণায় দেখা যায় সবচেয়ে কম দুর্ঘটনা ঘটে ৬৭.৫০ ফাঃ তাপমাত্রায়। তাপমাত্রা বেড়ে যখন ৭৮০ ফাঃ এ উঠে কিংবা কমে একেবারে ৪৮০ ফাঃ এ নেমে যায়, দুর্ঘটনার হার প্রায় ৩০% বেড়ে যায়। শরীরের জন্য উপযুক্ত বা আদর্শ তাপমাত্রা থেকে বিচ্যুতি ঘটলে শরীরে অস্বস্তি অনুভূতি হয়, কর্মীরা অমনোযোগী হয়ে উঠে, ফলে দুর্ঘটনা বেড়ে যায়। এ ছাড়া, বাতাসের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে শরীর থেকে ঘাম নিঃসৃত হয়, এতে উপকরণ/যন্ত্রাংশ ধরলে হাত পিছলে যায়। অপরদিকে তাপমাত্রা অত্যন্ত কমে গেলে হাত কিংবা হাতের আঙ্গুল আড়ষ্ট হয়ে যায়, এতে অঙ্গ সঞ্চালনের সমন্বয় সাধন ব্যাহত হয়।[৪৪] কর্মস্থলে পাখা লাগিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। টেক্সটাইল মিলে অনুষ্ঠিত একটি পরীক্ষণে একদিন অন্তর-অন্তর পাখা চালানো হয়। ছয় সপ্তাহের বেশি এই পরীক্ষনটি চলে। ফলাফল পরীক্ষা করে দেখা যায়, যে সব দিনে পাখা চলছিল সে দিনগুলিতে উৎপাদন অন্য দিনগুলির তুলনায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ও অপচয় কম হয়েছে।[৪৫]

৩.৩.৪ গোলমাল

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে গোলমালকে প্রায়শঃই 'অবাঞ্ছিত' বা 'অনভিপ্রেত' শব্দ হিসাবে অভিহিত করা হয়। যে শব্দ আনন্দদায়ক নয় বরং মনোযোগ নষ্ট করে ও বিরক্তি উৎপাদন করে তাকে গোলমাল বলা যায়। Glass এবং Singer এর মতে, গোলমাল হচ্ছে যে শব্দ শরীরবৃত্তির দিক থেকে প্রাণীকে সচেতন করে, যে শব্দ পীড়াদায়ক বা চাপমূলক, ব্যক্তিনিষ্ঠভাবে বিরক্তি উৎপাদন করে এবং যা কার্যসম্পাদনে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।[৪৬] কর্মসম্পাদনের পরিপ্রেক্ষিতে গোলমালকে শ্রবণ উদ্দীপক হিসাবে অভিহিত করা হয় যা কর্মসম্পাদনে কোন তথ্যগত সম্পর্ক বহন করে না। অর্থাৎ যে শব্দ কাজের পরিপ্রেক্ষিতে অসংলগ্ন বা অর্থহীন তাকে গোলমাল বলে।[৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠানে শব্দ একটি বহু বিস্তৃত সমস্যা। স্ট্যাম্প প্রেসিং, ছিদ্রকরণ মেশিন প্রায়ই শব্দ করে। বুনন তাঁত, বোতল ভর্তি করার যন্ত্র এবং জেনারেটরও প্রচুর শব্দ সৃষ্টি করে। নির্মাণ কাজে, পাইলিং মেশিন এবং অন্যান্য অনেক খুচরা সরঞ্জাম গোলমালের সমস্যা সৃষ্টি করে। ছোটবড় সব প্রতিষ্ঠানেই উচ্চ গোলমাল সৃষ্টির আরো অনেক উৎস রয়েছে।[৪৮]

গোলমালের মাত্রা কানের জন্য কতটুকু ক্ষতিকারক তা সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব। দুই মিটার দূরত্বের কোন লোক কোন কিছু বলতে যদি চিৎকার করতে হয় তবে বুঝতে হবে যে সেখানে গোলমালের মাত্রা ৮৫ ডেসিবেল। শব্দ মাত্রার মিটার দ্বারা অনেক উপায়ে বিস্তৃতভাবে গোলমালের মাত্রা মাপা ও বিশ্লেষণ করা যায়। এগুলির জন্য সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের দরকার হয়।[৪৯]

একটানা অতি উচ্চ শব্দে দীর্ঘদিন পর্যন্ত কান উন্মুক্ত থাকলে কানে শুনা নাও যেতে পারে। এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। এটি শুধু শব্দ তীব্রতার উপর নির্ভর করে না, কম্পাঙ্কের উপরও নির্ভর করে এবং কত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কানে সে শব্দ প্রবেশ করছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ।[৫০]

গোলমালের সবচাইতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে বধির হয়ে যাওয়া। ১০০ ডেসিবেল বা তার উপরের তীব্রতা সম্পন্ন শব্দ যখন মানুষের কানে ক্রমাগত বা ধারাবাহিকভাবে অনেকদিন ধরে আঘাত করতে থাকে তখন অন্তঃকর্নের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। এর ফলে পুরাপুরি শ্রবণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ১৬০ ডেসিবেলের বেশি তীব্রতা সম্পন্ন শব্দ কানে আঘাত করলে কানের পর্দা ফেটে গিয়েও মানুষ বধির হতে পারে। যে সব কাজে কথাবার্তা একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে কিংবা যে সব কাজে শ্রবণ সংকেত এর প্রতি যথোপযুক্ত প্রতিক্রিয়া করতে হয় (রেডিও মনিটরিং ইত্যাদি), সেখানে গোলমাল কার্যসম্পাদনে বাধার সৃষ্টি করে অর্থাৎ কাজের ক্ষতি করে। গোলমালের ফলে কথোপকথনে (সরাসরি বা মুখি কথা, টেলিফোনে বা ইন্টারকমে) বিঘ্নঘটে, একজন আরেকজনের কথা শুনতে বা বুঝতে পারে না। এছাড়া, কথায় ভুল হতে পারে, শক্তি খরচ বেশি হয় (চিৎকার করে কথা বলতে হয়) যার ফলে কর্মী তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ে।[৫১]

শব্দের নিম্নমাত্রার চাইতে উচ্চমাত্রার গোলমাল, অবিরাম গোলমালের চাইতে সবিরাম গোলমাল কাজের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। অপ্রত্যাশিত এবং পূর্বাভাস না পাওয়া গোলমাল কার্যসম্পাদনে অধিক ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।[৫২] অর্থহীন গোলমালের চাইতে বোধগম্য বা অর্থপূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

গোলমাল অধিক ক্ষতিকারক, যে শব্দ ব্যক্তির নিকট অর্থহীন তা কাজ থেকে তার মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করে না।[৫৩] Park and payne দেখেছেন মানুষের মোটামুটি কার্যসম্পাদন তীব্র গোলমাল দ্বারাও বিঘ্নিত হয় না, তবে তাঁরা দেখেছেন এতে কাজের উঠানামা বা পরিবর্তনশীলতা বেড়ে যায়। তাঁদের মতে সহজ কাজে এই পরিবর্তন বা বৈচিত্র যত থাকে কঠিন কাজে তত থাকে না।[৫৪] কিন্তু এই বক্তব্য গোলমালের গবেষণার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। দেখা গেছে, সহজ কাজ কঠিন কাজের তুলনায় গোলমালের কমই বিঘ্নিত হয়। Anestasi এর মতে অনেক ক্ষেত্রে গোলমালের প্রভাব গোলমাল উদ্দীপকের অর্ন্তনিহিত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে না, বরং ব্যক্তির আবেগমূলক প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে।[৫৫]

বিভিন্ন গবেষণালব্ধ তথ্যের আলোকে দেখলে কাজের উপর গোলমালের প্রভাব তেমন পরিলক্ষিত হয় না বটে কিন্তু গোলমাল, হৈ চৈ বা গন্ডগোল অবশ্যই মানুষের কর্মক্ষমতাকে বিনষ্ট করে। শারীরিক, মানসিক, কোন না কোনভাবে গোলমাল মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এমনকি মানুষ যখন কোন কাজ করে না তখনও অকারণে কানে শব্দ প্রবেশ করতে থাকলে পেশীর উত্তেজনা বেড়ে যায় এবং শারীরবৃত্তিক এমন কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে যা সাধারণতঃ মানুষের মধ্যে আবেগমূলক উত্তেজনায় পরিলক্ষিত হয়।[৫৬] গোলমালের দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক প্রভাবও বিজ্ঞান সম্মতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। Cohen দীর্ঘ ৫ বৎসর ব্যাপী একটি অনুসন্ধানে ৫০০ কর্মীদের ৯৫ ডেসিবেল বা তার উপরের গোলমালের মধ্যে রেখে দেখেন যে একই কর্মীরা যে সব কর্মী ঐ শব্দের মধ্যে কাজ করেনি তাদের তুলনায় নানা রকম শারীরিক উপসর্গ বা অসুখ বিসুখের অভিযোগ করছে এবং তাদের রোগ নির্ণিতও হয়েছে। তাদের মধ্যে অনুপস্থিতির হারও বেশি ছিল। এতে মানসিক চাপের আভাস পাওয়া যায়। তাহলে বলতে হবে গোলমালের অবশ্যই বিরূপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে।[৫৭] মানুষ যদি উচ্চ তীব্রতা সম্পন্ন গোলমালের মধ্যে বৎসরের পর বৎসর কাটায়, কি কাজের জগতে, কি ঘরবাড়িতে অথবা স্কুলের পরিমন্ডলে, স্বাস্থ্যের জন্য তা হুমকি স্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারে।[৫৮]

গোলমাল নিয়ন্ত্রণ একটি প্রকৌশলগত ব্যাপার। গোলমাল নিয়ন্ত্রণের জন্য সাধারণতঃ এই উপায়গুলি অবলম্বন করা যায় ঃ উৎস থেকে শব্দ কমানো (যন্ত্রের উপযুক্ত নকশা করে, যন্ত্রে তেল দিয়ে ইত্যাদি), শব্দ অবরুদ্ধ করা, শব্দ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য পাত বা ফলক ব্যবহার করা এবং সাউন্ড প্রুফ উপাদান ব্যবহার করা।

Dhaka University Institutional Repository

এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করার পরও যদি গোলমালের তীব্রতা গ্রহণযোগ্য না হয় তবে কানের ক্ষতি রোধ করার জন্য ইয়ার প্লাগ, প্যাড, ইয়ারক্যাপ, ইয়ার মাফস ইত্যাদি সংরক্ষক ব্যবহার করতে হবে।[৫৯]

৩.৩.৫ সঙ্গীত

বিগত কয়েক দশক ধরে পাশ্চাত্যের বহু কল-কারখানায় নেপথ্যে সঙ্গীত বাজিয়ে কর্মচারীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। কিন্তু গান শোনালে কাজ ভাল হবে বা উৎপাদন বাড়বে এই প্রকল্পের সমর্থনে খুব বেশি ইতিবাচক তথ্য পাওয়া যায়নি। ভাল নিয়ন্ত্রণযুক্ত গবেষণাও খুব কম। গোলমালের মতই বিভিন্ন ধরনের ফলাফল বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং ঐ ধরনের ফলাফল থেকে কোন উপসংহারে পৌঁছানো যায় না।[৬০]

মালবোঝাই ও খালাসকারী ব্যক্তি, কটনমিলের শ্রমিক এবং অন্যান্যরা জানে যে, সঙ্গীত প্রায়ই ক্লান্তি কমাতে সাহায্য করে। সঙ্গীতের উপকারী প্রভাবের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এটি কর্মীদের অতিরিক্ত কাজের ফলে মস্তিস্কের ক্লান্তি দূর করে এবং গোলমাল বা হৈ চৈ হ্রাস করে। কারখানার বিরক্তিকর হট্টগোল ক্লান্তি আনয়ন করে থাকে। সঙ্গীত নিয়মিত হৃদস্পন্দন সৃষ্টি করে। এর ছন্দযুক্ত পারস্পরিকতা রয়েছে। এমনকি মধ্যভাগের শিল্পীয় ঠনঠন শব্দ, মানুষের কানে সুখদায়ক সুর সৃষ্টি করে এবং এর ফলে বেমানান গোলমাল উপেক্ষা করা যায়। সঙ্গীত কার্য ঘন্টার সময় উৎপাদনের উন্নয়ন ঘটায় বিশেষত যেখানে পুনঃপুনঃ কাজ সংগঠিত হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে যথাযথ পরিচালনায় এটি শুধু উৎপাদনই বাড়ায় না ব্যাপকভাবে কর্মী সন্তুষ্টির সৃষ্টি করে থাকে।[৬১]

একটি বৃটিশ গবেষণায় দেখা যায় রেডিমেড কাপড় তৈরির ফ্যাক্টরীতে সঙ্গীতের প্রবর্তন মহিলা কর্মীদের উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। অপর একটি অনুসন্ধানে গবেষকরা সঙ্গীতের প্রভাব দেখার জন্য সংযোজন কাজে নিয়োজিত কর্মীদের ২৪ সপ্তাহ গ্রামোফোন বাজিয়ে শোনান। যখন কর্মীরা ক্লান্ত হয়ে পড়ত তখন সঙ্গীত শোনানো হতো। ফলাফলে দেখা যায়, উৎপাদন ৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। দেখা গেছে, সংযোজন এবং অন্যান্য পুনরাবৃত্তিমূলক বা এক ঘেয়ে কাজে সঙ্গীত ব্যবহার করতে শুরু করলে কিছুটা উৎপাদন বাড়ে, জিনিসপত্র নষ্ট হওয়ার হার কমে কিন্তু দুর্ঘটনার হারে কোন তারতম্য হয় না।[৬২] অপরদিকে সুনিয়ন্ত্রিত কিছু গবেষণা

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গীতের ইতিবাচক প্রভাব দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। সঙ্গীত প্রবর্তনের পরে সহজ ও জটিল শিল্পগত কাজে কোন তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। অবশ্য সঙ্গীতের কোন ক্ষতিকর প্রভাবও দেখা যায়নি।[৬৩]

গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, সঙ্গীত সহজ পুনরাবৃত্তিমূলক, একঘেয়েমি ভরা ও বিরক্তিপূর্ণ কাজে কিছুটা সহায়তা করলেও জটিল, বৈচিত্রময়, ঝুঁকিপূর্ণ ও মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হয় এমন কাজে সাহায্য করে না। এমনকি সহজ কাজে সঙ্গীতের প্রতি প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। কিছু কিছু সঙ্গীত মনোযোগ বিনষ্ট করে কাজের মান কমিয়ে দেয়।[৬৪]

Smith এর গবেষণায় মনোভাব জরিপ অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি বিভিন্ন ধরনের পুনরাবৃত্তিমূলক কাজে নিয়োজিত ১০০০ কর্মীর মতামত নিয়ে দেখেন যে ৯৮% কর্মী কাজের সময় সঙ্গীত পছন্দ করে। Smith এর গবেষণায় আরও দেখা যায় বৃদ্ধরা ক্লাসিকাল সঙ্গীত ও উচ্চ নিনাদের নয় এমন ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিক বেশি পছন্দ করে। কিন্তু তরুণ ও মধ্যবয়স্করা পছন্দ করে সব ধরনের হাল্কা গান। একটি এসেম্বলী শপে হাল্কা মিউজিক শোনানো আরম্ভ করার পর দিনে গড়ে ৭% ও রাতে ১৭% উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ক্ল্যাসিকাল মিউজিকের সময় হালকা মিউজিকের তুলনায় উৎপাদন কমে যায়। Smith এর অনুধ্যানে অপর একটি আকর্ষণীয় ফলাফল ছিল এই যে সঙ্গীতের ফলে দুর্ঘটনার হার দিনে বাড়ে, কিন্তু রাতে কমে।[৬৫]

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশে করা একটি অনুধ্যানে সঙ্গীতের ইতিবাচক প্রভাব আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং তার সাথে সাথে কোন ধরনের সঙ্গীত অধিক কার্যকর তা অনুসন্ধান করা হয়। একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে কর্মরত ৫৩ জন মহিলা কর্মীর উদ্দেশ্যে নেপথ্যে বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় ঃ আনন্দ শংকরের বাজনা, লোকসঙ্গীত (ভাওয়াইয়া), দ্রুত তালের হিন্দী সিনেমার গান ও একটি সঙ্গীত বিহীন অবস্থা। এই পরীক্ষণে পুনরাবৃত্তিমূলক পরিমাপন নকশা অনুসরণ করা হয়। তিন সপ্তাহব্যাপী পরীক্ষণটি চলে ফলাফলে দেখা যায় সঙ্গীত চলাকালে উৎপাদন বেড়েছে, গড় উৎপাদন সবচাইতে বেশি ছিল লোক সঙ্গীতের সময় এবং সবচাইতে কম ছিল সঙ্গীতবিহীন অবস্থায়।[৬৬]

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩.৬ কর্ম অনুসূচি

যে সকল উপাদান কর্মদক্ষতাকে প্রভাবিত করে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্মসময়ের বন্টন। কর্মঅনুসূচির মধ্যে যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত সেগুলো হচ্ছে বিরতিকাল, কর্মঘন্টা ও কর্মসপ্তাহ এবং পালাক্রমিক কাজ। একটানা কাজ করার চাইতে মাঝে মাঝে বিরতি পেলে কর্মীর ক্লান্তি দূর হয়, তার কর্মক্ষমতা বাড়ে। বিভিন্ন গবেষণায় এই মতবাদ সমর্থিত হয়েছে। আজকাল তাই আনুষ্ঠানিকভাবে অফিসে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, কলকারখানায়, স্কুল-কলেজে বিরতি দেওয়া হয়। যদি আনুষ্ঠানিকভাবে বিরতি না দেওয়া হয় তবে মানুষের প্রবণতা হচ্ছে এই যে সে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে বিশ্রাম গ্রহণ করে এবং বিভিন্নভাবে এই বিশ্রাম নেয় যেমন সহকর্মীদের সাথে গল্প-গুজব করে সময় কাটিয়ে দেয়, চা খেতে যায় কিংবা অফিস চলাকালীন সময় বাইরে থেকে ঘুরে আসে। এতে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয় আরও বেশি। তাই সাধারণতঃ এখন প্রায় সব প্রতিষ্ঠানেই লাঞ্চব্রেক থাকে, বিদেশে সকালে ও বিকালের দিকে থাকে চা বা কফি ব্রেক। বাংলাদেশে এখনও কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক বিরতি নেই বলে কর্মীরা উপরোক্ত পদ্ধতিতে অনেক কর্মসময় নষ্ট করে।[৬৭]

শিল্পে বহু বৎসর যাবৎ বিরতিকালের উপর গবেষণা চলছে। সংগৃহীত উপাত্ত থেকে দেখা যায় বিরতিকাল আনুষ্ঠানিকভাবে দেওয়া হলে উৎপাদনে একটা পরিবর্তন আসে, উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। IFRB এর অধীনে পরিচালিত পুরানো কিছু গবেষণায় ভারী থেকে হালকা বিভিন্ন কাজের উপর বিরতিকালের প্রভাব দেখতে পাওয়া গেছে।[৬৮] কর্মবিরতি দিলে যদিও কর্মসময় কমে যায়, তাতে উৎপাদন হ্রাস পায় না বরং উৎপাদন বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, সাইকেলের চেইন সংযোজন কাজে নিয়োজিত একদল মহিলার উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে প্রতি ঘন্টার পর ৫ মিঃ বিরতি দিলে মোট কর্ম সময় ৭% কমে বটে কিন্তু দৈনিক গড় উৎপাদন ১৩% বাড়ে।[৬৯] সাম্প্রতিক কালে করা একটি গবেষণায় দেখা যায় যে বিরতি দেওয়ার জন্য গড় সাপ্তাহিক উৎপাদন বেড়েছে যদিও বিরতি কালগুলি দিনে মোট ৮ ঘন্টার কর্ম সময়কে কমিয়ে ৭ ঘন্টায় আনে। আরও আগে করা অপর একটি গবেষণায় বিরতিকালের গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই গবেষণাটি হয়েছিল আমেরিকার একটি অফিসের করনিকদের উপর। আনুষ্ঠানিকভাবে বিরতি দেওয়ার (সকালে ৮ মিঃ ও বিকালে ৭ মিঃ) আগে ও পরে কর্মসম্পাদনের তুলনা করা হয়। যেহেতু সরকারী অফিসে কাজের সময় কমানো যাবে

Dhaka University Institutional Repository

না সেই জন্য তাদের বাড়তি ১৫ মিঃ কাজ করতে হয়। দুই সপ্তাহের পর্যবেক্ষণে দেখা যায় কর্মীদের নিজে নিজে বিরতি নেওয়ার প্রবণতা তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমে গেছে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মবিরতি দেওয়ার পর উৎপাদন তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়ে গেছে।[৭০]

কর্মঘন্টা এবং কর্মসপ্তাহ বাড়ানো কমানোর সাথেও উৎপাদনের সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়েছে। এক সময় মনে করা হতো যে কর্মঘন্টা যত বাড়ানো হবে উৎপাদন তত বাড়বে। কিন্তু গবেষণালব্ধ তথ্য এই অনুমান সমর্থন করেনি। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জরুরী অবস্থার সময় জনগণের চাহিদা মিটাবার জন্য কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে কর্মঘন্টা ও কর্মসপ্তাহ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কর্মসম্পাদনের উপর এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের প্রভাব পর্যবেক্ষণের একটা ভাল সুযোগ তখন গবেষকরা পেয়েছিলেন। এতে দেখা যায়, কর্মঘন্টা বা কর্মসপ্তাহ বাড়ালে উৎপাদন বাড়ে না। গ্রেট বৃটেনে IFRB এর অধীনে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বেশ কিছু গবেষণা হয় এই বিষয়ের উপর। গবেষণায় দেখা যায় কর্মসপ্তাহের দৈর্ঘ্য একটি বিশেষ সীমা অতিক্রম করলে মোট উৎপাদনের পরিমান বরং হ্রাস পায়। এই তথ্য অনুধাবন করার পর কর্মসপ্তাহ যখন আবার কমিয়ে আনা হয়, উৎপাদন তখন বাড়ে। উদাহরণস্বরূপ, একটি বড় যুদ্ধ উপকরণ তৈরির কারখানায় কর্মসপ্তাহ যখন ৬৬ ঘন্টা থেকে ৪৭.৫ ঘন্টায় কমিয়ে আনা হয় মোট সাপ্তাহিক উৎপাদন ১৩% বৃদ্ধি পায়।[৭১]

Kossoris এবং Kohler আমেরিকার ৩৪টি বিভিন্ন কলকারখানায় একটি জরিপ চালান। এই জরীপের প্রায় ৩৫০০ নারী-পুরুষ অন্তর্ভুক্ত ছিল। জরিপের ফলাফল ছিল এই যে, ৮ ঘন্টার কর্মদিন ও ৫ দিনের কর্মসপ্তাহ দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সর্বোৎকৃষ্ট কর্মঅনুসূচি। এর চাইতে কর্মঘন্টা বাড়ালে উৎপাদন কমে যায় এবং অনুপস্থিতি ও দুর্ঘটনা বাড়ে। কর্মঘন্টা বাড়িয়ে দিলে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার কারণ আছে। একটি প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে বেশীক্ষণ কাজ করতে হবে বলে কর্মী ইচ্ছাকৃতভাবেই তার কাজের গতি কমিয়ে দেয়। কর্মীদের এই প্রবণতা (কাজের সময় বাড়ালে কাজের গতি কমিয়ে দেওয়া) গবেষণাগারের পরীক্ষণে এবং কলকারখানায় অনুষ্ঠিত অনুধ্যানে উভয় ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে। এই সকল গবেষণায় দেখা গেছে কর্মঘন্টা বাড়ালে অনির্ধারিত বিশ্রাম, অনুপস্থিতির হার ও ধীরগতির জন্য অনেক বেশি কর্মসময় নষ্ট হয়। কাজে ভুলভ্রান্তি এবং দুর্ঘটনার হারও বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।[৭২]

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে সংগতি রেখে উৎপাদন বৃদ্ধির এই যুগে মানুষ দিনরাত পালাক্রমে কাজ করে চলেছে। শিল্পোন্নত দেশসমূহে পালাক্রমিক কাজে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কর্মসম্পাদনের উপর পালাক্রমিক কাজের প্রভাব নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। Mott এবং সহকর্মীরা দেখেছেন পালাক্রমিক ব্যবস্থায় ভুল একটু বেশি হয় এবং উৎপাদন কিছুটা কমে, বিশেষ করে রাত্রের শিফট-এ। তাদের মতে কয়েকটি জরীপ এই ধারণা দেয় যে পালাক্রমিক কাজ সময় মাফিক চলা শরীরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, বিশেষ করে ঘুম, হজম, প্রস্রাব, পায়খানা ইত্যাদির ব্যাপারে।[৭৩] বস্তুতঃ পালাক্রমিক কর্মীদের একটি বিশেষ সমস্যা হচ্ছে ঘুমের অসুবিধা। একটি অনুধ্যানে দেখা যায় দিনের পালার ৫% এবং রাতের পালার ৯০% কর্মী ঘুমের অসুবিধায় ভোগে।[৭৪]

দীর্ঘদিন ধরে ঘুমের অসুবিধার ফলে কর্মীদের মধ্যে স্নায়ুদৌর্বল্য ও নানারকম মনোদৈহিক উপসর্গ দেখা দেয়।[৭৫] তবে পালাক্রমিক কর্মীরা কেবল ঘুমের অসুবিধাজনিত স্বাস্থ্য সমস্যাতেই ভোগে না। পালাক্রমিক কাজ সামাজিকতা পালন ও পারিবারিক জীবনেও বিঘ্ন ঘটায়। এতে পানাহারে অনিয়ম ঘটে, অবকাশযাপনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৭৬]

একদিকে পালাক্রমিক কাজ শরীর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এই তথ্য যেমন পাওয়া যায়, অপর দিকে পালার পরিবর্তনের ভাল প্রভাব ও পরিদৃষ্ট হয়। একটি অনুধ্যানে দেখা যায় সুইডিশ স্টীল মিলের কর্মীরা এক শিফট থেকে অন্য শিফট-এ বদলী হলে ভাল বোধ করে- তাদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কুশলতা বৃদ্ধি পায়।[৭৭]

৩.৩.৭ ক্ষতিকারক বস্তুর নাড়াচাড়া, ব্যবহার এবং সংরক্ষণ

একটি প্রস্তুতকারক কারখানা যখন ক্ষতিকারক দ্রব্যাদি ব্যবহার করে, তখন সেগুলো অনেক শ্রমিক কর্তৃক নাড়াচাড়া হয়ে থাকে। এসব দ্রব্য সম্পর্কে এবং এগুলোর ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে অনেক শ্রমিকের কোন ধারণাই থাকে না। তাই এই সব দ্রব্যের ব্যবহার, নাড়াচাড়া বা সংরক্ষণের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। দ্রব্যাদির ক্ষতির সম্ভাবনা নির্ভর করে তাদের রাসায়নিক অবস্থা, ভৌত অবস্থা এবং যে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তাদের ব্যবহার, নাড়াচাড়া বা সংরক্ষণ করা হয়। একটি সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে সর্ব রকম অবস্থার মোকাবিলা করা সম্ভব

Dhaka University Institutional Repository

নয়। তাই যে সকল কাজে ক্ষতিকারক দ্রব্যের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা আছে, যে সকল কাজ অনুমোদিত নিয়ম অনুসারে সম্পন্ন করা উচিত। শুধুমাত্র নির্দেশিত যন্ত্রপাতিই ব্যবহার করা উচিত। সুপারভাইজারের উচিত ক্ষতিকারক কাজগুলিকে চিহ্নিত করা এবং অনুমোদিত ব্যক্তি দ্বারা এ কাজগুলিকে পর্যবেক্ষণ করানো।[৭৮]

দ্রব্যাদির ক্ষতির হাত থেকে দূরে থাকার জন্য কর্তৃপক্ষকে নিয়মিতভাবে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। এসব পদ্ধতি অধিক খরচার হতে হবে, এমন কথা নয়। সুপারভাইজারের উচিত ক্ষতিকারক কাজগুলি একটি সুনির্দিষ্ট জায়গায় এবং একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মানুসারে পরিচালনা করানো। এসব জায়গাগুলিতে সাবধান বাণী থাকা উচিত। খোলা শিখা বা বিপদযুক্ত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি কোন অবস্থাতেই যে সকল জায়গায় প্রজ্জ্বলনক্ষম বা বিপজ্জনক মাল।মাল আছে সেখানে পরিচালনা না করা। এছাড়াও, বহির্গমন সিড়ি ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা উচিত এবং এগুলোকে ভালভাবে আলোকিত রাখা উচিত। ক্ষতিকারক দ্রব্যাদির ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট বিপদমুক্ত যন্ত্রপাতি এবং প্রাথমিক চিকিৎসার যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা বাখা প্রয়োজন। যন্ত্রপাতির সঠিক সংরক্ষণ একটি জরুরী বিষয়। নিয়মিতভাবে শ্রমিকদের জরুরী অবস্থায় যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং করণীয় বিষয়াদির উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত।[৭৯]

ক্ষতিকারক দ্রব্যাদির সংরক্ষণের দায়িত্ব একজন বা নির্দিষ্ট কয়েকজনের উপর বর্তানো উচিত, যারা এসব দ্রব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। মালামাল আদান প্রদানের হিসাব রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং মাল গ্রহণকারীর স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে। সম্ভব হলে ক্ষতিকারক দ্রব্যাদি তালাবদ্ধ করে রাখা উচিত। মাঝে মাঝে মজুদের হিসাব পর্যালোচনা করা উচিত। প্রজ্জ্বলনক্ষম ও বিপজ্জনক দ্রব্যাদি প্রজ্জলিত শিখা বা অত্যধিক গরম এলাকা থেকে দূরে রাখা উচিত। এ ছাড়াও সব দ্রব্যাদি ভালভাবে চিহ্নিতকরণসহ এগুলোর অবস্থা ও সতর্কিকরণ চিহ্ন ব্যবহার করা উচিত। এসকল চিহ্ন এমন ভাষায় লিপিবদ্ধ করতে হবে, যাতে সব শ্রমিক তা বুঝতে পারে।[৮০]

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩.৮ নিরাপত্তা বেষ্টনী ও অন্যান্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা

যেখানে মেশিনপত্র চালনায় বিপদের আশংকা থাকে, সেখানে শুধুমাত্র সতর্কতামূলক পরিচালনার উপর নির্ভর করা উচিত নয়। বেষ্টনী ও অন্যান্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লেও একজন শ্রমিককে আঘাত পাবার হাত থেকে রক্ষা করে। বিপদের আশংকামুক্ত হলেই কেবলমাত্র একটি মেশিনকে কার্যকর বলা চলে। মেশিনের বিপদজনক অংশের সাথে সরাসরি সংস্পর্শে না আনতে পারলেই কেবলমাত্র কার্যকরভাবে একজন শ্রমিককে আঘাতের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব। বিপদজনক অংশ যেমন ঘূর্ণায়মান যন্ত্রাংশ বা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বৈদ্যুতিক তার এগুলো এমনভাবে বেষ্টনী দ্বারা রক্ষা করা উচিত যাতে কেউ ভুলেও এর সংস্পর্শ না আসতে পারে।[৮১]

নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা বিভিন্ন রকম হতে পারে। ঘূর্ণায়মান যন্ত্রাংশ, বেল্ট বা ড্রাম, মেশিনের অন্যান্য ঘূর্ণায়মান অংশ, চলমান অংশ বা তপ্ত অংশ ইত্যাদির জন্য স্থায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে হবে। যদি পরিষ্কারের জন্য বা পরিবর্তনের জন্য নিরাপত্তামূলক এলাকার ভিতর বারংবার যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে, সে ক্ষেত্রে সংবদ্ধ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে মেশিন পুনরায় চালনার পূর্বে বেষ্টনী পূর্বাবস্থায় স্থাপন করতে হবে। স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার অনেক সময় কাজে লাগে।

স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা ব্যবস্থায় একটি চলমান পর্দা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপারেটরকে লোডিং করার সময়, বিপদযুক্ত এলাকা থেকে বিপদমুক্ত রাখে। মাললোডের সময় পর্দাটি উপরে উঠে যায় এবং মেশিন চলার সময় নীচে নেমে আসে। ট্রিপ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় একটি ট্রিপ দন্ড বা পর্দা ব্যবহার করা হয়– যা একটি নির্ধারিত চাপে চালনা করা যায়। এচাপ অতিক্রম করলেই মেশিনটি বন্ধ হয়ে যাবে। অন্য ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বেষ্টনী দ্বারা বিপদযুক্ত এলাকাকে ঘিরে রাখা বা মেশিনপত্রকে শ্রমিকদের থেকে পৃথক রাখা হয়। চূড়ান্তভাবে, বিপদমুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, কেননা, মেশিনাদি ব্যবহারে বিপদ সর্বদা থাকবে।[৮২]

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩.৯ নিরাপদ কাজের ধরন

নিরাপদ কাজের ধরন ও অন্যান্য ব্যবস্থা পাশাপাশিভাবে ব্যবহার করে নিরাপদ কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব। প্রত্যেকটি স্থাপনার নিরাপত্তা ও অপচয়ের জন্য এ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এগুলোকে নিয়মমাফিক পরিচালনা করা উচিত। এ ব্যবস্থা সকল কাজের ক্ষেত্রে পদ্ধতিতে ও শ্রমিকদের সকল কাজে গ্রহণ করতে হবে। নূতন শ্রমিকদের নিরাপদ কাজের ধরনের উপর প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এটা নিরাপত্তা অফিসার বা লাইন সুপারভাইজার অথবা সম্ভব হলে দুজনের দ্বারা পরিচালনা করতে হবে। নিরাপদ কাজের ধরনের উপর পুনঃপ্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ পুনঃপ্রশিক্ষণের ধরন বিভিন্ন স্থাপনার কাজের ধরনের উপর নির্ভর করবে।[৮৩]

যদি সম্ভব হয় স্থাপনার মধ্যে একটি নিরাপত্তা কমিটি গঠন করা উচিত। কমিটি ম্যানেজার, সুপারভাইজার ও শ্রমিক এবং নিরাপত্তা অফিসার (যদি থাকে) সমন্বয়ে গঠিত হবে। কমিটি নিরাপত্তা প্রোগ্রামের সূচনা ও পর্যবেক্ষণ করবেন যাতে দুর্ঘটনা রোধ করা যায়। কমিটি অনিশ্চিত দুর্ঘটনা রোধকল্পে ও যথাযথ কর্মপদ্ধতির জন্য সব ধরনের নূতন মালামাল ও পদ্ধতি পরীক্ষা করবেন। প্রাথমিক চিকিৎসা ও অগ্নিরোধকল্পে যথাযথ মেশিনের ব্যবহার ও প্রশিক্ষণ প্রদান আইন দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। এ আইনগত বিধি নিষেধ স্বল্পমূল্যে গৃহীত ব্যবস্থা দ্বারা আনা সম্ভব।[৮৪]

৩.৪ শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য সুবিধাদি

ভাল কর্মপরিবেশের জন্য একটি প্রয়োজনীয় দিক হচ্ছে কল্যাণের সুবিধাদি। একটি কাজের দিনে, একজন শ্রমিকের যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, পান করার জন্য পানি বা অন্য কোন পানীয়, খাবার বা নাস্তা, হাতমুখ ধোঁয়া, টয়লেট ব্যবহার ও ক্লান্তি দূর করার জন্য বিশ্রাম। বিশেষ পোষাক এবং পোষাক পরিবর্তনের রুমেরও দরকার হতে পারে। কল্যাণের জন্য ভাল ব্যবস্থাদি যে শুধু শ্রমিকদের কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে তাই নয়, উৎপাদন বৃদ্ধি ও সু-সম্পর্ক স্থাপনে এর অবদান অনস্বীকার্য। শ্রমিকের দরকারী প্রয়োজনাদি না মিটালে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।[৮৫]

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪.১ স্যানিটারী সুবিধাদি

কর্মক্ষেত্রে ভালো স্যানিটারী সুবিধা থাকা উচিত। এর মধ্যে পরিষ্কার টয়লেট, ধোয়া মোছার সুবিধাও গোসলখানা উল্লেখযোগ্য। বেশির ভাগ দেশে এসব সুবিধাদির ব্যবস্থা থাকা বাধ্যগত করা হয়েছে বিভিন্ন আইন ও রীতিনীতির আলোকে। এ সমস্ত সুবিধাদি পর্যাপ্ত পরিমানে থাকা উচিত। তবে এগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা জরুরি। এসব স্যানিটারী সুবিধাদি শ্রমিকদের কল্যাণ এবং তাদেরকে অসুখমুক্ত রাখতে সাহায্য করে। সু-ব্যবস্থা সমৃদ্ধ স্যানিটারী সুবিধাদি উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে। কারণ ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী শ্রমিক বেশি কর্মক্ষম এবং তাদের অনুপস্থিতির হারও কম হয়। কোন কাজ যদি গরম ও অপরিষ্কার স্থানে বা রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে করতে হয়, সে ক্ষেত্রে গোসলের সুবিধাসহ কাপড় চোপড় বদলানোর কামরা থাকতে হবে। দুঃখজনক হলেও সত্য, প্রায়শঃ স্যানিটারী সুবিধাদি অবহেলিত হয়। দেখা যায় এ ব্যবস্থাদি কর্মক্ষেত্র থেকে দূরে অবস্থিত বা এদের সংখ্যা অপ্রতুল অথবা এগুলোর কোন যত্ন নেয়া হয় না। এখনও দেখা যায় অনেক শিক্ষিত লোক টয়লেট সম্পর্কে কোন কথা বলতে চায় না। এসব মূল সুবিধাদি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা ও এগুলোর গুরুত্বের কথা বিবেচনা করা উচিত।[৮৬]

৩.৪.২ পানীয় এবং খাবারের সুবিধাদি

মানুষের মূল চাহিদার মধ্যে খাবার এবং পানীয় অন্যতম। সুপেয় খাবার পানি বা অন্যান্য পানীয় অথবা পর্যাপ্ত খাবার ছাড়া একজন শ্রমিক কার্যক্ষম থাকতে পারবে না। সব ধরনের কাজের জন্য খাবার পানি অপরিহার্য। বিশেষতঃ তপ্ত পরিবেশে কাজ করার সময় ঘামে বা চামড়া থেকে বাষ্প উড়ে যাবার ফলে প্রচুর পানির ঘাটতি হয়। তপ্ত আবহাওয়ায়, পানি ঘাটতির এই পরিমান প্রতি পালায় বেশ কিছু লিটার হতে পারে। শ্রমিকদের খাবার পানির সুবিধাদি প্রদান বা করলে তৃষ্ণা মেটাতে তাদেরকে নিজেদেরই ব্যবস্থা করতে হবে অথবা কার্যক্ষেত্র ত্যাগ করে প্রায়শই পানির খোঁজ করতে হবে। অস্বাস্থ্যকর পানি পানে অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে প্রচুর। শ্রমিকেরা তৃষিত হয়ে পড়লে, তারা তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং ফলে উৎপাদনও কমে যায়। তাই কর্মক্ষেত্রের পার্শ্বে পর্যাপ্ত পরিমান বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা রাখা অপরিহার্য। টিউবওয়েল, পানির সরবরাহের লাইন বা বিশেষ পাত্রে করে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা যেতে পারে। সন্দেহ থাকলে টিউবওয়েল বা পানির লাইন থেকে প্রাপ্ত পানি ফুটিয়ে বা ফিল্টারের সাহায্যে জীবানুমুক্ত করতে হবে। ঠান্ডা পানির ব্যবস্থা রাখা উত্তম।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষতঃ পানির আধার বা পাত্র সূর্যতাপে বা গরম জায়গায় রাখা ঠিক নয়। খাবারের সুবিধাদি বিভিন্নভাবে দেওয়া যেতে পারে। ছোট স্থাপনা, ছোট ক্যান্টিন বা বাইরের এজেন্টের সহযোগিতায় খাবারের ব্যবস্থা করা যায়। রান্নার ব্যবস্থা রাখাও অনেক সময় ভাল হতে পারে। কেন্টিনের ব্যবস্থা যদি ব্যয়বহুল হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে পৃথক খাবারের রুমের ব্যবস্থা রাখা উচিত। ভাল স্বাস্থ্য ও উৎপাদনশীলতার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ পুষ্টিকর ও পরিমিত খাবারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।[৮৭]

৩.৪.৩ চিত্তবিনোদন, শিশু পরিচর্যা এবং যাতায়াত সুবিধাদি

কারখানা ভিত্তিক কল্যাণমূলক কার্যাদি শুধু যে কাজের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হবে তাই নয়। অধিকন্তু কাজের বাইরে প্রাত্যহিক কাজের সাথেও এর যোগসূত্র থাকতে হবে। এগুলোর মধ্যে শিশু পরিচর্যা, চিত্ত বিনোদনের সুবিধাদি এবং যাতায়াত উল্লেখযোগ্য। একটি কারখানার পক্ষে এ ধরনের সব সুবিধা দেওয়া হয়তো সম্ভব নয়। এ ধরনের সুবিধা থাকলে শ্রমিকদের মাঝে একটা অনুভূতি জন্মায় যে বৃহৎ স্থাপনাই এ ধরনের সুবিধা দেয় তাই নয়, অনেক মাঝারি সাইজের স্থাপনায় এ ধরনের সুবিধাদি বিভিন্নভাবে প্রদান করে থাকে। এ ধরনের সুবিধাদি স্বল্প মূল্যে প্রদান করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চিত্তবিনোদনের জন্য গৃহীত সুবিধাদি। অনেক শ্রমিক তাদের দুপুরের খাবার বিরতিতে অথবা ছুটির পর খেলাধুলা বা অন্য কোন বিনোদনের সুবিধাদি ভোগ করে খুশী থাকতে পারে। এ ধরনের ব্যবস্থা স্বাস্থ্য গঠন ও বন্ধুত্বমূলক ব্যবস্থা গঠনে সহায়ক হয়। এসব ব্যবস্থাদি শ্রমিকদের কারখানার সাথে তাদের একাত্মতা বৃদ্ধিসহ নিজেদেরকে কারখানার একজন হিসাবে বিবেচিত করে। বাস্কেট বল, ভলিবল বা ক্যারাম বোর্ডের মত খেলাধুলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেহেতু বেশির ভাগ শ্রমিক এসব ব্যবস্থাদিতে নিজেকে জড়াবে, তাই ছোট স্থাপনার জন্য এসব ব্যবস্থাদি আরো বেশি সুফল বয়ে আনতে পারে।[৮৮]

শ্রমিকের সংখ্যা, স্থান, কাজের ধারা ও অন্যান্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে হোস্টেল, শিশু পরিচর্যার এবং যাতায়াতের ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে। যখন সহজ প্রাপ্য থাকে না তখন এ ধরনের সুবিধাদি শ্রমিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ধরনের সুবিধাদির মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিশেষ ব্যবস্থাদি নেয়া উচিত। শিশু পরিচর্যা ব্যবস্থাদি পরিষ্কার, স্বাস্থ্য সম্মত এবং স্বাচ্ছন্দ বায়ু চলাচল উপযোগী হওয়া আবশ্যক। যাতায়াতের জন্য পাবলিক যানবাহন, ব্যক্তি মালিকানাধীন বাসের সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলা আবশ্যক।[৮৯]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. রওশন জাহান, শিল্পে মনোবিজ্ঞান ঃ কর্ম বিজ্ঞান, ১ম সংস্করণ, আমাদের বাংলা প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১৯৫ ও ১৯৬।

২. মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, সাংগঠনিক ব্যবহার ও শিল্প মনোবিজ্ঞান, ৩য় সংস্করণ, ছাত্র বন্ধু পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২০৩।

৩. রওশন জাহান, শিল্পে মনোবিজ্ঞান ঃ কর্ম বিজ্ঞান, ১ম সংস্করণ, আমাদের বাংলা প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১৯৭।

৪. Gilmer, B.V.H., Industrial Psychology, McGraw-Hill Book Co., Newyork, 1966.

৫. রওশন জাহান, শিল্পে মনোবিজ্ঞান ঃ কর্ম বিজ্ঞান, ১ম সংস্করণ, আমাদের বাংলা প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১৯৭ ও ১৯৮।

৬. ঐ, পৃ. ১২৮, ১২৯ ও ১৩০।

৭. Planning Commission, Ministry of Planning, Govt. of The Peoples Republic of Bangladesh, Fifth Five year plan, 1997-2002.

৮. Tiffin, Joseph, Industrial Psychology, 3rd Edition, Prentice-Hall, Newjersy, 1956, p. 460.

৯. কাজুতাকা কোগী ও অন্যান্য, কার্যাবস্থা উন্নয়নে স্বল্প ব্যয়ের পদ্ধতিসমূহ ঃ এশিয়ার ১০০টি উদাহরণ, প্রডাকটিভিটি সার্ভিসেস উইং, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন, সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ৯।

১০. ঐ, পৃ. ১০।

১১. ঐ. পৃ. ১০।

১২. ঐ, পৃ. ১০ ও ১১।

১৩. ঐ, পৃ. ৩৪।

১৪. ঐ,. পৃ. ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. ঐ, পৃ. ৪৮ ও ৪৯।

১৬. ঐ, পৃ. ৪৯।

১৭. ঐ, পৃ. ৬৫।

১৮. ঐ, পৃ. ৭৫।

১৯. ঐ. পৃ. ৭৫ ও ৭৬।

২০. ঐ, পৃ. ৭৬।

২১. Hepner, H.W., Psychology Applied to Life and work 3rd Edition, Prentice-Hall, Inc. Englewood, Newjersy, 1965, p. 364.

২২. রওশন জাহান, শিল্পে মনোবিজ্ঞান ঃ কর্মবিজ্ঞান, ১ম সংস্করণ, আমাদের বাংলা প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১৩১।

২৩. Luckiesh, M., and Moss. F. K., The Science of seeing, Princeton, N. J., Van Nostrand, 1937.

২৪. Faulkner, T.W., and Murphy, T. J., Lighting for Difficult Visual Tasks, Human Factors, 1973, 15, 149-162.

২৫. রওশন জাহান, শিল্পের মনোবিজ্ঞান ঃ কর্মবিজ্ঞান, ১ম সংস্করণ, আমাদের বাংলা প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১৩২।

২৬. ঐ, পৃ. ১৩২ ও ১৩৩।

২৭. Tinker. M. A., Illumination Standards for Effective and Easy seeing, Psychological Bulletin, 1947, p. 435-450.

২৮. Kuntz, J. E, and sleight, R. B., Effect of target brightness on normal and Subnormal visual Acquity, Journal of Applied Psychology, 1949, p. 83-91.

২৯. Mc Cormic, E. J., Human Factors in Engineering and Design, McGraw Hill, Newyork, 1976, p. 193-195.

৩০. Ferre, C.E., and rand, G. The Power of the Eye to Sustain Clear seeing under different Conditions of lighting. Journal of Educational Psychology, 1917, P. 457.

Dhaka University Institutional Repository

৩১. কাজুতাকা কোগী ও অন্যান্য, কার্যাবস্থা উন্নয়নে স্বল্প ব্যয়ের পদ্ধতি সমূহ ঃ এশিয়ার ১০০টি উদাহরণ, প্রডাকটিভিটি সার্ভিসেস উইং বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন, সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ৭৬।

৩২. ঐ, পৃ. ৭৭।

৩৩. Bennett, C.A., and Rey, P., Whats So What About Red? Human Factors, 1972, P. 149-154.

৩৪. Eysenck. H.J., Acritical and experimental study of color preferences. Americal journal of Psychology, 1941, 54, p. 385-394.

৩৫. Acking, C.A, and Kuller, R. The Perception of an interior as a function of its colour, Ergronomics, 1972, p. 645-654.

৩৬. Ali, M. R., and Jahan, R., Critical flicker frequency and a function of clolour, The Dacca University studies, 1974, p. 125-133.

৩৭. Spragg, S.D.S., and Rock, M.C., Dial reading performance as a functions of colour of illumination, Journal of Applied Psychology, 1952, P. 186-200.

৩৮. রওশন জাহান, শিল্পে মনোবিজ্ঞান ঃ কর্ম বিজ্ঞান, ১ম সংস্করণ, আমাদের বাংলা প্রেস লিঃ ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১৪৬।

৩৯. কাজুতাকা কোগী ও অন্যান্য, কার্যাবস্থা উন্নয়নে স্বল্পব্যয়ের পদ্ধতি সমূহ ঃ এশিয়ার ১০০টি উদাহরণ, প্রডাকটিভিটি সার্ভিসেস উইং, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন, সেপ্টেম্বর, ১৯৯২, পৃ. ৮৯।

৪০. এ, পৃ. ৮৯ ও ৯০।

৪১. MCcormic, E.J., Human Engineering, McGraw Hill, New york 1957, p. 196.

Dhaka University Institutional Repository

৪২. Vernon. H. M., and Bedford, T., The Relation of Atmospheric Conditions to The Working Capacity and The Accident Rate of Coal Miners, IFRB rept. No. 39, 1927.

৪৩. Vernon, H. M., and Bedford, A Study of Absenteeisim in Group of Ten Colliers. IFRB rept. No 51, 1928.

৪৪. Osborne, E.E., and Vernon, H.M., The Influence of Temparature and Other Conditions on The Frequency of Industrial Accidents, IFRB, rept. No 19, 1922.

৪৫. Waytt, S. Franser, J.A, and Stock, F.G.L., Fan Ventilation in a Humid Weaving Shed, IFRB, rept. No 37, 1926.

৪৬. Glass, D.C. and singer, J.E., Urban stress : Experiments and noise and social stressors, Academic press, New york, 1972.

৪৭. Burrows, A. A., Acoustic Noise, and Informational Definition, Human factors, 1960, 2, P. 163-168.

৪৮. কাজুতাকা কোগী ও অন্যান্য, কার্যাবস্থা উন্নয়নে স্বল্প ব্যয়ে পদ্ধতি সমূহ ঃ এশিয়ার ১০০টি উদাহরণ, প্রডাকটিভিটি সার্ভিসেস উইং, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ৮৯।

৪৯. ঐ. পৃ. ৯০।

৫০. Kryter, K. D., The Effects of Noise on Man, Academic press, New york, 1970.

৫১. রওশন জাহান, শিল্পে মনোবিজ্ঞান ঃ কর্ম বিজ্ঞান, ১ম সংস্করণ, আমাদের বাংলা প্রেস লিঃ, ঢাকা ঃ ১৯৯০, পৃ. ১৬২ ও ১৬৩।

৫২. Finkelman, J. M., and Glass, D.C., Reppraisal of the Relationship Between Noise and Human Performance Bymeans of a Subsidiary Task Measure Journal of Applied Psychology, 1970, 54, p. 211-213.

Dhaka University Institutional Repository

৫৩. McBain, W. N., Noise, The Arousal Hyphothesis and Monotonous work, Journal of Applied Psychology, 1967, 45 P. 309-317.

৫৪. Park, J. F. JR., and Payne, M.C. JR., Effects of Noise level and Difficulty of Task in Performing Division, Journal of Applied Psychology, 1963, 47 p. 367-368.

৫৫. Anastasi, A fields of applied psychology (2nd ed), MC Graw Hill kogakusha Ltd, Tokyo, 1979.

৫৬. Kryter, K.D., The Effects of Noise on Man, Academic press, New york, 1970.

৫৭. Cohen, A The Role of Psychology in Improving Worker Safety and Health Act., American Psychological Association. Honolulu, Hawaii, sept. 1972.

৫৮. Jones. H. H., and Chohen, A Noise as a Health Hazard at Work, in The Community and in The Home. USPHS, Public Health Reports, 1968, p. 533.

৫৯. রওশন জাহান, শিল্পে মনোবিজ্ঞান ঃ কর্মবিজ্ঞান, ১ম সংস্করণ, আমাদের বাংলা প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১৭৯।

৬০. Uhrbrock, R.S., Music on The Job : Its Influence on Worker Morale and Productionity, Personnal Psychology, 1967, p. 9.

৬১. Hepner, H. W., Psychology Applied to Life and work, 3rd Edition, p. 366.

৬২. Kerr, W. A., Experiments on the Effects of Music on Factory Production, Applied Psychology Monographs, 1954.

৬৩. Megehee, W., and Gardner, J. E., Music in a Complex Industrial Job, Personnel Psychology, 1949, p. 405.

Dhaka University Institutional Repository

৬৪. Uhrbrock, R.S., Music on The Job : Its Inluence on Worker Morale and Productinity, Personnel Psychology, 1967, p. 38.

৬৫. Smith H. C., Music in Relation to Employee Attitudes, Piece Work Production and Industrial Accidents, Applied Psychology Monographs, 1947.

৬৬. Haque, R, Effects of Music on Productivity and Employee Attitude in a Garments Factory, Unpublished Project, Dhaka University, 1989.

৬৭. রওশন জাহান, শিল্পে মনোবিজ্ঞান ঃ কর্ম বিজ্ঞান, ১ম সংস্করণ, আমাদের বাংলা প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ২৩৩।

৬৮. Love day, J. and Munroe, S. H., Preliminary Notes on The Boot and Shoe Industry, Industrial Fatigue Research Board, Rept,. No. 10, 1920.

৬৯. Vernon, H. M., and Bedford, T., The Influcuce of Rest Pauses on Light, Industrial work, Industrial Fatigue Research Board, Rept. No. 25, 1924.

৭০. MCGehee, W., and Owen, E.B., Authorized and Unauthorized Rest Pauses in Clerical Work, Journal of Applied Psychology, 1940, p. 605-614.

৭১. Vernon, H. M., The Speed of Adaptation of Output of Altered Hours of Work, Industrial Fatigue Research Board Rept. No. 6. 1920.

৭২. Kossoris, M. D., and Kohler, R.F., Hours of Work and Output, U.S., Department of Labor, Bureau of Labour statistics, Bulletion No. 917, 1947.

৭৩. Mott, P.E., Mann, F.C., Mclaughlin, Q., and Warwick, D.P., Shift Work : The Social Psychological and Physical

Dhaka University Institutional Repository

Consequences, Ann Arbor, Mich : University of Michigan Press, 1965.

৭৪. Knauth, P., and Rutenfranz, J., Duration of Sleeprelated to the Type of Shift Work, In a Reinberg. W., Vieux, and P., Andlaure (Eds), Night and shift work : Biological and social aspects, Pergamon press, Oxbord, 1981.

৭৫. Koller, M., and Haider, M., Psychological Problems and Psychosmatic Symptoms of Night and Shift Workers, Activ. Nerv. Sup. 1977, 19, 437.

৭৬. Khaleque, A., and Rahman, A., Shiftworkers Attitudes Towards Shift Work and Perception of Quality of Life, International Archieves of Occupational and Environmental Health, 1984, 53, 293-297.

৭৭. Akerstedt, T., and torsvall, L., Experimental Changes in Shift schedules : Their Effects on well-being, Ergonomics, 1978, 21, 849-856.

৭৮. কাজুতাকা কোগী ও অন্যান্য, কার্যাবস্থা উন্নয়নে স্বল্পব্যয়ের পদ্ধতি সমূহ ঃ এশিয়ার ১০০টি উদাহরণ, প্রডাকটিভিটি সার্ভিসেস উইং, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন, সেপ্টেম্বর, ১৯৯২, পৃ. ১০৫।

৭৯. ঐ, পৃ. ১০৫ ও ১০৬।

৮০. ঐ, পৃ. ১০৬।

৮১. ঐ, পৃ. ১১৪ ও ১১৫।

৮২. ঐ, পৃ. ১১৫।

৮৩. ঐ, পৃ. ১৩১।

৮৪. ঐ, পৃ. ১৩১।

৮৫. ঐ, পৃ. ১৫১।

৮৬. ঐ, পৃ. ১৫১ ও ১৫২।

৮৭. ঐ, পৃ. ১৫৯ ও ১৬০।

৮৮. ঐ, পৃ. ১৬৭ ও ১৬৮।

৮৯. ঐ, পৃ. ১৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৪

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৪

জরিপকৃত ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যপরিবেশ

কারখানা আইনে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, কল্যাণ, নিরাপত্তা ও অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন বিধান রয়েছে। ঢাকার ২০টি ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠান জরিপ করে বাস্তবে কি ঘটছে আলোচ্য গবেষণায় তা জানার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

৪.১ প্রাথমিক কিছু তথ্য

কারখানা আইনে প্রাপ্তবয়স্ক বা সাবালক, কিশোর ও শিশু শ্রমিকের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। সাবাল সেই ব্যক্তি যার বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হয়েছে।[১] যে ব্যক্তির বয়স ১৬ বছর পূর্ণ হয়েছে, ১৮ বছরপূর্ণ হয়নি তাদের কিশোর বলা হয়।[২] ১৬ বছরের নীচে যাদের বয়স তারাই শিশু হিসেবে গণ্য হয়।[৩]

জরিপকালে কারখানা আইনে বর্ণিত শ্রমিকদের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ উভয় ধরনের শ্রমিকই কাজ করে থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকগণ অভিজ্ঞ কিন্তু শিশু ও কিশোর শ্রমিকগণের বেশির ভাগই কাজ শেখার জন্য এসে থাকে। শিশু ও কিশোর শ্রমিকগণ প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকদের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করে থাকে।[৪]

প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করে দেখা গিয়েছে যে, বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানেই মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা একেবারেই কম। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে ১ জন করে রয়েছেন যারা শুধুমাত্র রান্নাবান্নার কাজ করে থাকে। শাড়ি তৈরি কারখানায় ২/১ জন করে মহিলা শ্রমিক থাকেন যাদের কাজ শুধুমাত্র সুতা ভরা কিংবা চরকা কাটা। তবে সুয়েটার কারখানায় মোট শ্রমিকের অর্ধেক মহিলা শ্রমিক কাজ করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-১

জরিপকৃত ক্ষুদ্রশিল্পের সংখ্যার ভিত্তিতে মহিলা শ্রমিকদের বণ্টন-

ক্ষুদ্র শিল্প / মহিলা শ্রমিক আছে/নাই	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা				শতকরা হার (%)			
	বস্ত্র	ইঞ্জিনিয়ারিং	খাদ্য	মোট	বস্ত্র	ইঞ্জিনিয়ারিং	খাদ্য	মোট
আছে	৫	-	৩	৮	২৫	-	১৫	৪০
নাই	২	৬	৪	১২	১০	৩০	২০	৬০
মোট	৭	৬	৭	২০	৩৫	৩০	৩৫	১০০

সারনী-১ এ দেখা যাচ্ছে ২৫% বস্ত্র শিল্পে এবং ১৫% খাদ্য শিল্পে অর্থাৎ মোট ৪০% ক্ষুদ্র শিল্পে মহিলা শ্রমিক আছে। অন্যদিকে, ১০% বস্ত্র শিল্পে, ৩০% ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে এবং ২০% খাদ্যশিল্পে অর্থাৎ শতকরা ৬০% ক্ষুদ্র শিল্পে মহিলা শ্রমিক নেই।[৫]

সকল প্রতিষ্ঠানেই প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ শ্রমিক কাজ করে থাকে। সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে মহিলা, কিশোর ও শিশু শ্রমিকের সংখ্যা তেমন বেশি নেই। প্রতিষ্ঠানগুলিতে কিশোরী ও মহিলা শিশু শ্রমিক নেই।

সারনী-২

বিভিন্ন বয়সী শ্রমিকের সংখ্যার ভিত্তিতে জরিপকৃত কারখানাসমূহের বণ্টন–

বিভিন্ন বয়সী শ্রমিকের বর্ণনা	শ্রমিকের সংখ্যা				শতকরা হার (%)			
	বস্ত্র	ইঞ্জিনিয়ারিং	খাদ্য	মোট	বস্ত্র	ইঞ্জিনিয়ারিং	খাদ্য	মোট
প্রাপ্ত বয়স্কপুরুষ	৬২	১১১	১২১	২৯৪	২১.০	৩৭.৮	৪১.২	১০০
প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা	১০	-	৪	১৪	৭১.৪	-	২৮.৬	১০০
কিশোর	১৬	৪৩	২৪	৮৩	১৯.৩	৫১.৮	২৮.৯	১০০
শিশু	৮	২	১২	২২	৩৬.৪	৯.১	৫৪.৫	১০০
মোট	৯৬	১৫৬	১৬১	৪১৩	২৩.২	৩৭.৮	৩৯.০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-২ এ দেখা যাচ্ছে যে, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি খাদ্য (৪১.২%) এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে (৩৭.৮%)। বস্ত্রশিল্পে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম (২১.০%)। প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা বস্ত্র শিল্পে বেশি (৭১.৪%) এবং খাদ্য শিল্পে কম (২৮.৬%)। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে কোন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা শ্রমিক নেই। কিশোর শ্রমিকের সংখ্যা ইঞ্জিনিয়ারিং (৫১.৮%) ও খাদ্য শিল্পে (২৮.৯%) সবচেয়ে বেশি। তুলনামূলকভাবে বস্ত্রশিল্পে (১৯.৩%) কিশোর শ্রমিকের সংখ্যা কম। খাদ্য (৫৪.৫%) ও বস্ত্রশিল্পে (৩৬.৪%) শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বেশি কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে কম।[৬]

৪.২ শ্রমিক কর্মীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যবস্থা

কারখানা নির্মাণ ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে, কারখানা নির্মাণ বা সম্প্রসারণের জন্য প্রধান পরিদর্শকের নিকট হতে নির্ধারিত নিয়মে লিখিত পুর্বানুমতি গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে।[৭]

১৯৭৯ সালের কারখানা বিধিমালা অনুসারে প্রধান পরিদর্শকের অনুমোদিত পরিকল্পনা মোতাবেক কারখানা নির্মাণ বা সম্প্রসারণ করতে হবে। কিন্তু কারখানা আইন ও বিধিমালা মোতাবেক কোন প্রতিষ্ঠানই সত্যিকার অর্থে নির্মিত হয়নি। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশ বিরাজ করছে। কর্মরত শ্রমিকদের শরীর থেকে ঘাম ও দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। কোন কোন প্রতিষ্ঠানের কিছু অংশের উপরের চালে টিন নেই, আবার কোন প্রতিষ্ঠানের টিনের চালে মাঝে মাঝে ছিদ্র দেখা দিয়েছে। ফলে কারখানাসমূহের মেঝে বৃষ্টির পানি পড়ার কারণে ভিজে স্যাত স্যাতে নোংরা হয়ে গিয়েছে। আর এই নোংরা পরিবেশেই শ্রমিকরা কাজ করছে।

সারনী-৩

ছাদ ও টিনের অবস্থার ভিত্তিতে জরিপকৃত কারখানাসমূহের বন্টন-

কারখানার ছাদ ও টিনের অবস্থা	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
উন্নত ছাদ	১১	৫৫
ছিদ্রযুক্ত টিনের চাল	৩	১৫
টিনবিহীন চাল	২	১০
উন্নত টিনের চাল	১	৫
মোটামুটি উন্নত টিনের চাল	২	১০
অনুন্নত টিনের চাল	১	৫
মোট	২০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-৩ এ দেখা যাচ্ছে যে, ক্ষুদ্রশিল্প সমূহের মধ্যে ৫৫% প্রতিষ্ঠান উন্নত ছাদ রয়েছে। ১৫% প্রতিষ্ঠানের টিনের চালে ছিদ্র দেখা দিয়েছে। শতকরা ১০% প্রতিষ্ঠানের উপরের কিছু অংশের চালে টিন নেই। শতকরা ৫% প্রতিষ্ঠানের টিনের চাল উন্নত। ১০% প্রতিষ্ঠানের টিনের চাল মোটামুটি উন্নত কিন্তু ৫% প্রতিষ্ঠানের টিনের চাল অনুন্নত।[৮]

ময়লা ও আবর্জনা অপসারণ ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়াজাত আবর্জনা এবং দুষিত তরল পদার্থ অপসারণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।[৯] কারখানা বিধিমালায় বলা হয়েছে, যে স্থানে সরকারি পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা নেই, সেখানে ময়লা ও আবর্জনা অপসারণ প্রক্রিয়া প্রধান পরিদর্শকের অনুমোদন সাপেক্ষেই হতে হবে। কারখানা আইনে আরও বলা হয়েছে, কারখানার মেঝে, কাজ করার ঘরের বেঞ্চসমূহ, উঠানামা করার সিঁড়ি, চলাচলের পথ প্রতিদিন ঝাড়ু দ্বারা বা অন্য কোন কার্যকর পন্থায় আবর্জনামুক্ত রাখতে হবে।[১০] কিন্তু প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের ইচ্ছামত ময়লা ও আবর্জনা অপসারণ করে থাকে।

সারনী-৪

ময়লা ও আবর্জনা অপসারণ প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে জরিপকৃত কারখানাসমূহের বন্টন–

ময়লা ও আবর্জনা অপসারণ প্রক্রিয়া	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ঝাড়ুদিয়ে ময়লা ডাস্টবিনে ফেলা হয়	১৮	৯০
টিন দিয়ে উঠিয়ে ময়লা ডাস্টবিনে ফেলা হয়	২	১০
মোট	২০	১০০

সারনী-৪ এ দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৯০% প্রতিষ্ঠান ঝাড়ু দিয়ে ময়লা ডাস্টবিনে ফেলে থাকে। অন্যদিকে শতকরা ১০% প্রতিষ্ঠান টিন দিয়ে উঠিয়ে ময়লা ডাস্টবিনে ফেলে থাকে।[১১]

কাজ করার কামরা ধৌতকরণ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

কারখানা আইনে বলা হয়েছে, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্যে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার কারখানা ঘরের প্রতিটি মেঝে ধৌত করতে হবে এবং প্রয়োজনে কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার বা অন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উৎপাদন প্রক্রিয়া চালাবার কারণে যদি মেঝেতে পানি জমে যায় তবে সেই পানি অপসারণের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।[১২]

জরিপে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানেই কাজ করার কামরা ধোয়ার মত কোন পরিবেশ নেই। কেননা প্রতিষ্ঠানের মেঝে অর্ধভগ্ন কিংবা কাঁচা হওয়ার কারণে মেঝে ধোওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানই কামরা ধৌত করে না।[১৩]

সারনী-৫

কাজ করার কামরা ধৌতকরণ প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে

জরিপকৃত কারখানাসমূহের বন্টন–

ধৌতকরণের প্রক্রিয়া	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
বিভিন্ন এন্টিসেপটিক দিয়ে ধোয়া হয়	৩	১৫
মোটেই ধোয়া হয় না	৬	৩০
ধোয়ার মত পরিবেশ নেই	৯	৪৫
শুধুমাত্র পানি দিয়ে ধোয়া হয়	২	১০
মোট	২০	১০০

সারনী-৫ এ দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ১৫% প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন এন্টিসেপটিক দিয়ে কাজ করার কামরা ধোয়া হয়। শতকরা ৩০% প্রতিষ্ঠানে কাজ করার কামরা মোটেই ধোয়া হয় না। শতকরা ৪৫% প্রতিষ্ঠানে ধোয়ার মত কোন পরিবেশ নেই। অন্যদিকে শতকরা মাত্র ১০% প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র পানি দিয়ে কাজ করার কামরা ধোয়া হয়।[১৪]

খাদ্য শিল্পে বিস্কুট, রুটি, কেক ইত্যাদি ময়লাযুক্ত পরিবেশে তৈরি হচ্ছে। হাতে আবরণ না লাগিয়ে দু'হাত দিয়ে তারা কাজ করছে। ফলে এসব খাদ্যদ্রব্য খেয়ে মানুষ অতি সহজেই রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আছে। আটা/ময়দা ভাঙ্গার মেশিনগুলো খোলা অবস্থায় পড়ে আছে,

Dhaka University Institutional Repository

যাতে অসংখ্য ময়লা জমে আছে। অন্যান্য সরঞ্জাম ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। শ্রমিকরা নোংরা পোষাক পড়েই কাজ করে থাকে। বস্ত্র শিল্পের কিছু প্রতিষ্ঠানের করিডোরে প্রচুর আবর্জনা পড়ে আছে। বিভিন্ন বস্ত্র শিল্পে বিশেষত তাঁতের শাড়ি তৈরি কারখানার উপরের বেড়ায়, দেয়ালে মাকড়সা জাল বিস্তার করে আছে। সকল ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের মেঝে যেহেতু মাটির তাই সেগুলো ধোয়ার প্রয়োজন হয় না। কিছু কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ভিতরে ভীষণ অন্ধকার। বিভিন্ন মেশিনারী সামগ্রী এমনভাবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে যে ভিতরে প্রবেশের মত জায়গাও রাখা হয়নি। অপরিষ্কার শ্রমিকরা সবাই ভীড় জমিয়ে জটলা বেঁধে কাজ করছে। হৈচৈ হচ্ছে। অনেক প্রতিষ্ঠানের দেয়ালে চুনকাম ও রং করা থাকলেও দেয়ালে দেয়ালে ময়লা জমে আছে। উপরে বৈদ্যুতিক পাখায় প্রচুর ময়লা ও মাকড়সার জাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।[১৫]

চুনকাম ও রং ঃ কারখানা বিধিমালা ১৯৭৯ মোতাবেক প্রত্যেক কারখানায় প্রতি ১৪ মাসে একবার করে প্রয়োজনমত সাবান ও ব্রাশ সহযোগে ঘষে ধৌত করার পর চুনকাম ও রং বা বার্নিশ করতে হবে।

সারনী-৬

চুনকাম ও রং এর ভিত্তিতে জরিপকৃত কারখানাগুলোর বন্টন–

চুনকাম ও রং সংক্রান্ত তথ্য	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা				শতকরা হার (%)			
	বস্ত্র	ইঞ্জিনিয়ারিং	খাদ্য	মোট	বস্ত্র	ইঞ্জিনিয়ারিং	খাদ্য	মোট
চুনকাম ও রং করা হয়	২	৪	৪	১০	১০	২০	২০	৫০
চুনকাম ও রং করা হয় না	৬	২	২	১০	৩০	১০	১০	৫০
মোট	৮	৬	৬	২০	৪০	৩০	৩০	১০০

সারনী-৬ এ দেখা যাচ্ছে, শতকরা ৫০% ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানে চুনকাম ও রং করা হয়। অন্যদিকে শতকরা ৫০% ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানে চুনকাম ও রং করা হয় না। সারনীতে আরও

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ১০% বস্ত্রশিল্পে চুনকাম ও রং করা হয়। কিন্তু শতকরা ৩০% বস্ত্রশিল্পে চুনকাম ও রং করা হয় না। শতকরা ২০% ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে চুনকাম ও রং করা হয়। কিন্তু শতকরা ১০% ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে চুনকাম ও রং করা হয় না। শতকরা ২০% খাদ্য শিল্পে চুনকাম ও রং করা হয়। কিন্তু শতকরা ১০% খাদ্য শিল্পে চুনকাম ও রং করা হয় না।[১৬]

ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ চুনকাম ও রং করার পূর্বে আইন মোতাবেক পরিষ্কার ও ধৌত করে না। কারখানা বিধিমালায় প্রয়োজনমত সাবান ও ব্রাশ সহযোগে ঘষে ধৌত করার পর চুনকাম ও রং বা বার্নিশ করার কথা বলা থাকলেও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ সেই মোতাবেক কাজ করে না।[১৭]

দেয়াল ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিছু কিছু ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানের দেয়ালে ময়লা জমে আছে এবং মাকড়সা জাল বিস্তার করে আছে।

সারনী-৭

দেয়ালের অবস্থার ভিত্তিতে জরিপকৃত কারখানাসমূহের বন্টন–

দেয়ালের অবস্থা	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ভাল	৪	২০
তেমন ভাল নয়	৮	৪০
খুব খারাপ	৮	৪০
মোট	২০	১০০

সারনী-৭ এ দেখা যাচ্ছে, শতকরা ২০% প্রতিষ্ঠানে দেয়াল ভাল। শতকরা ৪০% প্রতিষ্ঠানের দেয়ালের অবস্থা খুব খারাপ।[১৮]

আলোর ব্যবস্থা ঃ কারখানা বিধিমালা মোতাবেক যেখানে কর্মচারীরা নিয়মিতভাবে কর্মে নিযুক্ত আছে কারখানার এরূপ অভ্যন্তরভাগ এবং অন্যান্য অংশ প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত পন্থায় আলোকিতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। কারখানা আইনে বলা হয়েছে যে, কারখানার যে সকল অংশে শ্রমিকগণ কাজ করে বা চলাচল করে, সেই সকল অংশে প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম বা উভয় প্রকারের পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত আলোর ব্যবস্থা থাকতে হবে।[১৯] আলো প্রবেশের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

জানালায় কাঁচসমূহ ভিতর ও বাইরের দিক দিয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে।[২০] আলো যাতে চোখে না পড়ে বা আলোর কারণে চোখের উপর এরূপ চাপ না পড়ে যাতে দুর্ঘটনা না ঘটতে পারে সেরূপ ব্যবস্থা করতে হবে।[২১] আইনে আরও বলা হয়েছে, সরকার আলোর মান ঠিক করে দিতে পারেন।[২২]

ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ জরিপ করে জানা গিয়েছে যে, অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানেই শুধুমাত্র কাজ করার স্থান আলোকিতকরণ করা হয়। মুষ্টিমেয় কিছু প্রতিষ্ঠানের সকল স্থানেই আলোকিতকরণ করা হয় না।

সারনী-৮

আলোকিতকরণের ভিত্তিতে জরিপকৃত কারখানাসমূহের বন্টন–

আলোকিতকরণের স্থান	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
শুধুমাত্র কাজ করার স্থান আলোকিতকরণ করা হয়	১৪	৭০
প্রতিষ্ঠানের সকল স্থানেই আলোকিতকরণ করা হয়	৬	৩০
মোট	২০	১০০

সারনী-৮ এ দেখা যাচ্ছে যে, ৭০% প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র কাজ করার স্থানেই আলোকিতকরণ করা হয়। অন্যদিকে মাত্র ৩০% প্রতিষ্ঠানের সকল স্থানে আলোকিতকরণ করা হয়।[২৩]

উত্তরদাতাগণের নিকট প্রশ্ন ছিল, আলো চোখে পড়ার কারণে কি প্রতিক্রিয়া হয়? এ প্রশ্নের জবাবে অধিকাংশ উত্তরদাতা বলেছেন যে, টিউবলাইট থাকায় তাদের চোখের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু খাদ্য শিল্প ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের কিছু কিছু উত্তরদাতা বলেছেন, কম ওয়াটের বাল্বের আলোতে অস্পষ্ট দেখতে পাওয়ার কারণে কাজের অসুবিধা হয়। পরিদর্শনে দেখা গিয়েছে যে, অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ঢাকনাযুক্ত বাল্বের ব্যবস্থা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-৯

আলো চোখে পড়ার প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে

জরিপকৃত কারখানাসমূহের বন্টন–

আলো চোখে পড়ার প্রতিক্রিয়া	ক্ষুদ্রশিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
কোন অসুবিধা হয় না	১২	৬০
চোখে অস্পষ্ট মনে হয়	৮	৪০
মোট	২০	১০০

সারনী-৯ এ দেখা যাচ্ছে যে, ৬০% প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের আলো চোখে পড়ার কারণে কোন অসুবিধা হয় না। অন্যদিকে ৪০% প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের আলো চোখে পড়ার কারণে চোখে অস্পষ্ট মনে হয়।[২৪]

সারনী-১০

প্রাকৃতিক আলোর ব্যবস্থার ভিত্তিতে জরিপকৃত কারখানাসমূহের বন্টন–

প্রাকৃতিক আলোর ব্যবস্থা	ক্ষুদ্রশিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ভাল	৪	২০
মোটামুটি ভাল	৬	৩০
খুব খারাপ	১০	৫০
মোট	২০	১০০

সারনী-১০ এ দেখা যাচ্ছে যে, ২০% প্রতিষ্ঠানের প্রাকৃতিক আলোর ব্যবস্থা ভাল। ৩০% প্রতিষ্ঠানের প্রাকৃতিক আলোর ব্যবস্থা মোটামুটি ভাল। অন্যদিকে ৫০% প্রতিষ্ঠানের প্রাকৃতিক আলোর ব্যবস্থা খুব খারাপ। অনেক প্রতিষ্ঠান এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে সেখানে বাইরে থেকে আলো প্রবেশের কোন ব্যবস্থা নেই।২৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠানসমূহের অপ্রাকৃতিক আলোর ব্যবস্থাও সন্তোষজনক নয়। ক্ষুদ্র শিল্পসমূহে পর্যাপ্ত পরিমানে মানসম্মত টিউবলাইট ও বাল্বের ব্যবস্থা নেই।

সারনী-১১

অপ্রাকৃতিক আলোর ব্যবস্থার ভিত্তিতে জরিপকৃত কারখানাসমূহের বন্টন–

অপ্রাকৃতিক আলোর ব্যবস্থা	ক্ষুদ্রশিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ভাল	৫	২৫
মোটামুটি ভাল	৮	৪০
খুব খারাপ	৭	৩৫
মোট	২০	১০০

সারনী-১১তে দেখা যাচ্ছে, ২৫% প্রতিষ্ঠানের অপ্রাকৃতিক আলোর ব্যবস্থা ভাল। ৪০% প্রতিষ্ঠানের আলোর ব্যবস্থা মোটামুটি ভাল। কিন্তু ৩৫% প্রতিষ্ঠানের অপ্রাকৃতিক আলোর ব্যবস্থা খুব খারাপ।[২৬]

খাবার পানি ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক কারখানায় নিযুক্ত সকল শ্রমিকের জন্য সুবিধাজনক স্থানে খাবার পানির পর্যাপ্ত সরবরাহের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।[২৭] সে সকল স্থানে পানি রাখা হবে সে সকল স্থানে অধিকাংশ শ্রমিকের বোধগম্য ভাষায় খাবার পানি কথাটি লিখে রাখতে হবে।[২৮] কারখানা বিধিমালায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক কারখানায় সহজে পাওয়া যায় এরূপ স্থানে কর্মচারীদের জন্য বিশুদ্ধ 'খাবার পানি' রাখতে হবে। প্রতিদিন যত সংখ্যক শ্রমিক থাকবে কমপক্ষে তত গ্যালন পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এতে আরও বলা হয়েছে যে, সরবরাহকৃত খাবার পানি উপযুক্ত পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে এবং এতে প্রতিদিন নতুন করে পানি ভরতে হবে। উক্ত খাবার পানি যাতে দূষিত হতে না পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ সরাসরি ওয়াসা থেকে প্রাপ্ত পানি ব্যবহার করে থাকে। প্রতিষ্ঠানসমূহে পানি বিশুদ্ধ করার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-১২

বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থার ভিত্তিতে জরিপকৃত কারখানাসমূহের বন্টন–

বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা	ক্ষুদ্রশিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা আছে	২	১০
বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা নেই	১৮	৯০
মোট	২০	১০০

সারনী-১২ তে দেখা যাচ্ছে, মাত্র ১০% প্রতিষ্ঠানে বিশুদ্ধ বা ফুটানো পানির ব্যবস্থা আছে। অন্যদিকে, ৯০% প্রতিষ্ঠানেই বিশুদ্ধ পানির কোন ব্যবস্থা নেই। প্রতিষ্ঠানসমূহে পানি সরবরাহের বিজ্ঞানসম্মত কোন ব্যবস্থা নেই।২৯

সারনী-১৩

সরবরাহকৃত পানির পরিমানের ভিত্তিতে জরিপকৃত কারখানাসমূহের বন্টন–

সরবরাহকৃত পানির পরিমান	ক্ষুদ্রশিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
৫০ লিটারের উপরে	৫	২৫
৫০ লিটারের নিচে	৩	১৫
যা প্রয়োজন ট্যাপ/ টিউবওয়েল থেকে নেয়া হয়	১২	৬০
মোট	২০	১০০

সারনী-১৩ তে দেখা যাচ্ছে, ২৫% প্রতিষ্ঠানে ৫০ লিটারের উপরে পানি সরবরাহ করা হয়। ১৫% প্রতিষ্ঠানে ৫০ লিটারের নিচে পানি সরবরাহ করা হয়। অন্যদিকে ৬০% প্রতিষ্ঠানেই যখন যা প্রয়োজন ট্যাপ/টিউবওয়েল থেকে নেয়া হয়। অর্থাৎ বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানের পর্যাপ্ত ও পরিকল্পিত পানি সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নেই।

প্রতিষ্ঠানসমূহে পানি ভরার জন্য জগ, গ্যালন, মটকা, বোতল, বালতি ইত্যাদি রয়েছে। যখন পানি শেষ হয়ে যায় তখন আবার নতুন করে পানি ভরা হয়। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে যখন ওয়াসার পানি আসে, তখন সমস্ত পাত্রে পানি ভরা হয়। বেশির ভাগ ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানেই

Dhaka University Institutional Repository

গরমকালে পানি ঠাণ্ডা রাখার কোন ব্যবস্থা নেই। মুষ্টিমেয় কিছু প্রতিষ্ঠানে ফ্রিজের ব্যবস্থা আছে।

সারনী-১৪

পানি ঠান্ডা রাখার ব্যবস্থার ভিত্তিতে জরিপকৃত কারখানাসমূহের বন্টন–

পানি ঠান্ডা রাখার ব্যবস্থা	ক্ষুদ্রশিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
পানি ঠান্ডা রাখার ব্যবস্থা আছে	২	১০
পানি ঠান্ডা রাখার ব্যবস্থা নেই	১৮	৯০
মোট	২০	১০০

সারনী-১৪তে দেখা যাচ্ছে, ১০% প্রতিষ্ঠানে পানি ঠান্ডা রাখার ব্যবস্থা আছে। অন্যদিকে ৯০% প্রতিষ্ঠানেই পানি ঠান্ডা রাখার ব্যবস্থা নেই। কোন প্রতিষ্ঠানে পানি ঠান্ডা রাখার জন্য কোন যন্ত্রের ব্যবস্থা নেই।[৩০]

বায়ু চলাচল ও তাপমাত্রা ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে যে, প্রতিটি কারখানা ঘরে যথেষ্ট নির্মল বায়ুচলাচলের কার্যকর ও উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানি না ঘটে এবং তারা আরামবোধ করে এমন তাপমাত্রা কারখানায় রাখতে হবে।[৩১]

ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক বাতাসের অবস্থা ভাল নয়। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই জানালা নেই। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে জানালা থাকলেও অপরিকল্পিতভাবে তৈরি করার ফলে সেগুলো দিয়ে তেমন একটা বাতাস প্রবেশ করে না। অনেক প্রতিষ্ঠানেই বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা নেই।

সারনী-১৫

প্রাকৃতিক বাতাসের অবস্থার ভিত্তিতে জরিপকৃত কারখানা সমূহের বন্টন–

প্রাকৃতিক বাতাসের অবস্থা	ক্ষুদ্রশিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ভাল	২	১০
মোটামুটি ভাল	৪	২০
খুব খারাপ	১৪	৭০
মোট	২০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-১৬

অপ্রাকৃতিক বাতাসের অবস্থার ভিত্তিতে জরিপকৃত কারখানা সমূহের বন্টন–

অপ্রাকৃতিক বাতাসের অবস্থা	ক্ষুদ্রশিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ভাল	৫	২৫
মোটামুটি ভাল	৬	৩০
খুব খারাপ	৯	৪৫
মোট	২০	১০০

সারনী-১৫তে দেখা যাচ্ছে, ১০% প্রতিষ্ঠানের প্রাকৃতিক বাতাসের অবস্থা ভাল। ২০% প্রতিষ্ঠানের প্রাকৃতিক বাতাসের অবস্থা মোটামুটি ভাল। কিন্তু ৭০% প্রতিষ্ঠানের প্রাকৃতিক বাতাসের অবস্থা খুব খারাপ। অন্যদিকে সারনী-১৬তে দেখা যাচ্ছে যে, ২৫% প্রতিষ্ঠানের অপ্রাকৃতিক বাতাসের অবস্থা ভাল। ৩০% প্রতিষ্ঠানের অপ্রাকৃতিক বাতাসের অবস্থা মোটামুটি ভাল। কিন্তু ৪৫% প্রতিষ্ঠানের অপ্রাকৃতিক বাতাসের অবস্থা খুব খারাপ। অর্থাৎ ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক বাতাসের সুবন্দোবস্ত নেই।[৩২]

পায়খানা ও প্রস্রাবখানা ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে যে,

ক) প্রতিটি কারখানায় শ্রমিকরা কাজ করাকালীন সময়ে সার্বক্ষণিকভাবে যাতে ব্যবহার করতে পারে এমন সুবিধাজনক স্থানে নির্ধারিত প্রকারের যথেষ্ট সংখ্যক পায়খানা ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

খ) পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের জন্য বেড়া বিশিষ্ট পৃথক পায়খানা ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

গ) উপরোক্ত পায়খানা ও প্রস্রাবখানাসমূহে পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ঘ) এরূপ প্রতিটি পায়খানা ও প্রস্রাবখানা উপযুক্ত জীবানুনাশক ঔষধের সাহায্যে সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখতে হবে।[৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

জরিপকালে দেখা গিয়েছে যে, কিছু কিছু ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানে পায়খানা থাকলেও প্রস্রাবখানা নেই বললেই চলে। কতিপয় প্রতিষ্ঠানে ড্রেনের সাথে ইট বিছিয়ে পায়খানা ও প্রস্রাবখানার কাজ সারা হয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পায়খানাগুরোতে চুনকাম ও রং করা হয় না। পায়খানাগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয় না। বেশির ভাগ পায়খানা নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত। কোন প্রতিষ্ঠানেই মহিলাদের জন্য আলাদা পায়খানা ও প্রস্রাবখানা ব্যবস্থা নেই।[৩৪]

সারনী-১৭

পায়খানার সংখ্যার ভিত্তিতে জরিপকৃত কারখানাসমূহের বন্টন–

ক্ষুদ্র শিল্পের বর্ণনা	পায়খানার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
বস্ত্র	৪	২০
ইঞ্জিনিয়ারিং	৫	২৫
খাদ্য	১১	৫৫
মোট	২০	১০০

সারনী-১৭তে দেখা যাচ্ছে যে, বস্ত্র শিল্পে পায়খানার সংখ্যা শতকরা ২০%। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে পায়খানার সংখ্যা শতকরা ২৫% এবং খাদ্য শিল্পে পায়খানার সংখ্যা শতকরা ৫৫%।[৩৫]

সারনী-১৮

প্রস্রাবখানার সংখ্যার ভিত্তিতে জরিপকৃত কারখানা সমূহের বন্টন–

ক্ষুদ্র শিল্পের বর্ণনা	প্রস্রাবখানার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
বস্ত্র	২	৬৭
ইঞ্জিনিয়ারিং	১	৩৩
খাদ্য	-	-
মোট	৩	১০০

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-১৮তে দেখা যাচ্ছে, বস্ত্র শিল্পে প্রস্রাবখানা রয়েছে শতকরা ৬৭%। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে প্রস্রাবখানা রয়েছে শতকরা ৩৩% এবং খাদ্য শিল্পে কোন প্রস্রাবখানা নেই।[৩৬]

সারনী-১৯

জরিপকৃত ক্ষুদ্রশিল্পের সংখ্যার ভিত্তিতে পায়খানার বন্টন–

ক্ষুদ্রশিল্প / পায়খানা আছে/নাই	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা				শতকরা হার (%)			
	বস্ত্র	ইঞ্জিনিয়ারিং	খাদ্য	মোট	বস্ত্র	ইঞ্জিনিয়ারিং	খাদ্য	মোট
আছে	৩	৫	৬	১৪	১৫	২৫	৩০	৭০
নাই	৪	১	১	৬	২০	৫	৫	৩০
মোট	৭	৬	৭	২০	৩৫	৩০	৩৫	১০০

সারনী-১৯ এ দেখা যাচ্ছে, ১৫% বস্ত্র শিল্পে, ২৫% ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে এবং ৩০% খাদ্য শিল্পে পায়খানা আছে। অর্থাৎ শতকরা ৭০% ক্ষুদ্রশিল্পে পায়খানা আছে। অন্যদিকে ২০% বস্ত্র শিল্পে, ৫% ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে এবং ৫% খাদ্য শিল্পে কোন পায়খানা নেই। অর্থাৎ ৩০% ক্ষুদ্রশিল্পে কোন পায়খানা নেই।[৩৭]

সারনী-২০

জরিপকৃত ক্ষুদ্রশিল্পের সংখ্যার ভিত্তিতে প্রস্রাবখানার বন্টন–

ক্ষুদ্রশিল্প / পায়খানা আছে/নাই	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা				শতকরা হার (%)			
	বস্ত্র	ইঞ্জিনিয়ারিং	খাদ্য	মোট	বস্ত্র	ইঞ্জিনিয়ারিং	খাদ্য	মোট
আছে	২	১	-	৩	১০	৫	-	১৫
নাই	৫	৫	৭	১৭	২৫	২৫	৩৫	৮৫
মোট	৭	৬	৭	২০	৩৫	৩০	৩৫	১০০

সারনী-২০ এ দেখা যাচ্ছে, ১০% বস্ত্র শিল্পে এবং ৫% ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে প্রস্রাবখানা আছে। অর্থাৎ মাত্র ১৫% ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রস্রাবখানা আছে। অন্যদিকে ২৫% বস্ত্র শিল্পে, ২৫% ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে এবং ৩৫% খাদ্য শিল্পে কোন প্রস্রাবখানা নেই। অর্থাৎ ৮৫% ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানেই প্রস্রাবখানা নেই।[৩৮]

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-২১

পায়খানার অবস্থার ভিত্তিতে জরিপকৃত কারখানাসমূহের বন্টন–

পায়খানার অবস্থা	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
মোটামুটি ভাল	৭	৩৫
নোংরা	৭	৩৫
পায়খানা নেই	৬	৩০
মোট	২০	১০০

সারনী-২১ এ দেখা যাচ্ছে, ৩৫% প্রতিষ্ঠানের পায়খানার অবস্থা মোটামুটি ভাল। ৩৫% প্রতিষ্ঠানের পায়খানা নোংরা। ৩০% প্রতিষ্ঠানে কোন পায়খানা নেই। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানের পায়খানা ও প্রস্রাবখানায় রং করা হয় না। কোন কোন প্রতিষ্ঠানের দেয়ালে রং ও চুনকাম করার সময় একই সাথে পায়খানায়ও রং এবং চুনকাম করা হয়। অনেক প্রতিষ্ঠানেই পায়খানায় রং ও চুনকাম করার মত পরিবেশ নেই।[৩৯]

সারনী-২২

পায়খানা পরিষ্কার করার প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে জরিপকৃত কারখানাসমূহের বন্টন–

পায়খানা পরিষ্কার করার প্রক্রিয়া	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ব্লিচিং পাউডার দিয়ে পরিষ্কার করা হয়	৮	৪০
বালু ও সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা হয়	১	৫
হারপিক দিয়ে পরিষ্কার করা হয়	২	১০
পরিষ্কার করা হয়	৩	১৫
পায়খানা নেই	৬	৩০
মোট	২০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-২২ এ দেখা যাচ্ছে, ৪০% ক্ষুদ্রশিল্পে ব্লিচিং পাউডার দিয়ে পায়খানা পরিষ্কার করা হয়। ৫% প্রতিষ্ঠানে বালু ও সাবান দিয়ে পায়খানা পরিষ্কার করা হয়। ১০% প্রতিষ্ঠানে হারপিক দিয়ে পায়খানা পরিষ্কার করা হয়। ১৫% প্রতিষ্ঠানে পায়খানা পরিষ্কার করা হয় না। ৩০% প্রতিষ্ঠানে কোন পায়খানা নেই।[৪০]

পিকদানি ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে, প্রতিটি কারখানায় সুবিধাজনক স্থানে যথেষ্ট সংখ্যক পিকদানি রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং ঐ সকল পিকদানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্য সম্মতভাবে রাখতে হবে।[৪১] কারখানা প্রাঙ্গনে কোন ব্যক্তি পিকদানি ছাড়া অন্য কোথাও থুথু ফেলতে পারবে না।[৪২]

ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে থুথু ফেলার জন্য কোন পিকদানির ব্যবস্থা নেই। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানেই শ্রমিক-কর্মীরা যখন যেখানে খুশি থুথু ফেলে থাকে। ফলে প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়েছে।

সারণী-২৩

থুথু ফেলার ব্যবস্থার ভিত্তিতে জরিপকৃত কারখানাসমূহের বন্টন-

থুথু ফেলার ব্যবস্থা	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
টিনে ফেলা হয়	১	৫
বাইরে ফেলা হয়	১১	৫৫
ভিতরে ও বাইরে যেখানে সেখানে ফেলা হয়	৮	৪০
মোট	২০	১০০

সারনী-২৩ এ দেখা যাচ্ছে, ৫% ক্ষুদ্রশিল্পের শ্রমিকগণ টিনে থুথু ফেলে থাকে। ৫৫% প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণ বাইরে থুথু ফেলে থাকে। ৪০%প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণ প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ও বাইরে যেখানে সেখানে থুথু ফেলে থাকে।[৪৩]

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-২২ এ দেখা যাচ্ছে, ৪০% ক্ষুদ্রশিল্পে ব্লিচিং পাউডার দিয়ে পায়খানা পরিষ্কার করা হয়। ৫% প্রতিষ্ঠানে বালু ও সাবান দিয়ে পায়খানা পরিষ্কার করা হয়। ১০% প্রতিষ্ঠানে হারপিক দিয়ে পায়খানা পরিস্কার করা হয়। ১৫% প্রতিষ্ঠানে পায়খানা পরিষ্কার করা হয় না। ৩০% প্রতিষ্ঠানে কোন পায়খানা নেই।[৪০]

পিকদানি ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে, প্রতিটি কারখানায় সুবিধাজনক স্থানে যথেষ্ট সংখ্যক পিকদানি রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং ঐ সকল পিকদানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্য সম্মতভাবে রাখতে হবে।[৪১] কারখানা প্রাঙ্গনে কোন ব্যক্তি পিকদানি ছাড়া অন্য কোথাও থুথু ফেলতে পারবে না।[৪২]

ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে থুথু ফেলার জন্য কোন পিকদানির ব্যবস্থা নেই। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানেই শ্রমিক-কর্মীরা যখন যেখানে খুশি থুথু ফেলে থাকে। ফলে প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়েছে।

সারণী-২৩

থুথু ফেলার ব্যবস্থার ভিত্তিতে জরিপকৃত কারখানাসমূহের বন্টন-

থুথু ফেলার ব্যবস্থা	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
টিনে ফেলা হয়	১	৫
বাইরে ফেলা হয়	১১	৫৫
ভিতরে ও বাইরে যেখানে সেখানে ফেলা হয়	৮	৪০
মোট	২০	১০০

সারনী-২৩ এ দেখা যাচ্ছে, ৫% ক্ষুদ্রশিল্পের শ্রমিকগণ টিনে থুথু ফেলে থাকে। ৫৫% প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণ বাইরে থুথু ফেলে থাকে। ৪০%প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণ প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ও বাইরে যেখানে সেখানে থুথু ফেলে থাকে।[৪৩]

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩ নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থা

আগুনের ক্ষেত্রে সাবধানতা ঃ কারখানা আইনে শ্রমিকের নিরাপত্তা সম্পর্কে বিভিন্ন বিধান রয়েছে। যেমন– কারখানায় আগুন লাগলে শ্রমিকগণ যাতে সহজেই কারখানার বাইরে আসতে পারে তার জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকতে হবে। অধিকসংখ্যক শ্রমিকের বোধগম্য ভাষায় বড় বড় লাল হরফে বা অন্য কোন কার্যকরী উপায়ে বা প্রতীকের সাহায্যে কারখানা ঘরের প্রতিটি জানালা, দরজা বা অন্য কোন গমনপথে নির্দেশনামা থাকতে হবে, যাতে আগুন লাগলে নিরাপদে বাইরে আসা যায়। কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকগণ কারখানায় আগুন লাগলে যাতে বুঝতে পারে সেজন্য শ্রবণযোগ্য সাবধানতা সঙ্কেতের ব্যবস্থা প্রতিটি কারখানায় থাকতে হবে। আগুন লাগলে শ্রমিকগণ যাতে পালাতে পারে সেজন্য শ্রমিকদের আত্মরক্ষার নিয়মকানুন এবং প্রয়োজনে এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।[৪৪] কারখানা বিধিমালায় প্রয়োজনীয় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি ও পর্যাপ্ত পানি সরবরাহের কথা বলা হয়েছে।

বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ জরিপ করে দেখা দিয়েছে যে, প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা একেবারেই দুর্বল। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শ্রমিক-কর্মীগণ প্রতিষ্ঠানসমূহে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানসমূহে আগুন লাগলে তাদের শোনার মত কোন এ্যালার্ম, ঘন্টাধ্বনি ইত্যাদির কোন ব্যবস্থা নেই। ২০টি ক্ষুদ্রশিল্প জরিপ করে মাত্র ২টি প্রতিষ্ঠানে ২টি গ্যাস সিলিন্ডার বা ফার্নেসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহে অগ্নিনির্বাপক কোন যন্ত্রপাতি নেই। প্রতিষ্ঠানসমূহে আগুন লাগলে প্রতিষ্ঠান থেকে বের হওয়ার জন্য কোন অতিরিক্ত বর্হিগমন পথ নেই। আগুন লাগলে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান ব্যবহারের জন্য হাউজে রক্ষিত পানি আছে বলে জানিয়েছে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে পানি সংরক্ষণের সুনির্দিষ্ট কোন ব্যবস্থা নেই।[৪৫]

সারনী-২৪

অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে

জরিপকৃত কারখানাসমূহের বন্টন–

অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত তথ্য	ক্ষুদ্রশিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি আছে	২	১০
অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি নেই	১৮	৯০
মোট	২০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-২৪ এ দেখা যাচ্ছে যে, মাত্র ১০% প্রতিষ্ঠানে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি আছে। অন্যদিকে ৯০% প্রতিষ্ঠানে কোন অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি নেই।[৪৬]

যন্ত্রপাতি ঘেরিয়ে রাখা বা বেড়া দেওয়া ঃ কারখানা আইনে প্রতিটি কারখানায় শ্রমিকদের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসাবে যন্ত্রপাতিসমূহ যথোপযুক্ত উপায়ে ঘেরিয়ে রাখার কথা বলা হয়েছে।[৪৭] কিন্তু জরিপে দেখা গিয়েছে যে, সকল প্রতিষ্ঠানেই সম্ভাব্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে যন্ত্রপাতির বিভিন্ন অংশসমূহ যথোপযুক্ত উপায়ে ঘেরিয়ে রাখা হয় না।[৪৮]

চলমান যন্ত্রে বা যন্ত্রের নিকটে কাজ করা ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে, যন্ত্রপাতি চলমান অবস্থায় পরীক্ষা করার প্রয়োজন হলে অথবা পরীক্ষার প্রেক্ষিতে চলমান অবস্থায় পরিষ্কার করা, তৈল দেওয়া, কোন অংশ মেরামত করা বা বেল্ট লাগানোর প্রয়োজন হলে কেবলমাত্র আটসাট পোষাক পরিহিত বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুরুষ শ্রমিক দ্বারাই তা করতে হবে। কোন মহিলা বা শিশুকে এসকল কাজে নিয়োজিত করা যাবে না।[৪৯]

সারনী-২৫

চলমান যন্ত্রের নিকটে কাজ করা শ্রমিকদের

তথ্যের ভিত্তিতে কারখানাসমূহের বন্টন–

চলমান যন্ত্রের নিকটে কাজ করা শ্রমিকদের তথ্য	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ, কিশোর ও শিশু শ্রমিক কাজ করে	২	১০
প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও কিশোর শ্রমিক কাজ করে	৭	৩৫
শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শ্রমিক কাজ করে	১১	৫৫
মোট	২০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-২৫ এ দেখা যাচ্ছে, শতকরা ১০% ক্ষুদ্রশিল্পে চলমান যন্ত্রের নিকটে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ, কিশোর ও শিশু শ্রমিক কাজ করে থাকে। শতকরা ৩৫% ক্ষুদ্র শিল্পে চলমান যন্ত্রের নিকটে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও কিশোর শ্রমিক কাজ করে থাকে। শতকরা ৫৫% ক্ষুদ্রশিল্পে চলমান যন্ত্রের নিকটে শুধুমাত্র পুরুষ শ্রমিক কাজ করে থাকে।[৫০]

বিপদজনক যন্ত্রে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের নিয়োগ ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে, কোন যন্ত্র হতে উদ্ভুত বিপদ ও বিপদ হতে রক্ষা পাওয়ার উপায় সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত না করা পর্যন্ত এবং উক্ত কাজের জন্য কারো তত্ত্বাবধানে কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিকে বিপদজনক যন্ত্রে কাজের জন্য নিয়োজিত করা যাবে না।[৫১]

সারনী-২৬

বিপদজনক যন্ত্রে কাজ করা শ্রমিকদের তথ্যের ভিত্তিতে

জরিপকৃত কারখানাসমূহের বন্টন–

বিপদজনক যন্ত্রে কাজ করা শ্রমিকদের তথ্য	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও কিশোর শ্রমিক কাজ করে	৩	১৫
শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক কাজ কওে	১১	৫৫
বিপদজনক যন্ত্র নেই	৬	৩০
মোট	২০	১০০

ক্ষুদ্র শিল্পসমূহ জরিপ করে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, বিপদজনক যন্ত্রে বেশির ভাগ প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ শ্রমিকেরাই কাজ করে থাকে। সারণী-২৬ এ দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ১৫% ক্ষুদ্র শিল্পে বিপদজনক যন্ত্রে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও কিশোর শ্রমিক কাজ করে। শতকরা ৫৫% ক্ষুদ্র শিল্পে বিপদজনক যন্ত্রে শুধু মাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শ্রমিক কাজ করে। অন্যদিকে শতকরা ৩০% ক্ষুদ্রশিল্পে বিপদজনক যন্ত্র নেই।[৫২]

Dhaka University Institutional Repository

খুচরা যন্ত্রাংশ সংরক্ষণ ঃ খুচরা যন্ত্রাংশ যথাযথভাবে নির্দিষ্ট স্থানে রাখা ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানের অন্যতম দায়িত্ব। কারখানা আইনে বলা হয়েছে, নতুন যন্ত্রপাতি যেমন– প্রতিটি সংযোজিত স্ক্রু, বেল্ট বা চাবি অথবা ঘূর্ণায়মান যন্ত্রাংশ, চাকা বা পিনিয়ন ইত্যাদি খুচরা যন্ত্রপাতিসমূহ এমনভাবে প্রোথিত বা বাক্সে আবদ্ধ করে রাখতে হবে যাতে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে না পারে।[৫৩]

সারনী-২৭

খুচরা যন্ত্রাংশ সংরক্ষণের ভিত্তিতে জরিপকৃত কারখানাসমূহের বন্টন–

খুচরা যন্ত্রাংশ রাখার স্থান	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
বাক্সের ভিতরে রাখা হয়	১৩	৬৫
দেয়ালেব তাকে রাখা হয়	২	১০
আলমারীতে রাখা হয়	১	৫
মেশিনের আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়	৪	২০
মোট	২০	১০০

সারনী-২৭ এ দেখা যাচ্ছে যে, ৬৫% প্রতিষ্ঠানে খুচরা যন্ত্রাংশ বাক্সের ভিতর সংরক্ষণ করা হয়। ১০% প্রতিষ্ঠানে খুচরা যন্ত্রাংশ দেয়ালের তাকে রাখা হয়। ৫% প্রতিষ্ঠানে খুচরা যন্ত্রাংশ আলমারিতে রাখা হয়। ২০% প্রতিষ্ঠানে খুচরা যন্ত্রাংশ মেশিনের আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়।

বস্ত্র শিল্পে খুচরা যন্ত্রপাতি রাখার জন্য বাক্স আছে। খাদ্য শিল্পের খুচরা যন্ত্রপাতি রাখার জন্য বাক্স আছে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পসমূহের যন্ত্রপাতি দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়।[৫৪]

অতিরিক্ত ভার ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে যে, কারখানার কোন ব্যক্তিকে এমন কোন ভার উত্তোলন, বহন বা সরানোর কাজে নিযুক্ত করা যাবে না যাতে আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকে।[৫৫] কারখানা বিধিমালায় বলা হয়েছে, প্রাপ্ত বয়স্ক-পুরুষ শ্রমিক ভারবহন করবে সর্বোচ্চ ৬৮ পাউন্ড এবং কিশোর শ্রমিক বহন করবে ৫০ পাউন্ড।[৫৬] জরিপে দেখা যায়-খাদ্যশিল্পে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ শ্রমিক সর্বোচ্চ ৮০ পাউন্ড পর্যন্ত ভারবহন করে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক ঠেলাগাড়ীর সাহায্যে ১,০০০ পাউন্ড পর্যন্ত ভার বহন করে থাকে। অন্যদিকে কিশোর শ্রমিক ভার বহন করে সর্বোচ্চ ২০০ পাউন্ড।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-২৮

ভারবহনের কাজ সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে

জরিপকৃত কারখানা সমূহের বন্টন–

ভারবহনের কাজ সংক্রান্ত তথ্য	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ভারবহনের কাজ হয়	৭	৩৫
ভার বহনের কাজ হয় না	১৩	৬৫
মোট	২০	১০০

সারনী-২৮ এ দেখা যাচ্ছে যে, ৩৫% প্রতিষ্ঠানে ভারবহনের কাজ হয়। অন্যদিকে ৬৫% প্রতিষ্ঠানে ভারবহনের কাজ হয় না।[৫৭]

ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে বিপদজনক স্থান সত্যিকার অর্থে নেই। তবে বিপদজনক যন্ত্রপাতিতে কাজ করার জন্য প্রবেশের প্রয়োজন হলে স্বাভাবিকভাবে প্রবেশ করা হয়। এক্ষেত্রে তাদের জন্য আলাদা ড্রেস বা প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই।[৫৮]

৪.৪ শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কিত ব্যবস্থা

ধৌতকরণের সুযোগ-সুবিধা ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে, কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের ধোয়া ও গোসলের জন্য প্রতিটি কারখানায় পানির পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাছাড়া নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য পৃথক ও পর্দাবিশিষ্ট গোসলখানার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং ঐ সকল গোসলখানা পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন ও সহজগম্য হতে হবে। প্রতি ২০ জন শ্রমিকের জন্য একটি করে ট্যাপ থাকতে হবে।[৫৯]

ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করে দেখা গিয়েছে যে, প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য সন্তোষজনক কোন ব্যবস্থা নেই। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে পায়খানায় গোসল করা হয়। আবার কোন কোন প্রতিষ্ঠানে তাও নেই। অনেক প্রতিষ্ঠানে বাইরে গোসল করা হয়। কোন কোন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণ নিজ নিজ বাসা থেকে গোসল করে আসে।[৬০]

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-২৯

ধোয়া ও গোসলের ব্যবস্থার ভিত্তিতে জরিপকৃত কারখানাসমূহের বন্টন–

ধোয়া ও গোসলের ব্যবস্থা	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ধোয়া ও গোসলের ব্যবস্থা আছে	৬	৩০
ধোয়া ও গোসলের কোন ব্যবস্থা নেই	১৪	৭০
মোট	২০	১০০

সারণী-২৯ এ দেখা যাচ্ছে যে, ৩০% প্রতিষ্ঠানে ধোয়া ও গোসলের ব্যবস্থা আছে। ৭০% প্রতিষ্ঠানে ধোয়া ও গোসলের কোন ব্যবস্থা নেই। যে সকল প্রতিষ্ঠানে টিউবওয়েল রয়েছে সেখানে বাথরুমে কোন পানির ট্যাপ নেই। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে যেখানে বাথরুম রয়েছে সেখানে কোনটিতে ২টি ও কোনটিতে ১টি করে পানির ট্যাপ রয়েছে। কোন প্রতিষ্ঠানেই মহিলাদের জন্য আলাদাভাবে ধোয়া ও গোসলের ব্যবস্থা নেই।[৬১]

আশ্রয় বা বিশ্রাম, বাসস্থান ইত্যাদি ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে, যে কারখানায় সাধারণত ১০০ জনের অধিক শ্রমিক কর্মরত আছে সেখানে তাদের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত আশ্রয় বা বিশ্রামের ঘর এবং খাবার পানির ব্যবস্থাসহ একটি খাবার ঘরের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ সকল আশ্রয় বা বিশ্রামঘরের জন্য যথেষ্ট আলো ও বাতাস চলাচলের বন্দোবস্ত রাখতে হবে এবং ঘরটি যাতে ঠাণ্ডা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।[৬২] জরিপে দেখা যায়–কোন ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানেই শ্রমিকদের জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা নেই। তবে মুষ্টিমের কিছু প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-৩০

বাসস্থানের ব্যবস্থার ভিত্তিতে জরিপকৃত কারখানাসমূহের বন্টন–

বাসস্থানের ব্যবস্থা	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে	৪	২০
বাসস্থানের ব্যবস্থা নেই	১৬	৮০
মোট	২০	১০০

সারনী-৩০ এ দেখা যাচ্ছে যে, মাত্র ২০% প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। অন্যদিকে ৮০% প্রতিষ্ঠানেই শ্রমিকদের জন্য কোন বাসস্থানের ব্যবস্থা নেই। পরিদর্শনে দেখা যায় যে ৩টি খাদ্যশিল্পে এবং ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে শ্রমিকদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। খাদ্য শিল্পের বাসস্থানসমূহে মোটামুটি ভাল কার্যপরিবেশ বিরাজ করছে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বাসস্থানে খুব খারাপ পরিবেশ বিরাজ করছে। খাদ্যশিল্পের বাসস্থানসমূহে যথেষ্ট প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক আলোর ব্যবস্থা রয়েছে। পুরোনো ঢাকার একটি এলুমিনিয়াম ইন্ডাষ্ট্রিতে শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান থাকলেও সেটি খুবই নোংরা। প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক আলো এবং বাতাসের সন্তোষজনক কোন ব্যবস্থা সেখানে নেই। শ্রমিকদের জন্য মাটির তৈরি একটি রান্নাঘর রয়েছে, যেখানে মাটির তৈরি চুল্লীতে রান্নাবান্না হয়ে থাকে। সেখানে কোন গ্যাসের ব্যবস্থা নেই।[৬৩]

চিত্ত বিনোদন ঃ চিত্ত বিনোদন শ্রমিকদের জন্য একটি অপরিহার্য বিষয়। ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করে দেখা দিয়েছে যে, প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানেই এ সংক্রান্ত কোন ব্যবস্থা নেই। হাজারীবাগ এলাকার ১টি বেকারী প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা হিসেবে একটি টিভি ও একটি দাবা খেলার সরঞ্জাম দেখা গিয়েছে। বস্ত্র শিল্পের (তাঁত) শ্রমিকগণ জানিয়েছে, তারা নিজ খরচে টুইনওয়ান এনে মাঝে মাঝে গান শোনে। এতে সঙ্গীতের তালে তালে তারা কাজে আনন্দ পায় বলে তারা জানিয়েছে।[৬৪]

প্রাথমিক চিকিৎসার উপকরণসমূহ ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে, প্রত্যেক কারখানায় কর্মরত প্রতি ১৫০ জন শ্রমিকের চিকিৎসার জন্য কমপক্ষে একটি প্রাথমিক চিকিৎসার উপকরণসহ বাক্স বা আলমারীর ব্যবস্থা রাখতে হবে।[৬৫] কারখানা বিধিমালায় বলা হয়েছে, প্রতিটি কারখানায় বিভিন্ন সরঞ্জাম সম্বলিত প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স বা কাবার্ড থাকতে হবে। পরিদর্শনে দেখা যায়, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই প্রাথমিক চিকিৎসা বা প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামের ব্যবস্থা নেই। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে মালিকের খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। কোন প্রতিষ্ঠানেই ডিস্পেন্সারী কক্ষ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-৩১
প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদির ব্যবস্থার ভিত্তিতে
জরিপকৃত কারখানাসমূহের বন্টন–

প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স আছে	৩	১৫
প্রতিষ্ঠানের খরচে বাইরে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে	৫	২৫
কোন ব্যবস্থা নেই	১২	৫০
মোট	২০	১০০

সারনী-৩১ এ দেখা যাচ্ছে যে, মাত্র ১৫% প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স আছে। ২৫% প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের খরচে বাইরে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। ৬০% প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদির কোন ব্যবস্থা নেই।[৬৬]

ক্যান্টিন ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে, কোন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ২৫০ জনের বেশি হলে সরকার একটি উপযুক্ত ক্যান্টিনের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দিয়ে নিয়মাবলী রচনা করতে পারেন।[৬৭] জরিপে দেখা যায়, কোন প্রতিষ্ঠানেই ক্যান্টিন ও শ্রমিকদের জন্য আলাদা কোন ভোজন কক্ষ নেই। কেউ কেউ কাজ করার স্থানে বসে খাওয়া-দাওয়া করে। কেউ কেউ শোবার রুমে খাওয়া-দাওয়া করে। অধিকাংশ লোক নিজের বাসা অথবা হোটেল থেকে খেয়ে আসে।[৬৮]

৪.৫ প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকদের নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যবস্থা

দৈনিক কার্যঘন্টা ও সাপ্তাহিক কাজের সময় ঃ কোন কারখানায় কোন প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিককে দৈনিক ৯ ঘন্টার বেশি কাজ করতে বলা যাবে না।[৬৯] কারখানা আইনে বলা হয়েছে, কোন প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকের সাপ্তাহিক কাজের সময় ৪৮ ঘন্টার বেশি হবে না এবং এই সময়ের অধিক তাকে কাজ করতে বলা যাবে না।[৭১]

Dhaka University Institutional Repository

জরিপে দেখা গিয়েছে, ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৯০ ঘণ্টা এবং সর্বনিম্ন ৩৬ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ হয়ে থাকে।

সারনী-৩২

দৈনিক কার্যঘন্টার ভিত্তিতে জরিপকৃত কারখানাসমূহের বন্টন

দৈনিক কার্যঘন্টা	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
দৈনিক ১৪ ঘণ্টা কাজ হয়	১	৫
দৈনিক ১৩ ঘন্টা কাজ হয়	২	১০
দৈনিক ১২ ঘণ্টা কাজ হয়	৪	২০
দৈনিক ১০ ঘণ্টা কাজ হয়	৪	২০
দৈনিক ৯ ঘণ্টা কাজ হয়	৩	১৫
দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজ হয়	৫	২৫
দৈনিক ৬ ঘণ্টা কাজ হয়	১	৫
মোট	২০	১০০

সারনী-৩২ এ দেখা যাচ্ছে, ৫% প্রতিষ্ঠানে দৈনিক ১৪ ঘণ্টা কাজ হয়ে থাকে। ১০% প্রতিষ্ঠানে দৈনিক ১৩ ঘণ্টা কাজ হয়ে থাকে। ২০% প্রতিষ্ঠানে দৈনিক ১২ ঘণ্টা কাজ হয়ে থাকে। ২০% প্রতিষ্ঠানে দৈনিক ১০ ঘণ্টা কাজ হয়ে থাকে। ১৫% প্রতিষ্ঠানে দৈনিক ৯ ঘণ্টা কাজ হয়ে থাকে। ২৫% প্রতিষ্ঠানে দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজ হয়ে থাকে। ৫% প্রতিষ্ঠানে দৈনিক ৬ ঘণ্টা কাজ হয়ে থাকে।[৭১]

সাপ্তাহিক ছুটি ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে, কারখানায় কর্মরত প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক সপ্তাহে একদিন ছুটি ভোগ করতে পারে।[৭২]

অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই সপ্তাহে একদিন ছুটির ব্যবস্থা আছে। বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকগণ সপ্তাহে অর্ধদিবস ছুটি ভোগ করে থাকে। আবার কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে কোন ছুটির ব্যবস্থা নেই। সপ্তাহে সাতদিনই তাদের কাজ করতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-৩৩

সাপ্তাহিক ছুটি সংক্রান্ত বিধান এর ভিত্তিতে

জরিপকৃত কারখানাসমূহের বন্টন

সাপ্তাহিক ছুটি সংক্রান্ত বিধান	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
সপ্তাহে একদিন	১৫	৭৫
সপ্তাহে অর্ধদিবস	৪	২০
কোন ছুটি নেই	১	৫
মোট	২০	১০০

সারনী-৩৩ এ দেখা যাচ্ছে যে, ৭৫% প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকগণ সপ্তাহে একদিন ছুটি ভোগ করে থাকে। ২০% প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকগণ সপ্তাহে অর্ধদিবস ছুটি ভোগ করে থাকে। ৫% প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকগণ কোন ছুটি ভোগ করে না।[৭৩]

ক্ষতিপূরণমূলক সাপ্তাহিক ছুটির অবকাশ ঃ কারখানা আইনে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন শ্রমিক সাপ্তাহিক ছুটি না পেয়ে থাকে, তবে সে সেই মাসেই অথবা পরবর্তী দু'মাসের মধ্যে সমপরিমাণ দুটি ক্ষতিপূরণমূলক সাপ্তাহিক ছুটি হিসেবে ভোগ করতে পারবে।[৭৪] কারখানা বিধিমালায় বলা হয়েছে, কৌশলগত কারণে রেহাইপ্রাপ্ত শ্রমিকগণ ব্যতীত অপরাপর শ্রমিকগণের ক্ষেত্রে অবকাশ এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যেন প্রতি সপ্তাহে অনধিক দুটি করে অবকাশ থাকে।[৭৫]

ঈদের সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে বিশেষ কোন ছুটির বিধান প্রতিষ্ঠানগুলিতে নেই। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানগুলিতেই সাপ্তাহিক ছুটি না পেলে কোন ক্ষতিপূরণমূলক ছুটি পাওয়া যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-৩৪

ক্ষতিপূরণমূলক ছুটির ভিত্তিতে জরিপকৃত কারখানাসমূহের বন্টন-

ক্ষতিপূরণমূলক ছুটি সংক্রান্ত তথ্য	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ক্ষতিপূরণমূলক ছুটি পাওয়া যায়	৪	২০
ক্ষতিপূরণমূলক ছুটি পাওয়া যায় না	১৬	৮০
মোট	২০	১০০

সারনী-৩৪ এ দেখা যাচ্ছে, মাত্র ২০% ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানে ক্ষতিপূরণমূলক ছুটি পাওয়া যায়। অন্যদিকে ৮০% প্রতিষ্ঠানে কোন ক্ষতিপূরণমূলক ছুটি পাওয়া যায় না।[৭৬]

অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই সাপ্তাহিক ক্ষতিপূরণমূলক অবকাশের কোন ব্যবস্থা নেই।

সারনী-৩৫

ক্ষতিপূরণমূলক অবকাশের ভিত্তিতে জরিপকৃত কারখানাসমূহের বন্টন-

সাপ্তাহিক ক্ষতিপূরণমূলক অবকাশ সংক্রান্ত তথ্য	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
সপ্তাহে একদিন ক্ষতিপূরণমূলক অবকাশের ব্যবস্থা আছে	৩	১৫
ক্ষতিপূরণমূলক অবকাশের কোন ব্যবস্থা নেই	১৭	৮৫
মোট	২০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-৩৫ এ দেখা যাচ্ছে, মাত্র ১৫% প্রতিষ্ঠানে সপ্তাহে একদিন ক্ষতিপূরণমূলক অবকাশের ব্যবস্থা আছে। অন্যদিকে ৮৫% প্রতিষ্ঠানে সাপ্তাহিক ক্ষতিপূরণমূলক অবকাশের কোন ব্যবস্থা নেই।[৭৭]

কাজের পালা ঃ কাজের পালা সম্বন্ধে কারখানা আইনে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি। এতে বলা হয়েছে, প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক যদি কোন কারখানায় রাত্রির পালায় মধ্যরাত্রির পরেও কাজ করে তবে কাজ শেষ হওয়ার সময় হতে পরবর্তী একটানা ২৫ ঘণ্টা তার সাপ্তাহিক ছুটির দিন হিসেবে গণ্য হবে।[৭৮]

অধিকাংশ ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানে একটি শিফটেই কাজ হয়ে থাকে। তবে কিছু কিছু খাদ্য শিল্পে দুটি শিফটেও কাজ হয়ে থাকে।

সারনী-৩৬

কাজের পালার ভিত্তিতে জরিপকৃত কারখানাসমূহের বন্টন–

কাজের পালা সংক্রান্ত তথ্য	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
দুটি পালায় কাজ হয়	৫	২৫
একটি পালায় কাজ হয়	১৫	৭৫
মোট	২০	১০০

সারনী-৩৬ এ দেখা যাচ্ছে, মাত্র ২৫% প্রতিষ্ঠানে দুটো পালায় কাজ হয়ে থাকে। অন্যদিকে ৭৫% প্রতিষ্ঠানে একটি পালা কাজ হয়ে থাকে।[৭৯]

অতিরিক্ত ভাতা ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে যে, যদি একজন প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক দৈনিক ৯ ঘন্টার উর্ধ্বে বা সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টার অধিক কোন কারখানায় কাজ করে তবে তাকে স্বাভাবিক মজুরীর দ্বিগুণ হারে অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য অতিরিক্ত ভাতা প্রদান করতে হবে।[৮০]

জরিপে দেখা যায়, অতিরিক্ত সময় কাজ করলে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান তার জন্য আলাদা ভাতা প্রদান করে।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-৩৭

অতিরিক্ত ভাতা সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে জরিপকৃত কারখানাসমূহের বন্টন–

অতিরিক্ত ভাতা সংক্রান্ত তথ্য	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
অতিরিক্ত ভাতা প্রদান করে	১৩	৬৫
অতিরিক্ত ভাতা প্রদান করেন না	৭	৩৫
মোট	২০	১০০

সারনী-৩৭ এ দেখা যাচ্ছে, ৬৫% প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত সময় কাজ করলে অতিরিক্ত ভাতা প্রদান করে থাকে। ৩৫% প্রভিষ্ঠান অতিরিক্ত ভাতা প্রদান করে না।[৮১]

৪.৬ অন্যান্য ব্যবস্থা

কারখানা আইনে বলা হয়েছে, মহিলা শ্রমিকের দৈনিক কাজের সময় ৯ ঘন্টার বেশি হবে না।[৮২] কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিককে কোন কারখানায়–(ক) দৈনিক ৫ ঘন্টার বেশি এবং সন্ধ্যা ৭টা হতে সকাল ৭টা পর্যন্ত কাজে নিয়োজিত করা বা কাজের জন্য অনুমতি দেয়া যাবে না।[৮৩] প্রত্যয়নকারী চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত দৈহিক সক্ষমতা সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র ব্যতিরেকে একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে কোন কারখানায় নিয়োগ করা যাবে না।[৮৪] যে শিশুর বয়স ১৪ বছরের কম তাকে কোন কারখানায় কাজের জন্য নিযুক্ত করা বা কোন কাজ করতে অনুমতি দেওয়া যাবে না।[৮৫] কারখানার কাজে নিযুক্ত শিশুদের কাজের সময় দুটি পালায় সীমাবদ্ধ থাকতে এবং কোন পালার সময়সীমা সাড়ে সাত ঘন্টার বেশি হবে না।[৮৬] কোন শিশুকে একই দিনে একাধিক কারখানায় কাজের জন্য নিয়োগ করা যাবে না।[৮৭] যে সকল কারখানায় শিশুরা কাজে নিযুক্ত রয়েছে সে সকল কারখানার ব্যবস্থাপককে শিশু শ্রমিকদের একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে।[৮৮]

প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কারখানায় নিযুক্ত প্রত্যেক শ্রমিকেরই ছুটি ও মজুরীসহ ছুটি ভোগ করার অধিকার রয়েছে। কারখানার মালিক বেআইনীভাবে একজন শ্রমিককে ছুটি থেকে বঞ্চিত

Dhaka University Institutional Repository

করতে পারেন না। এর মধ্যে রয়েছে মজুরীসহ বার্ষিক ছুটি,[৮৯] অসুস্থতা বা দুর্ঘটনার কারণে মজুরীসহ বা বিনা মজুরীতে কোন ছুটি, ১২ সপ্তাহের অনধিক মাতৃত্বকল্যাণ ছুটি,[৯০] উৎসব ছুটি,[৯১] নৈমিত্তিক ছুটি[৯২] ইত্যাদি।

মহিলা শ্রমিকগণ বস্ত্র শিল্পে দৈনিক গড়ে ৮/৯ ঘণ্টা কাজ করে থাকে। সকল প্রতিষ্ঠানেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকগণ প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের অনুরূপ সময় পর্যন্ত কাজ করে থাকে। তাদেরকে নিয়োগ করার সময় কোন ডাক্তারী সার্টিফিকেট নেয়া হয় না। স্বাভাবিকভাবে নিয়োগ করে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকের তত্ত্বাবধানে রেখে কাজ শেখানো হয়। প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের মজুরী চুক্তিভিত্তিক হলেও কিশোর শ্রমিকদেরকে মাসিক ভিত্তিতে মজুরী প্রদান করা হয়। কিছু কিছু কারখানায় শিশু শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। তবে বস্ত্র শিল্পে এদের বেশি দেখা যায়। সাধারণত ৮ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত শিশুদের প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করা হয়। তাদের মাসিক ভিত্তিতে মজুরী দেওয়া হয়। অসুস্থ হলে মালিক চিকিৎসা খরচ বহন করে থাকে। তারা দিন ও রাত্রি যে কোন একটি পালায় কাজ করে থাকে। শিশু শ্রমিকদের প্রতি পালার সীমা ৬ থেকে ৭ ঘণ্টা। তারা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বাইরে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করে না। শিশু শ্রমিকদের কাজ করার নিয়মাবলী সংক্রান্ত কোন রেজিস্টার কোন প্রতিষ্ঠানই সংরক্ষণ করে না।[৯৩]

অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকগণ অসুস্থ হলে ছুটি পাওয়া যায় বটে কিন্তু তার জন্য কোন মজুরী দেয়া হয় না। আবার কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে মালিক মজুরী প্রদান না করলেও চিকিৎসা করার জন্য অর্থ প্রদান করে থাকে।[৯৪]

মন্তব্য

ঢাকার ২০টি ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে দেখা গিয়েছে যে, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, পুরোনো ঢাকা এবং মিরপুর এলাকার ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে খুবই খারাপ কার্যপরিবেশ বিরাজ করছে। অন্যদিকে নতুন ঢাকার বিভিন্ন এলাকার শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে কিছুটা ভাল কার্যপরিবেশ বিরাজ করছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-৩৮

একনজরে ঢাকার ২০টি ক্ষুদ্রশিল্পের কার্যপরিবেশ-

প্রতিষ্ঠানের অবস্থান	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিবেশ			মোট হার (%)
		ভাল	তেমন ভাল নয়	নোংরা	
পুরোনো ঢাকার বিভিন্ন স্থান	৮টি	৫	১০	৮৫	১০০
তেজগাঁও শিল্প এলাকা	২টি	০	০	১০০	১০০
মিরপুর এলাকা	৭টি	৫	৭০	২৫	১০০
নতুন ঢাকার বিভিন্ন এলাকা (ধানমন্ডি, রমনা ও সবুজবাগ থানা এলাকা)	৩টি	৩০	৭০	০	১০০

সারনী-৩৮ এ দেখা যাচ্ছে, পুরোনো ঢাকার ৫% ক্ষুদ্রশিল্পের কার্যপরিবেশ ভাল, ১০% ক্ষুদ্রশিল্পের কার্যপরিবেশ তেমন ভাল নয়। এবং ৮৫% ক্ষুদ্রশিল্পের কার্যপরিবেশ নোংরা। তেজগাঁও শিল্প এলাকার ১০০% ক্ষুদ্রশিল্পের কার্যপরিবেশ নোংরা। মিরপুর এলাকার ৫% ক্ষুদ্র শিল্পের কার্যপরিবেশ ভাল, ৭০% ক্ষুদ্রশিল্পের কার্যপরিবেশ তেমন ভাল নয় এবং ২৫% ক্ষুদ্রশিল্পের কার্যপরিবেশ নোংরা। নতুন ঢাকার বিভিন্ন এলাকার ৩০% ক্ষুদ্রশিল্পের কার্যপরিবেশ ভাল এবং ৭০% ক্ষুদ্রশিল্পের কার্যপরিবেশ তেমন ভাল নয়।[৯৫]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৫ সালের কারখানা আইনে কার্যপরিবেশ উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত বিধান রাখা হয়েছে, ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সে সমস্ত ব্যবস্থার প্রতিফলন দেখা যায়নি। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, অধিকাংশ ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যপরিবেশ অত্যন্ত শোচনীয়। প্রতিষ্ঠানসমূহের গৃহীত ব্যবস্থা আইনের দেয়া বিধানসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে যে যার ইচ্ছামত দৈনন্দীন কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। আইনের বিধান সম্পর্কে তারা একদিকে যেমন সচেতন নয় অন্যদিকে কোন তদারকী না থাকায় তারা আইন অনুসরণের প্রয়োজন বোধ করে না। তাছাড়া আইনগত কিছু ত্রুটি এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী। ফলে দিন দিন ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যপরিবেশ অনুন্নত হয়ে পড়ছে। আর এই অনুন্নত কার্যপরিবেশের কারণে প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে। সর্বোপরি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ–

১. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা–২(বি)।
২. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা–২(এ)।
৩. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা–২(সি)।
৪. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।
৫. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।
৬. সরাসরি পর্যবেক্ষণ ও শ্রমিক-কর্মীদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।
৭. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা–৮(১)এ।
৮. গবেষকের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে।
৯. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা–১৩(১)।
১০. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা–১২(১)।
১১. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।
১২. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা–১২(১)।
১৩. গবেষকের পর্যবেক্ষণ।
১৪. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।
১৫. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।
১৬. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে।
১৭. ঐ।
১৮. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।
১৯. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা–১৮(১)।
২০. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা–১৮(২)।
২১. ঐ, উপধারা-৩।
২২. ঐ, উপধারা-৪।
২৩. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে।
২৪. ঐ।
২৫. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।
২৬. ঐ।
২৭. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা–১৯(১)।
২৮. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা–১৯(২)।
২৯. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।
৩০. ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

৩১. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-১৪(১)।
৩২. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।
৩৩. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-২০(১)।
৩৪. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।
৩৫. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে।
৩৬. ঐ।
৩৭. ঐ।
৩৮. ঐ।
৩৯. ঐ।
৪০. ঐ।
৪১. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-২১(১)।
৪২. কারখানা আইন ১৯৬৫, ধারা-২১(৩)।
৪৩. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।
৪৪. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-২২।
৪৫. শ্রমিক-কর্মীদের সাথে সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে।
৪৬. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।
৪৭. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-২৩।
৪৮. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।
৪৯. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-২২।
৫০. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে।
৫১. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-২৫।
৫২. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ।
৫৩. কারখানা আইন-১৯৬৫, ধারা-২৮।
৫৪. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।
৫৫. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৩৬।
৫৬. আবদুল আজিজ খান, শ্রম ও শিল্প আইন, পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮।
৫৭. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।
৫৮. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে।
৫৯. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৪৩।
৬০. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে।
৬১. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।
৬২. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

৬৩. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।
৬৪. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে।
৬৫. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৪৪।
৬৬. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ।
৬৭. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৪৫।
৬৮. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে।
৬৯. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৫৩।
৭০. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৫০(১)।
৭১. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।
৭২. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৫১।
৭৩. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।
৭৪. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা–৫২।
৭৫. কারখানা বিধিমালা, ১৯৭৯, ধারা–৫২(১)।
৭৬. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।
৭৭. ঐ।
৭৮. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৫৬।
৭৯. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে।
৮০. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৫৮।
৮১. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।
৮২. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৫৩।
৮৩. ঐ, ধারা-৭০(১)।
৮৪. ঐ, ধারা-৬৭।
৮৫. ঐ, ধারা-৬৬।
৮৬. ঐ, ধারা-৭০(২)।
৮৭. ঐ, ধারা-৭০(৫)।
৮৮. ঐ, ধারা-৭২।
৮৯. ঐ, ধারা-৭৮।
৯০. ঐ, ধারা-৭৯(২)।
৯১. ঐ, ধারা-৭৯।
৯২. ঐ, ধারা-৮০।
৯৩. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে।
৯৪. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।
৯৫. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৫

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৫

কারখানা আইনে বর্ণিত পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষের পরিচিতি

১৯৬৫ সালের কারখানা আইনে পরিদর্শকদের নিয়োগ, কর্তব্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিধান রয়েছে এবং প্রদত্ত বিধান মোতাবেক পরিদর্শকগণ কার্য সম্পাদন করেন।

৫.১ পরিদর্শক

কারখানা আইনের বিধান মোতাবেক যে সমস্ত ব্যক্তি কারখানাসমূহ পরিদর্শন করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন তারাই পরিদর্শক হিসেবে পরিচিত। এদের দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন-প্রধান পরিদর্শক ও পরিদর্শক। বাংলাদেশ সরকার সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তিকে প্রধান পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগ করতে পারেন।[১] কারখানা আইনের অধীনে যে সকল ক্ষমতা প্রধান পরিদর্শককে প্রদান করা হয়েছে তা ছাড়াও তিনি দেশের সর্বত্র একজন পরিদর্শকের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন[২] এবং নিযুক্ত পরিদর্শকগণের উপর তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা ভোগ করতে পারেন।[৩]

৫.১.১ পরিদর্শকের নিয়োগ

কারখানা আইনের বিধান অনুযায়ী বিভিন্নভাবে পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়।

সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে কারখানা আইনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাংলাদেশ সরকার যাকে উপযুক্ত মনে করবেন তাকে পরিদর্শক হিসেবে নিযুক্ত করতে পারেন এবং বিবেচনা মাফিক তাদের স্থানীয় সীমা নির্ধারন করে দিতে পারেন।[৪] বাংলাদেশ সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে কারখানা আইনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত মনে করবেন এরূপ কোন সরকারী অফিসারকে পরিদর্শক হিসেবে নিযুক্ত করতে পারেন এবং তাদের ক্ষমতাভুক্ত এলাকা নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেক জেলা প্রশাসক তার নিজ জেলার পরিদর্শক বলে গণ্য হবেন।[৬] যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কারখানা বা উৎপাদন প্রক্রিয়া বা কারবারের সাথে জড়িত অথবা প্যাটেন্ট বা কারখানার যন্ত্রপাতির সাথে সংশ্লিষ্ট আছেন বা হতে পারেন তিনি পরিদর্শক হিসেবে নিযুক্ত হতে পারবেন না এবং নিযুক্ত অবস্থায় থাকলেও তা চালিয়ে যেতে পারবেন না।[৭]

যদি কোন এলাকায় একজনের অধিক পরিদর্শক থাকে, তবে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে সরকার প্রত্যেকের ক্ষমতা নির্ধারণ করে দিতে পারেন এবং এই ক্ষমতা নির্ধারণের বিজ্ঞপ্তি নির্দিষ্ট পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করতে হবে।[৮] প্রধান পরিদর্শকসহ প্রত্যেক পরিদর্শক ১৮৬০ সালের বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ২১ ধারার অর্থ অনুযায়ী সরকারি কর্মচারী হিসেবে গণ্য হবে এবং ৯(৩) ধারা মোতাবেক নিযুক্ত পরিদর্শকগণ বিজ্ঞপ্তিতে নির্দেশিত কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ হবে।৯

প্রধান পরিদর্শক ও প্রত্যেক পরিদর্শক ১৮৬০ সালের বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ২১ ধারার অর্থ অনুযায়ী সরকারী কর্মচারী হিসেবে গণ্য হবেন এবং উপধারা-৩ অনুযায়ী নিযুক্ত পরিদর্শকগণকে সরকার যেভাবে নির্দিষ্ট করে দেবেন সেভাবে তারা প্রত্যেকে সেরূপ কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ হবেন।[১০]

৫.১.২ পরিদর্শকের ক্ষমতা

১৯৬৫ সালের কারখানা আইনে পরিদর্শকদের ক্ষমতা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। উক্ত আইনে বলা হয়েছে এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একজন পরিদর্শক যে স্থানীয় সীমার মধ্যে নিযুক্ত হয়েছেন সেই সীমার মধ্যে–

বাংলাদেশ সরকারের বা যে কোন মিউনিসিপ্যালিটি বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কার্যে নিযুক্ত কর্মচারীদের, যাদের তিনি উপযুক্ত মনে করবেন, তাদের সহায়তায় কারখানা আইনের ৩ ধারা অনুসারে কারখানারূপে ব্যবহৃত বা ব্যবহৃত হচ্ছে বলে বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে এরূপ কোন স্থানে প্রবেশ, পরিদর্শন ও পরীক্ষা করতে পারেন।১১

এই আইন অনুসারে রক্ষিত যে কোন রেজিস্টার, সার্টিফিকেট, বিজ্ঞপ্তি এবং দলিলপত্র চাওয়ার এবং ঐগুলোর যে কোনটির পরীক্ষা এবং অনুলিপি গ্রহণের ক্ষমতা একজন পরিদর্শকের রয়েছে। একজন পরিদর্শক কোন কারখানা বা কারখানায় নিয়োজিত কোন ব্যক্তির স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিধানসমূহ যা কারখানা আইনে বা অন্যকোন প্রচলিত আইনে উল্লেখ করা আছে

Dhaka University Institutional Repository

সেগুলো যথাযথভাবে মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা নিরূপনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনমত পরীক্ষা ও অনুসন্ধান চালাতে পারেন।[১২]

কারখানার প্রকৃত দখলকারী সম্পর্কে কোন তথ্য জানার প্রয়োজন বোধ করলে তা কারখানায় নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তির নিকট হতে তা জানার ক্ষমতা একজন পরিদর্শকের রয়েছে। কারখানা আইন সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে কারখানায় নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে বা যাকে সংগত মনে করবেন বা যে গত দু'মাস যাবত কারখানায় নিযুক্ত রয়েছে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার ক্ষমতা একজন পরিদর্শকের আছে। তবে, কোন ব্যক্তিকে নিজের অপরাধ প্রমাণ করে বা অপরাধের স্বাক্ষর প্রদান করে কোন বক্তব্য প্রকাশ করতে বাধ্য করা যাবে না। এভাবে পরীক্ষিত প্রত্যেক ব্যক্তির লিপিবদ্ধ জিজ্ঞাসাবাদে তাদের স্বাক্ষর নেয়ার ক্ষমতা একজন পরিদর্শকের আছে।[১৩]

প্রত্যেকটি কারখানার দখলকারী তার প্রতিনিধি এবং কর্মচারীবৃন্দকে পরিদর্শকের কারখানাতে প্রবেশ, পরিদর্শন, পরীক্ষা, অনুসন্ধান, নমুনা গ্রহণ অথবা অন্যকথায় কারখানা আইন অনুযায়ী তার ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য যা প্রয়োজন সে মত ব্যবস্থা করে দিতে হবে।[১৪]

একজন পরিদর্শক এই আইনের ধারাসমূহ প্রয়োগ ও কার্যকারিতার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন মনে করলে যে কোন কারখানায় সংশ্লিষ্ট যে কোন রেকর্ডপত্র, রেজিস্টার অথবা অন্য কোন দলিলপত্র আটক করতে পারবেন।[১৫]

৫.১.৩ পরিদর্শকের কর্তব্য

কারখানা পরিদর্শন, আইন ভঙ্গকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ স্থাপন এবং সর্বোপরি কারখানা ও অন্যান্য শিল্প আইনের বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা একজন কারখানা পরিদর্শকের কর্তব্য।

৫.২ প্রত্যয়নকারী চিকিৎসক

নিয়োগ ঃ কারখানা আইন মোতাবেক প্রত্যয়নকারী চিকিৎসকের নিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধান রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার প্রত্যয়নকারী চিকিৎসক হিসেবে উপযুক্ত এরূপ রেজিস্টার্ড চিকিৎসককে কারখানা আইনের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে কোন স্থানীয় সীমার বা কোন কারখানায় বা কোন শ্রেণীর বা বর্ণনার কারখানার জন্য প্রত্যয়নকারী চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগ করতে পারেন।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

এরূপ কোন ব্যক্তি প্রত্যয়নকারী চিকিৎসক হিসেবে নিযুক্ত হতে পারবেন না বা নিযুক্ত হয়ে থাকলেও তার ক্ষমতা প্রয়োগ চালিয়ে যেতে পারবেন না, যে ব্যক্তি কোন কারখানার দখলকারী বা দখল লাভ করেছে অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কারখানার সাথে জড়িত বা উক্ত কারখানার কোন প্যাটেন্ট বা যন্ত্রপাতির সাথে সংশ্লিষ্ট।[১৭]

কর্তব্য ঃ ১৯৬৫ সালের কারখানা আইন অনুযায়ী একজন প্রত্যয়নকারী চিকিৎসকের বিভিন্ন কর্তব্য রয়েছে। যেমন–

- কারখানা আইন অনুযায়ী যাদেরকে তরুণ বলে গণ্য করা হয় তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রত্যয়নপত্র দান;
- কারখানায় নির্ধারিত বিপদজনক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা;
- যে কোন কারখানা বা শ্রেণী বর্ণনায় কারখানার জন্য নির্ধারিত চিকিৎসা সংক্রান্ত দেখাশোনা করা যে ক্ষেত্রে–
- যুক্তিসংগত কারণে বিশ্বাস জন্মায় যে উৎপাদন প্রক্রিয়ার কারণে বা অন্য কোন কারণের জন্য অসুস্থতা ঘটেছে;
- উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন অথবা তাতে ব্যবহৃত কোন বস্তুর পরিবর্তনের কারণে নিযুক্ত শ্রমিকের স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা রয়েছে;
- স্বাস্থ্যের হানি ঘটতে পারে এরূপ কোন কার্যে তরুণেরা নিযুক্ত হলে বা সম্ভাবনা থাকলে।[১৮]

৫.৩ বাংলাদেশের কল-কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকারী পরিদপ্তরের কার্যক্রম

বাংলাদেশের কল-কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করে থাকে কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন পরিদপ্তর। প্রধান পরিদর্শকসহ এখানে রয়েছে মোট ১০৪ জন পরিদর্শক। কিন্তু পরিদর্শন কার্যে নিয়োজিত রয়েছে মাত্র ৫৩ জন। এই ৫৩ জন পরিদর্শকের মধ্যে ৩টি ভাগ রয়েছে। যথা–

১. ইঞ্জিনিয়ারিং

২. মেডিক্যাল ও

৩. সাধারণ

Dhaka University Institutional Repository

এ ভাগগুলোর মধ্যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও সাধারণ কর্মকর্তা রয়েছেন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের পরিদর্শকগণ সাধারণত শিল্পের নিরাপত্তা, দুর্ঘটনা, মেশিনারী ইত্যাদি দিক দেখেন। মেডিকেল বিভাগের পরিদর্শকগণ দেখেন পেশাগত স্বাস্থ্যের ঝুঁকিগত দিক, পেশাগত রোগ ইত্যাদি। সাধারণ বিভাগের পরিদর্শকগণ দেখেন সকল ধরনের রেকর্ড, রেজিস্টার, ছুটি, অবকাশ, মজুরী, ওভারটাইম ইত্যাদি দিক।[১৯]

পরিদর্শকগণ পরিদর্শনে দেখেছেন যে, কলকারখানা/শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কারখানা আইন মেনে চলে না। তাদের মতে, আইনের কিছু বিচ্যুতি রয়েছে। যেমন–শব্দ, কম্পন, ধোয়া ও আবর্জনা, তাপমাত্রা ইত্যাদির মান পূর্ব নির্ধারিত নয়। একটা রুমের তাপমাত্রা কত হবে আইন তা বলে দেয়নি, মাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি। প্রতিষ্ঠানসমূহ ডাস্ট মাস্ক ব্যবহার করে না, স্মল ফাইবার ও ডাস্ট এর মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করা হয়নি। লাইট ইউনিটের স্ট্যান্ডার্ড বা মাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি।[২০]

শ্রমিকেরা কাজ করার কারণে কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হলে তারা পরিদর্শন পরিদপ্তরে জানায় না। শ্রমিক নেতাগণের জ্ঞানের অভাবের কারণে তারা প্রকৃত বিষয় না বুঝে বৃথা আন্দোলন করে। অর্থাৎ তারা প্রকৃতপক্ষে কার্যপরিবেশ উন্নয়নের জন্য আন্দোলন করে না। এক্ষেত্রে তাদের প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। পরিদর্শকদের সাথে আলোচনাক্রমে জানা গেছে, পরিদর্শনকালে কোন ত্রুটি ধরা হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়। স্বল্প সংখ্যক পরিদর্শক থাকার কারণে সকল প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন সম্ভব হয় না। এজন্য কমপক্ষে ২০০ জন পরিদর্শক থাকা দরকার বলে পরিদর্শকগণ মনে করেন। তাদের মতে, কার্যপরিবেশ উন্নয়নের জন্য শ্রমিকদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে হবে, ব্যবস্থাপনার আচরণের উন্নয়ন সাধন করতে হবে, আইন সম্মত উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। মাস্ক ও হেলমেটের ব্যবস্থা করতে হবে।[২১]

জনৈক পরিদর্শক বলেন, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। অতিরিক্ত শব্দের মধ্যে কাজ করলে তাদের শ্রবনের অসুবিধা হয়। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে ফাষ্ট এইড বক্স থাকলেও সেগুলো ড্রয়ারের মধ্যে রাখা হয়। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই প্রাথমিক চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই।[২২]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠানসমূহ আইনের বিধিবিধান মেনে চলে না। আইনের অনেক জটিলতা রয়েছে। তাই সবক্ষেত্রে সব বিধান প্রযোজ্য হওয়া উচিত নয়। ত্রুটি দেখা দিলে শ্রম আদালতে মামলা দায়ের করা হয় এবং সে অনুযায়ী আদালত শাস্তির ব্যবস্থা করে থাকে। পরিদর্শকদের মতে, আইনের সংশোধন হওয়া আবশ্যক। প্রতিটি সেক্টরের জন্য পৃথক পৃথক আইন প্রণয়ন করতে হবে। তারা বলেন, প্রতি মাসে ১০টি কারখানা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের লোকসংখ্যা কম, এ কাজে আরো লোক প্রয়োজন, পরিদর্শকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই। পরিবহনের ব্যবস্থা নেই। মনিটরিং ইনস্ট্রুমেন্ট নেই। মেশিনারীর সংখ্যা কম। কারিগরী যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের সংখ্যা নগন্য। পরিদর্শন প্রযুক্তির ব্যবস্থা নেই। কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই, বিদেশে প্রশিক্ষণ নেয়া হলেও বাস্তবায়নের পরিবেশ নেই, অভাব রয়েছে পরিকল্পনাবিদের। পর্যাপ্ত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও উপদেষ্টার অভাব রয়েছে। সর্বোপরি, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতারও অভাব রয়েছে।[২৩]

জনৈক পরিদর্শক জানালেন, পরিদর্শনে দেখা গেছে যে, অনেক প্রতিষ্ঠান ২/৩ মাসেও মজুরী প্রদান করে না। তার মতে, কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ মাঝে মাঝে পরিদর্শন করা হয়। তবে অনেক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কাজে বাধা সৃষ্টি করে থাকে। সেক্ষেত্রে ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান আছে। এর বেশি ক্ষমতা প্রতিষ্ঠানের নেই। পরিদর্শনকালে পুলিশ, আর্মস বা নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই।[২৪]

মোটকথা, বাংলাদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষত ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বলতে গেলে পরিদর্শন করাই হয় না, যার ফলে মান্ধাতার আমলের উৎপাদন পদ্ধতি, বিদ্যমান রয়েছে এবং কার্যপরিবেশও অনুন্নত রয়ে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৯(১)।
২. ঐ।
৩. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৯(২)।
৪. ঐ।
৫. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৯(৩)।
৬. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৯(৪)।
৭. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৯(৫)।
৮. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৯(৬)।
৯. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৯(৭)।
১০. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৯(৮)।
১১. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-১০(১)।
১২. ঐ।
১৩. ঐ।
১৪. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-১০(২)।
১৫. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-১০(৩)।
১৬. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-১১(১)।
১৭. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-১১(২)।
১৮. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-১১(৩)।
১৯. শ্রম পরিদপ্তরের প্রকৌশল বিভাগের জনৈক পরিদর্শকের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।
২০. শ্রম পরিদপ্তরের পরিদর্শকদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।
২১. ঐ।
২২. ঢাকা বিভাগীয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তরের প্রকৌশল বিভাগের জনৈক পরিদর্শকের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।
২৩. ঢাকা বিভাগীয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তরের পরিদর্শকদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।
২৪. ঢাকা বিভাগীয় পরিদর্শন পরিদপ্তরের জনৈক সহকারী প্রধান পরিদর্শকের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৬

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৬

আইনানুগ ও আদর্শ কার্যপরিবেশ বনাম বাস্তব কার্যপরিবেশ

বাংলাদেশের কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে যাতে কাঙ্খিত মাত্রার কার্যপরিবেশ বিদ্যমান থাকে সেজন্য কারখানা আইন প্রবর্তন করা হয়, যা কারখানা আইন–১৯৬৫ নামে অভিহিত। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর পূর্ব পাকিস্তান কারখানা আইন ১৯৬৫কে সামান্য পরিবর্তন করে বাংলাদেশে কারখানা আইন, ১৯৬৫ নামে হুবহু গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৯ সালের কারখানা বিধিমালা এই আইনের আলোকে প্রবর্তিত হয়েছে। উক্ত আইন ও বিধিমালা এবং কর্মপরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত পুস্তককে আদর্শমান হিসেবে বিবেচনা করে উক্ত গবেষণা কার্য পরিচালনা করা হয়েছে। আদর্শমানের সাথে বাস্তব কার্যপরিবেশের বিভিন্ন বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হয়েছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে তার তুলনামূলক আলোচনা করা হল।

৬.১ মালামাল সংরক্ষণ ও স্থানান্তর সম্পর্কিত বিচ্যুতি–

কাজের জায়গায় মালামাল ছড়িয়ে থাকলে উৎপাদনের জন্য জায়গা কমে যায়। কারখানায় যত মালামাল ছড়িয়ে থাকবে ততবেশি যন্ত্রপাতি মালামাল হারিয়ে যাবে, শ্রমিকের মূল্যবান সময় খোঁজাখুঁজিতে নষ্ট হবে।[১]

*** মাটিতে জিনিস রাখা এড়ানোর চেষ্টা করতে হবে ঃ**

যে সমস্ত মালামাল সবসময় প্রয়োজন হয় না সেগুলো কাজের স্থান থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। মাটিতে কোন জিনিস না রেখে প্রতিটি জিনিস গুছিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় তাক বা জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য ছোট কাঠের ট্রে, আঁধার, তাক ইত্যাদির সমাবেশ ঘটাতে হবে। জায়গা বাঁচাবার জন্য কয়েকতলা বিশিষ্ট তাক ব্যবহার করা যেতে পারে। এর ফলে–

Dhaka University Institutional Repository

– মেঝের জায়গা বাঁচবে;

– প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সহজে নাগালের মধ্যে আসবে এবং মজুত ব্যবস্থা উন্নততর হবে।[২]

বাস্তবে দেখা গেছে যে, প্রতিষ্ঠানসমূহে মালামাল মেশিনের আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়েছে। প্রায় বেশিরভাগ মেঝেই মালামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে ভরে আছে। এদের কোন কোনটিতে মরিচা আর ময়লা ধরেছে।[৩]

* যন্ত্রাংশ ও হাতিয়ারের জন্য নির্দিষ্ট স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে ঃ

প্রত্যেকটি যন্ত্রাংশ এবং হাতিয়ারের জন্য নির্দিষ্ট স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এ পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া যায়। যেমন–

– প্রয়োজনীয় হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি নির্দিষ্ট আলমারীতে রাখা যায়।

– নির্দিষ্ট স্থানে যন্ত্রপাতির ছবি এঁকে সেখানে টাঙিয়ে রাখা যায়।

– তাকের গায়ে যন্ত্রপাতির নাম লেখা কাগজ লাগিয়ে দেয়া যায়।

– ঘুরানো তাক ব্যবহার করে পিছনের দিকে অব্যবহৃত জায়গার পরিমান কমানো যায়।

– ছোট ছোট যন্ত্রাংশ রাখার জন্য হাতলযুক্ত ড্রয়ারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

– ভান্ডার, তাক, টেবিল ইত্যাদিকে সহজে স্থানান্তর করবার জন্য চাকা ব্যবহার করা যেতে পারে। স্থানান্তর করার জন্য ঠেলাগাড়ি, চাকাওয়ালা সেল্ফ, ক্রেন, কনভেয়ার ও অন্যান্য যান্ত্রিক সাহায্যকারী জিনিস ব্যবহার করা যেতে পারে।[৪]

বাস্তবে দেখা যায়, শতকরা ৬৫% প্রতিষ্ঠানে বাক্সের ভিতরে খুচরা যন্ত্রাংশ রাখা হয়। শতকরা ১০% প্রতিষ্ঠানে দেয়ালের তাকে খুচরা যন্ত্রাংশ রাখা হয়। শতকরা ৫% প্রতিষ্ঠানে খুচরা যন্ত্রাংশ আলমারীতে রাখা হয়। শতকরা ২০% প্রতিষ্ঠানে খুচরা যন্ত্রাংশ মেশিনের আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়। কিন্তু কোনটি কোন যন্ত্রপাতি তা চেনার বা সনাক্ত করার কোন ব্যবস্থা নেই। ঘুরানো তাকেরও কোন ব্যবস্থা নেই। মালামাল স্থানান্তর করার জন্য কোন ব্যবস্থা নেই।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

৬.২ কর্মস্থল ডিজাইন সংক্রান্ত বিচ্যুতি

কর্মস্থল কয়েকটি বিশেষ কাজ এবং শ্রমিক নিয়ে গঠিত। তাই কর্মস্থল ডিজাইন করার সময় এই দুই বিষয়েই খেয়াল রাখতে হবে।[৬]

* মালামাল, যন্ত্রপাতি এবং মেশিনের নিয়ন্ত্রক নাগালের মধ্যে রাখতে হবে :

মালামাল, যন্ত্রপাতি এবং মেশিনের নিয়ন্ত্রক যেমন সুইচ, লিভার ইত্যাদি সহজ নাগালের মধ্যে রাখলে অনেক সময় এবং খাটনি বাঁচানো যায়। হাত বাড়িয়ে কোন কিছু ধরার দরকার পড়া মানেই উৎপাদনের সময় এবং শ্রম নষ্ট হওয়া। যে সব জিনিস বাঁকা, ট্রে বা তাক থেকে নিয়ে ব্যবহার করতে হয় সেগুলিকে নাগালের মধ্যে উপযুক্ত উচ্চতায় রাখতে হবে। যদি কয়েক ধরনের জিনিস ব্যবহার করতে হয়, তবে সেগুলিকে আলাদা আলাদা পাত্রে শ্রমিকদের সামনে অথবা পাশে রাখা টেবিলে রাখলে সুবিধা হবে।[৭]

বাস্তবে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানসমূহে মালামাল, যন্ত্রপাতি এবং মেশিনের নিয়ন্ত্রক নাগালের মধ্যে নেই।[৮]

* কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্তভাবে দাড়ানো বা বসার অভ্যাস করতে হবে :

অসুবিধাজনক অবস্থানে কাজ করলে শ্রমিকের কষ্ট হয়। এর ফলে আস্তে আস্তে প্রতিটি কাজের সময় বেড়ে যায় এবং উৎপাদন বেশি নষ্ট হয় বা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বাড়ে। অবস্থানজনিত কষ্ট নিম্নোক্তভাবে কমানো যায়–

– শক্ত কাজের টেবিল ব্যবহার করতে হবে যেন মালামাল স্থিরভাবে থাকে;

– কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি এবং কন্ট্রোলগুলি নাগালের মধ্যে রাখতে হবে যেন ব্যবহারকারীকে ঝুঁকতে বা বাঁকা হতে না হয়;

– শ্রমিকের উচ্চতা কম হলে প্ল্যাটফরম এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

– সঠিক উচ্চতার শক্ত পিছনওয়ালা ভাল চেয়ারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

– পায়ের কাছে দরকার মত পা ছড়ানোর জায়গা রাখতে হবে।[৯]

জরিপে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানগুলিতে উপযুক্তভাবে দাড়ানো বা বসার পরিকল্পিত কোন ব্যবস্থা নেই।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

* যন্ত্রপাতির নির্দেশনামা এবং কন্ট্রোলগুলি যেন সহজে দেখা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে ঃ

অনেক সময়ই ভুলের জন্য অনেক যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদিত দ্রব্যের ক্ষতি হয়। মানুষের ভুলের জন্য প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। এসব দুর্ঘটনা এড়ানোর একটি ভাল উপায় হচ্ছে শ্রমিকরা যেন তাদের কাজের জিনিসগুলি ভালভাবে দেখতে পারে তার ব্যবস্থা করা। ভাল কাজ পাওয়া এবং দুর্ঘটনা এড়ানোর সাথে এটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ পর্যায়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে ঃ

ক. যে সব জিনিস দেখতে, ধরতে এবং কন্ট্রোল করতে হবে (যেমন নির্দেশনামা, মালামাল, সুইচ ইত্যাদি) সেগুলি যেন সব সময়ই দৃষ্টির ভিতরে থাকে;

খ. নির্দেশনামা এবং কন্ট্রোলগুলি যেন সহজে চেনা যায়; এবং

গ. আলোকনের ব্যবস্থা যেন ভাল হয়।[১১]

বাস্তবে ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করে দেখা যায়, বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান বিশেষত ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানগুলিতে আলোর ব্যবস্থা পর্যাপ্ত পরিমানে না থাকায় সেখানে কিছুটা অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ বিরাজ করছে। ফলে যন্ত্রপাতি এবং কন্ট্রোলগুলি সহজে ও স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। যন্ত্রপাতির কোন নির্দেশনামা প্রতিষ্ঠানগুলিতে দেখা যায় না।[১২]

৬.৩ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিচ্যুতি

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক কারখানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং নর্দমা, পায়খানা বা অন্য কোন নোংরা স্থান হতে নির্গত দুর্গন্ধ হতে মুক্ত রাখতে হবে। প্রতি ১৪ মাসে একবার রং ও চুনকাম করতে হবে।[১৩]

কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানই নোংরা এবং দুর্গন্ধযুক্ত। শতকরা ৫০% প্রতিষ্ঠানেই চুনকাম ও রং করা হয় না।[১৪]

বায়ু চলাচল ও তাপমাত্রা ঃ ভাল কাজ পাওয়ার একটি পূর্বশর্ত হল ঘরের মধ্যে উপযুক্ত তাপমাত্রা নিশ্চিত করা। স্থানীয় আবহাওয়া, ঋতু এবং কাজের মাত্রার উপর এই উপযুক্ত তাপমাত্রা নির্ভর করে।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

কারখানা আইনে বলা হয়েছে, প্রতিটি কারখানা ঘরে যথেষ্ট নির্মল বায়ু চলাচলের কার্যকর ও উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য হানি না ঘটে এবং তারা আরামবোধ করে এমন তাপমাত্রা কারখানায় রাখতে হবে। দুটি প্রধান উপায়ে বাইরের তাপ বা ঠাণ্ডা ঘরের ভিতরে আসে : প্রত্যক্ষভাবে (জানালা, দরজা, ফাঁক, স্কাই লাইট ইত্যাদির ভিতর দিয়ে এবং পরোক্ষাভাবে (ছাদ এবং দেয়ালের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে)। তাছাড়া ঘরের জানালা এবং স্কাইলাইটের ভিতর দিয়ে রোদ এসে যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ইত্যাদির উপর পড়ে এগুলি উত্তপ্ত করে।[১৭] কয়েকটি উপায়ে এই সমস্যাগুলি সমাধান করা যায়।

* প্রকৃতিকে সাহায্য করতে দিতে হবে ঃ

উষ্ণ আবহাওয়া বাসুনয় পরিবেশ, ধুলা এবং তাপজনিত সমস্যার সৃষ্টি করে। গাছপালা, ঝোপঝাড়, ঘাস এবং ফুলের সাহায্যে উত্তপ্ত সূর্যের আলো এবং গরম বাতাসের বিরূপ প্রতিক্রিয়া কমানো যায়। এইগুলি প্রাকৃতিক 'জালি' সৃষ্টি করে ঘরে ধুলা প্রবেশের সুযোগ কমায় এবং আরামদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে।[১৮]

* দেয়াল এবং ছাদ থেকে তাপ প্রতিফলনের ব্যবস্থা আরো উন্নত করতে হবে:

বাইরের দেয়াল ও ছাদের রং ও মসৃনতার উপর তাপ প্রতিফলন ও শোষণ নির্ভরশীল। অমসৃন বা মাটির দেয়াল ঘরের ভিতর অনেক তাপ প্রবাহিত করে। এই তাপ প্রবাহ কমানোর জন্য দেয়ালগুলি মসৃন এবং হালকা রংয়ের হওয়া উচিত।[১৯]

* তাপ নিরোধ ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে :

একটি ধাতব দেয়াল একা তাপ বা ঠাণ্ডা প্রতিরোধ করতে পারে না কিন্তু এমন দুটি দেয়ালের মধ্যে যদি ফাঁক থাকে তবে তা ভাল তাপ নিরোধক হিসেবে কাজ করে। এই কারণে ধাতব দেয়াল, দরজা এবং জানালার পিছনে কোন শক্তি তাপ নিরোধক দ্রব্য, যেমন– প্লাইউড এর একটি স্তর থাকা প্রয়োজন। ইট বা অন্যান্য সচ্ছিদ্র দ্রব্য নির্মিত স্তর ব্যবস্থা করলে আরো ভালো ফল পাওয়া যায়। বাইরের এবং ভিতরেব দেয়ালেব মধ্যস্থিত বাতাসের সাহায্যে ঘরের তাপ নিরোধ ক্ষমতা অনেক বাড়ানো যায়।[২০]

Dhaka University Institutional Repository

* সূর্যের তাপ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সানশেড ব্যবহার করতে হবে :

ভালভাবে ডিজাইন করা শেড দ্বারা দু'ভাবে উপকার পাওয়া যায়। এরা সূর্যের বিকিরিত তাপ থেকে দেয়ালকে রক্ষা করে এবং তা শোষণ করে ঘরের ভিতর প্রবাহিত হওয়া রোধ করে। শেডের সাহায্যে ঘরের তাপমাত্রা অনেক কমিয়ে রাখা যায়। তাছাড়া চোখ ধাঁধানো আলো কমানো এবং ভালভাবে আলো বিচ্ছুরিত করায় শেডের সাহায্যে ঘরের আলোকন আরো ভাল হয়। দালানের পাশে লাগানো বড় গাছের ছায়া প্রাকৃতিক শেডের কাজ করে। এ ছাড়া আরেকটি উপায় হলো দেয়ালের বাইরে কিছু হালকা রংয়ের খাঁড়া পর্দার ব্যবস্থা করা।

এগুলি (ক) একেবারে স্থায়ী অথবা (খ) দিক পরিবর্তনযোগ্য হতে পারে। রোদের তাপ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আলো প্রতিফলক এমনকি রঙিন কাঁচ ব্যবহার করা যেতে পারে।

সবচেয়ে সহজ সমাধান হচ্ছে জানালার কাঁচের উপরের অংশটি কাপড় ধোঁয়ার নীল বা অন্য কোন নীল রং পানির সাথে মিলিয়ে তা দিয়ে প্রলেপ দিয়ে দেওয়া।[২১]

* বায়ু প্রবাহের সাহায্যে ঘরের বায়ু চলাচল ভাল করতে হবে :

কারখানায় বায়ু নিস্কাশনের অথবা বাইরের বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা না থাকলে ঘরের বাতাস কিছু সময়ের মধ্যেই ধূলা, ধোঁয়া এবং অন্যান্য গ্যাস দ্বারা দূষিত হয়। যে কোন সাধারণ কারখানায় প্রতি ঘণ্টায় আট থেকে বারো বার ঘরের বাতাস বদলানো প্রয়োজন। ঘরটা যত ছোট হবে, ততবেশি বার ঘরের বাতাস বদলাবার প্রয়োজন হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে বায়ু নিস্কাশনের জন্য ব্যবহারোপযোগী কয়েকটি ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা যায়। যেমন–

১. আনুভূমিক বায়ু প্রবাহকে ভালভাবে কাজে লাগাতে হবে;

২. উত্তপ্ত বাতাসের উপরে উঠার প্রবণতাকে কাজে লাগাতে হবে; এবং

৩. বায়ু দূষণের উৎসটি নির্মূল করতে হবে অথবা আলাদা করে রাখতে হবে।

জরিপে দেখা যায়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বায়ু চলাচল ও তাপমাত্রা সন্তোষজনক নয়। বায়ু চলাচলও তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকার মত পরিবেশ সৃষ্টি করে প্রতিষ্ঠান গৃহ নির্মিত হয়নি।[২৩]

আলোর ব্যবস্থা ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে কারখানার যে সকল অংশে শ্রমিকগণ কাজ করে, চলাচল করেসেই সকল অংশে প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম বা উভয় প্রকারের পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত আলোর ব্যবস্থা থাকতে হবে।[২৪] আলো প্রবেশের জন্য জানালায় কাঁচসমূহ ভিতর ও বাইরের

Dhaka University Institutional Repository

দিক দিয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে।[২৫] আলো যাতে চোখে না পড়ে বা আলোর কারণে চোখের উপর এরূপ চাপ না পড়ে যাতে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করতে হবে।[২৬] চোখের সাহায্যে মানুষ শতকরা ৮০ ভাগ তথ্য সংগ্রহ করে যদিও মানুষের চোখ আলোর সাথে সহজে খাপখাওয়াতে পারে এবং নিম্নতম আলোতেও কাজ চালিয়ে যেতে পারে, তথাপি কম আলোতে কাজ করলে উৎপাদনশীলতা কম হয়, কাজের মান খারাপ হয় এবং শ্রমিকের চোখের শ্রান্তি, ক্লান্তি, মাথা ধরা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। প্রতিষ্ঠানের আলোকন ব্যবস্থার উন্নতির সাথে উৎপাদনশীলতা বাড়ে। আলোক ব্যবস্থা প্রধানত তিনটি প্রধান প্রয়োজনের দ্বারা নির্ধারিত হয়। যথা- কাজের ধরন, শ্রমিকদের দৃষ্টিশক্তি ও কাজের পরিবেশ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন ঘড়ি মেরামতকারীর কাজের জন্য একজন মেশিন চালকের চাইতে বেশি পরিমানে আলোর প্রয়োজন। আবার একজন অল্প বয়স্ক শ্রমিকের চাইতে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক শ্রমিকের বেশি আলো প্রয়োজন। এসব কারণে যন্ত্রপাতি এবং আলা নিরূপন চার্টের সাহায্যে আলোর প্রয়োজন মাপা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তবে কারখানার ভিতর ঘুরে দেখে, শ্রমিকদের পর্যবেক্ষণ করে এবং তাদের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করে অনেক কিছু জানা যায়। যদি দেখা যায়, কোন শ্রমিক অদ্ভুতভাবে বসে বা চোখ কাজের খুব কাছে নিয়ে কাজ করছে, তবে বুঝতে হবে তাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে। তাছাড়া চোখের সামনে খোলা আলো থাকলে তা সব সময়ই শ্রমিকদের কাজের ক্ষমতা কমিয়ে দেবে। আবার শ্রমিকদের দৃষ্টিশক্তি যদি কম থাকে তবে গৃহীত কোন ব্যবস্থাই কাজ হবে না। তাই ক্ষেত্র বিশেষে শ্রমিকদের চোখ পরীক্ষা করাতে হবে।[২৭] এই বিষয়গুলি মনে রেখে বিভিন্ন নিয়ম পালন করা যায়।

* দিনের আলোর যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করতে হবেঃ

দিনের আলোই ঘরবাড়ী আলোকনের সবচেয়ে ভাল এবং সস্তা উৎস। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় ছোট প্রতিষ্ঠানগুলি এই আলোর সদ্ব্যবহার করেন না নূতন জানালা বা স্কাইলাইট তৈরি করার সময় মনে রাখতে হবে সেটি যত উপরে হবে, আলোও তত বেশি হবে। একটি নীচু জানালা দিয়ে যে আলো আসে, স্কাইলাইট দিয়ে তর দ্বিগুণ আলো আসতে পারে।[২৮]

Dhaka University Institutional Repository

* গ্লেয়ার বা চোখ ধাঁধানো আলো কমাতে হবে ঃ

গ্লেয়ার অর্থ চোখের সামনে কোন উজ্জ্বল আলোর উপস্থিতি। প্রায়ই গ্লেয়ারের কারণে শ্রমিকদের কাজের মান ও এবং উৎপাদনশীলতা ব্যাহত হতে দেখা যায়। এর ফলে চোখের দেখার ক্ষমতা কমে যায়, অসুবিধা হয়, বিরক্তি আসে এবং চোখের শ্রান্তি আসে। তাই গ্লেয়ার কমাতে পারলে বাতির ব্যবস্থা না বাড়িয়েও অবস্থার উন্নতি করা যায়।

গ্লেয়ার সাধারণতঃ দুই ধরনের হয়। সরাসরি গ্লেয়ার এবং প্রতিফলিত গ্লেয়ার।[২৯] জানালা দিয়ে আসা গ্লেয়ার কমানোর জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া যায়। যেমন–

– পর্দা, লুভার, ঢাকনা, ব্লাইন্ড, গাছ বা লতা-পাতা ব্যবহার করতে হবে।

– জানালায় স্বচ্ছ কাঁচের বদলে ঈষদচ্ছ কাঁচ ব্যবহার করতে হবে।

– কর্মস্থলের দিক পরিবর্তন করতে হবে যাতে শ্রমিকরা জানালার দিকে না তাকিয়ে পিছনে ফিরে বা পাশে ফিরে বসেন।[৩০] বাতির গ্লেয়ার কমানোর জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। যেমন–

– শ্রমিকদের দৃষ্টিকোণের মধ্যে কোন খোলাবাতির বাল্ব বা টিউবলাইট রাখা যাবে না।

– বাতির জন্য লম্বা সেড বা ঢাকনা ব্যবহার করতে হবে। শেডের ভিতর দিকটা গাঢ় অমসৃন হওয়া উচিত।

– শেডগুলি এমন উচ্চতায় ঝুলাতে হবে যেন আলোকিত কোন অংশ না দেখা যায়। অথবা এত উপরে ঝুলাতে হবে যেন তা দৃষ্টিকোনের বাইরে থাকে।[৩১]

সরাসরি গ্লেয়ার থেকে রেহাই পেলেও অনেক সময় প্রতিফলিত গ্লেয়ার দ্বারা কাজ-কর্ম ব্যাহত হয়। পালিশ করা সমতলের থেকে প্রতিফলিত আলোর দ্বারা সৃষ্ট গ্লেয়ারের থেকে বাঁচতে হলে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে :

– বাতির স্থান পরিবর্তন করতে হবে।

– বাতির উজ্জ্বলতা কমাতে হবে।

– কাজের পিছনের এলাকায় হালকা রঙের দেয়াল দিয়ে তার আশে-পাশের উজ্জ্বলতা বাড়ানো যায়।[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

* যে সব কাজে চোখের ব্যবহার বেশি সেক্ষেত্রে যথাযোগ্য পশ্চাদপটের (Back ground) ব্যবহার করতে হবে :

যে সমস্ত কাজে চোখের ব্যবহার বেশি এবং অনেক সময় ধরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হয়, সে সব ক্ষেত্রে তাদের পশ্চাদপটে কোন আকর্ষণক্ষম জিনিস না থাকলে শ্রমিকদের ক্লান্তি কম হয়। সেই সব জিনিস সরিয়ে ফেলে অথবা ঢেকে রেখে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যায়।[৩৩]

* বাতি ঝুলানোর জন্য সবচেয়ে উপযোগী স্থানটি খুঁজে বের করতে হবে :

বাতির অবস্থান এবং দিক পরিবর্তন করে বিনা খরচে খুব কার্যকরভাবে আলোকন ব্যবস্থার উন্নতি করা যায়। আলোকন ব্যবস্থা সবচেয়ে ভাল হয় যখন আলোটি ঘরের পিছনে থেকে আসে। তবে সবচেয়ে উপযোগী ব্যবস্থা কাজের ধরন এবং কাজের টেবিলের উপর নির্ভর করবে।[৩৪]

* ছায়াতে কাজ করা এড়াতে চেষ্টা করতে হবে :

ছায়ার মধ্যে কাজ করা কষ্টকর। ছায়াচ্ছন্ন জায়গায় তাকানো অসুবিধা কারণ চোখ সব সময় চারপাশের আলোর সাথেই খাপ-খাওয়াতে চেষ্টা করে। কাজের টেবিলের উপর গাঢ় ছায়া পড়ার ফলে কাজের মান খারাপ হয়, উৎপাদনশীলতা কমে, চোখের ক্লান্তি হয়, এমনকি মাঝে মাঝে দুর্ঘটনাও ঘটে। বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কাজের মাধ্যমে ছায়ার পরিমান কমানো যায়। যেমন–

– জানালা এবং স্কাইলাইটের সংখ্যা বাড়ানো এবং তা পরিষ্কার করা;

– হালকা রঙের অমসৃণ ছাদ, দেয়াল এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার;

– ছায়ামুক্ত এলাকায় মেশিন এবং আসবাবপত্র সাজানো;

– একসাথে রাখা কয়েকটি মেশিনের জন্য পৃথক বাতির ব্যবস্থা;

– গ্লেয়ার কমানোর জন্য প্রতিফলিত আলোর ব্যবস্থা করা;

– এককভাবে বেশিমাত্রায় আলোকিত ও জায়গার ব্যবহার কমানো;

– আলোক রশ্মিও গতিপথের উন্নয়ন।[৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

* নিয়মমাফিক রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে:

যে কোন নতুন এবং ভাল আলোকন ব্যবস্থার জন্য নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি অত্যন্ত প্রয়োজন। কেননা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কয়েক মাসের মধ্যেই আলোকন প্রারম্ভিক অবস্থার চেয়ে অর্ধেক হয়ে যেতে পারে।[৩৬]

জরিপে দেখা যায়, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম আলোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নেই। ৭০% প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র কাজ করার স্থান আলোকিতকরণ করা হয়। মাত্র ৩০% প্রতিষ্ঠানের সকল স্থানে আলোকিতকরণ করা হয়।

অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানসমূহের জানালায় কোন কাঁচ নেই। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের জানালায় কাঁচ রয়েছে সেগুলো ভিতর ও বাইরের দিক দিয়ে পরিষ্কার রাখা হয় না। কাঁচগুলোতে প্রচুর ময়লা জমে আছে। খাদ্য ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প সমূহের বেশির ভাগ অংশেই আবছা অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ বিরাজ করছে। ৪০% প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণ আলো চোখে পড়ার কারণে চোখে অস্পষ্ট মনে হয় বলে জানিয়েছেন। প্রতিষ্ঠানসমূহে পর্যাপ্ত সংখ্যক বাল্ব, টিউবলাইট ইত্যাদির ব্যবস্থা নেই। যেখানে শ্রমিকগণ আলোর খুব কাছে কাজ করছে সেখানে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানেই চাকনাযুক্ত বাল্বের কোন ব্যবস্থা নেই। প্রতিষ্ঠানগুলি এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যে, দিনের বেলায়ও এগুলো আবছা অন্ধকার থাকে।[৩৭]

অতিরিক্ত ভিড় ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে, কোন কারখানার কাজের ঘরে যেন এরূপ অতিরিক্ত ভিড় না হয় যাতে কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে।[৩৮] আইনে আরো বলা হয়েছে, একটি কারখানা ঘরে কতজন শ্রমিক কাজ করবে তা বিজ্ঞপ্তি আকারে ঘরের সম্মুখে ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ একজন প্রধান পরিদর্শক দিতে পারেন।[৩৯]

কিন্তু বাস্তবে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানেই শ্রমিকদের প্রচন্ড ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে। একটি ঘরে কতজন শ্রমিক কাজ করবে তা বিজ্ঞপ্তি আকারে ঝুলিয়ে রাখার বিধান থাকলেও বাস্তবে তা দেখা যায়নি।[৪০]

পিকদানি ঃ শ্রমিকগণ যাতে যেখানে সেখানে থুথু ফেলে কারখানার পরিবেশ নষ্ট করতে না পারে সে জন্য কারখানা আইনে বিধান রয়েছে। কারখানা আইনে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক কারখানায় সুবিধাজনক স্থানে যথেষ্ট সংখ্যক পিকদানি রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং ঐ

Dhaka University Institutional Repository

সকল পিকদানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে রাখতে হবে।[৪১] আইনে আরো বলা হয়েছে, কারখানা প্রাঙ্গনে কোন ব্যক্তি পিকদানি ছাড়া অন্য কোথাও থুথু ফেলতে পারবে না।[৪২] বাস্তবে দেখা যায়, কোন প্রতিষ্ঠানেই থুথু ফেলার জন্য কোন পিকদানি নেই। শ্রমিক-কর্মীগণ প্রতিষ্ঠানের ভিতরে বাইরে যেখানে খুশি সেখানেই থুথু ফেলে থাকে।[৪৩]

৬.৪ শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কিত বিচ্যুতি

কর্মস্থল সম্পর্কিত কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারটি প্রায় সময় অবহেলিত হয়। অত্যাবশ্যক বন্দোবস্তগুলি যেমন পানি, পায়খানা, হাত-মুখ ধোয়ার জায়গা ইত্যাদি শুধু যে আইনের কারণেই তৈরি করা দরকার তা নয়। এর ফলে শ্রমিকদের শ্রান্তি কমবে এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। তবে মনে রাখতে হবে এধরনের ব্যবস্থাদির মান যেন যথাযথ হয়, নতুবা স্বাস্থ্যের উন্নতির পরিবর্তে তা স্বাস্থ্য হানির কারণ হবে।[৪৪]

খাবার পানি ঃ যে কোন ধরনের কর্মক্ষেত্রেই খাবার পানি অত্যাবশ্যক। বিশেষ করে গরম আবহাওয়ায় একেকজন শ্রমিকের শরীর থেকে প্রতি শিফটে কয়েক লিটার পানি নির্গত হতে পারে। খাবার পানির ব্যবস্থা না রাখলে শ্রমিকরা তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে পানি শূন্য হয়ে পড়ে। এর ফলে ক্লান্তি বাড়ে এবং উৎপাদনশীলতা কমে যায়। শ্রমিকদের কাজের জায়গার কাছাকাছি পানির ব্যবস্থা রাখতে পারলে যাতায়াতে কম সময় নষ্ট হয়। দূষণের সম্ভাবনা থাকলে খারাপ পানি ভালভাবে সিদ্ধ করে, ছেঁকে বা পরিশোধিত করে ব্যবহার করতে হবে। কোন নূতন উৎসের পানি খাওয়ার জন্য ব্যবহার করার আগে তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। বিশুদ্ধ পানির নিশ্চয়তা থাকলেই শুধু কলের পানি ব্যবহার করা উচিত। বিশুদ্ধ পানি – ও কোন পাত্রে অনেকদিন রাখলে খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। তাই পাত্রের পানি মাঝে মাঝে বদল করা উচিত। খাবার পানি সব সময় ঠান্ডা রাখা দরকার। পানি ঠান্ডা রাখার যন্ত্র কেনা যদি সম্ভব না হয়, তবে কারখানার সবচেয়ে ঠান্ডা জায়গায় পানির পাত্রটি রাখতে হবে। কিন্তু কোন অবস্থায়ই তা রোদে বা গরম জায়গায় রাখা যাবে না। পানি রাখার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। যেমন, পানির ব্যাগ বা বোতল, খাওয়ার পানির পাত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যায়।[৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

কারখানা আইনে বলা হয়েছে, প্রত্যেক কারখানায় নিযুক্ত সকল শ্রমিকের জন্য সুবিধাজনক স্থানে খাবার পানির পর্যাপ্ত সরবরাহের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।[৪৬] যে সকল স্থানে পানি রাখা হবে সে সকল স্থানে অধিকাংশ শ্রমিকের বোধগম্য ভাষায় 'খাবার পানি' কথাটি লিখে রাখতে হবে এবং ঐ সকল স্থানের ২০ ফুটের ভিতরে কোন ধোয়া-মোছার জায়গা, প্রস্রাব বা পায়খানা থাকতে পারবে না।[৪৭] আইনে আরও বলা হয়েছে, যে সকল কারখানায় ২৫০ জনের বেশি শ্রমিক সাধারণতঃ নিয়োজিত থাকে সেখানে গরমকালে খাবার পানি ঠান্ডা রাখার এবং সরবরাহ করবার কার্যকরী উপায় থাকতে হবে।[৪৮]

বাস্তবে দেখা যায় মাত্র ১০% প্রতিষ্ঠানে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা আছে। ৯০% প্রতিষ্ঠানে বিশুদ্ধ পানির কোন ব্যবস্থা নেই। খাবার পানি রাখার মত নির্দিষ্ট কোন স্থান নেই। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে 'খাবার পানি' কথাটি কোন জায়গায় লিখা নেই। ৯০% প্রতিষ্ঠানে গরমকালে পানি ঠান্ডা রাখার কোন ব্যবস্থা নেই। মাত্র ১০% প্রতিষ্ঠানে ফ্রিজের ব্যবস্থা আছে।[৪৯]

পায়খানা ও প্রস্রাবখানা ঃ কারখানা আইনে পায়খানা ও প্রস্রাবখানা সম্পর্কে বিভিন্ন বিধান রাখা হয়েছে। যেমন, শ্রমিকদের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক পায়খানা ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা থাকতে হবে, পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের জন্য বেড়াবিশিষ্ট পৃথক পায়খানা ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা থাকতে হবে। উক্ত পায়খানা ও প্রস্রাবখানাসমূহে পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং সেগুলো উপযুক্ত জীবাণুনাশক ঔষধের সাহায্যে সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্য সম্মতভাবে রাখতে হবে।[৫০] বাস্তবে দেখা যায়, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই পায়খানা ও প্রস্রাবখানা নেই। যেসব প্রতিষ্ঠানে রয়েছে সেখানেও মহিলাদের জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া পায়খানা সমূহে আলো ও বাতাসের ব্যবস্থা নেই এবং সেগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত নয়। সেগুলোতে চুনকাম এবং রং করা হয় না।[৫১]

ধৌতকরণের সুযোগ-সুবিধা ঃ কারখানা আইন অনুযায়ী কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের ধোয়া ও গোসলের জন্য প্রত্যেক কারখানায় পানির পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাছাড়া নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য পৃথক ও পর্দাবিশিষ্ট গোসলখানার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং এই সকল গোসলখানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সহজগম্য হতে হবে।[৫২]

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবে দেখা যায়, বেশির ভাগ ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের ধোয়া ও গোসলের জন্য পানির পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। ৩০% প্রতিষ্ঠানে বাথরুমে ধোয়া ও গোসলের ব্যবস্থা আছে। ৭০% প্রতিষ্ঠানে ধোয়া ও গোসলের কোন ব্যবস্থা নেই। নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য পৃথক ও পর্দা বিশিষ্ট গোসলখানার কোন ব্যবস্থা নেই।[৫৩]

প্রাথমিক চিকিৎসার উপকরণসমূহ ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে, প্রত্যেক কারখানায় কর্মরত প্রতি ১৫০ জন শ্রমিকের চিকিৎসার জন্য কমপক্ষে একটি প্রাথমিক চিকিৎসার উপকরণসহ বাক্স বা আলমারীর ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রাথমিক চিকিৎসার উপকরণসহ বাক্স প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে।[৫৪]

দুর্ঘটনা যে কোন সময়ই ঘটতে পারে। ফেটে যাওয়া, থেতলে যাওয়া, চোখের আঘাত, পুড়ে যাওয়া, বিষক্রিয়া, বৈদ্যুতিক শক ইত্যাদি নানা রকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। যেসব কারখানা আপাতদৃষ্টিতে নিরাপদ মনে হয় সেখানেও মানুষ অনেক ধরনের আঘাত (যেমন উপর থেকে পড়ে যাওয়া) পেতে পারে। তাই প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানেই একটি ভালভাবে সজ্জিত চিকিৎসা বাক্স থাকা উচিত এবং সকল সময়ই অন্তত একজন লোক উপস্থিত থাকা প্রয়োজন যে জরুরি অবস্থায় কি করণীয় তা জানে। প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সগুলি এমন জায়গায় রাখা উচিত যেন তা সহজেই চোখে পড়ে এবং প্রয়োজনের সময় হাতের নাগালে পাওয়া যায়। একটি সাধারণ চিকিৎসা বাক্সে নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলি থাকা দরকার।

– জীবানুমুক্ত ব্যান্ডেজ, প্রেসার ব্যান্ডেজ, গজ কাপড় এবং সুতলী। এই জিনিসগুলি আলাদা আলাদা মোড়কে গুছিয়ে একটা প্যাকেটে রাখতে হবে। ছোট, মাঝারি এবং বড় সব সাইজের জিনিস রাখা দরকার। পর্যাপ্ত পরিমান, বিশেষ করে যে সাইজগুলি সব সময় ব্যবহার করা হয়, প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রী মজুদ রাখা দরকার। ছোট-খাটো কাঁটা বা পোড়াও অবহেলা করা উচিত না। আঁঠাযুক্ত টেপ এবং প্লাষ্টারও মজুত রাখতে হবে।

– কাটা জায়গা পরিষ্কার করার জন্য তুলা;

– কাঁচি, চিমটা এবং সেফটিপিন;

– চোখ ধোয়ার বন্দোবস্ত এবং ওষুধ;

তৎক্ষণাৎ ব্যবহার্য জীবানুনাশক ওষুধ (তরল ও ক্রীম);

Dhaka University Institutional Repository

– সহজপ্রাপ্য কিছু ওষুধ, যেমন– এসপিরিন, এন্টাসিড, প্যারাসিটামল ইত্যাদি;

– প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে একটি বই।[৫৫]

প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়, তবে তার ব্যবস্থা মোটেই কষ্টকর নয়। এই কাজের দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মচারীদের নাম ও অবস্থান (সম্ভব হলে টেলিফোন নং) সবার দেখার জন্য নোটিশ বোর্ডে টাংগিয়ে রাখতে হবে। যে সব শ্রমিক দূরে বা নির্জন এলাকায় কাজ করেন তাদের সকলকেই প্রাথমিক চিকিৎসার শিক্ষা দেওয়া দরকার, কারণ জরুরী মুহূর্তে তাদের সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। কোন জরুরি অবস্থায় কিভাবে সাহায্য পাওয়া যায় সে বিষয়ে সব শ্রমিকদেরই অবগত থাকা দরকার। যে সব ছোট প্রতিষ্ঠানের নিজেদের ভাল ব্যবস্থা নেই, তাদের নিকটস্থ ক্লিনিক বা হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ রাখা উচিত, যেন, প্রয়োজনে সহজেই সাহায্য পাওয়া যায় (সম্ভব হলে আধঘন্টার মধ্যেই) ক্লিনিক বা হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখা উচিত। একটি স্ট্রেচারের ব্যবস্থা রাখা ভাল।[৫৬]

বাস্তবে দেখা যায়, ৬০% প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই ২৫% প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের খরচে বাইরে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। মাত্র ১৫% প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স থাকলেও তাতে পর্যাপ্ত সরঞ্জামাদি নেই।[৫৭]

বিশ্রাম বা আশ্রয় ইত্যাদি ঃ দিনের শুরুতে যখন শ্রমিকরা কাজ শুরু করেন তখন সাধারণতঃ তারা সজাগ ও বেশি উৎপাদনক্ষম থাকেন। তারপর আস্তে আস্তে তাদের কাজের গতি কমতে থাকে। ক্লান্তি একেবারে আসে না, বরং তা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং একসময় তা অবসাদে পরিনত হয়। একেবারেই শ্রান্ত হয়ে যাওয়ার আগে যদি শ্রমিকরা বিশ্রাম নিতে পারেন তবে সহজেই তারা কর্মোদ্যম ফিরে পান। বিশ্রামের জন্য একটি ভাল জায়গা শ্রমিকদের ক্লান্তি দূর করতে অনেক সাহায্য করে। বিশ্রাম গ্রহণের সময় তারা শুধু বসেই থাকে না। বরং পরবর্তী কাজের জন্যও নিজেকে প্রস্তুত করে। কোলাহলপূর্ণ, দূষিত অথবা অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন কর্মস্থল থেকে বের হয়ে এলে সহজে তাদের অবসাদ দূর হয়। তাই বিশ্রামের জায়গাটি কর্মস্থল থেকে দূরে এবং নিরিবিলি হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারখানার বাইরে একটু ছাউনি দিয়েই প্রয়োজনীয় ছায়ার ব্যবস্থা করা যায়, বিশেষ করে, কাছাকাছি গাছপালা থাকলে এবং জায়গাটি খোলামেলা হলে পরিবেশটি আরো ভাল হবে। খুব উজ্জ্বল আলো এড়ানোর চেষ্টা করতে হবে,

Dhaka University Institutional Repository

কারন শরীরের সাথে চোখেরও বিশ্রাম প্রয়োজন। একটি টেবিল, কিছু চেয়ার এবং শুয়ে বিশ্রাম নেওয়ার মত একটি জায়গার ব্যবস্থা করতে পারলে খুবই ভাল হয়।[৫৮] কারখানা আইনে বলা হয়েছে, যে কারখানায় সাধারণতঃ ১০০ জনের অধিক শ্রমিক কর্মরত আছে সেখানে তাদের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত আশ্রয় বা বিশ্রামের ঘরের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এই সকল আশ্রয় বা বিশ্রাম ঘরের জন্য যথেষ্ট আলো ও বাতাস চলাচলের বন্দোবস্ত রাখতে হবে এবং ঘরটি যাতে ঠান্ডা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।[৫৯]

বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, কোন ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানেই শ্রমিকদের জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা নেই। তবে ২০% প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকলেও তাতে বিশ্রাম নেওয়ার মত পরিবেশ নেই। কেননা সেগুলোতে পর্যাপ্ত আলো ও বাতাসের ব্যবস্থা নেই। একটি বিশ্রামগারে যে সমস্ত দ্রব্য ও পরিবেশ থাকা দরকার সেগুলোতে তা নেই।[৬০]

ভাল শ্রমিকদের আকৃষ্ট করা এবং ধরে রাখার জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ঃ

ভাল শ্রমিক পাওয়ার জন্য ছোট প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রায়ই বেগ পেতে হয়। কেননা প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজ শিখিয়ে নেবার সাথে সাথেই তারা বেশি বেতনে বড় প্রতিষ্ঠানে কাজ নিয়ে চলে যায়। অবশ্য এটা তাদের ন্যায্য অধিকার। বেতনের দিক দিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কঠিন হতে পারে, কিন্তু শ্রমিকদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দিকে নজর দিয়েও কম খরচে অনেক ফল পাওয়া যায়। যেমন-

– পোষাক ঃ কাজের পরিবেশের কারণে যদি শ্রমিকদের উর্দি, বিশেষ ধরনের পোষাক (প্রয়োজন স্থলে জুতা) ইত্যাদি প্রয়োজন হয়, তবে তা নিয়োগকারীকেই সরবরাহ করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের সীলসহ পরিপাটি সুন্দর পোষাকের দ্বারা শ্রমিকদের আনুগত্য বাড়ানো যেতে পারে। বিশেষভাবে ডিজাইন করা পোষাকের সাহায্যে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কমানো যায়। ঢিলা কাপড় মেশিনে আটকে অনেক দুর্ঘটনা ঘটার খবর শোনা যায়। ব্যক্তিগত দ্রব্যাদির জন্য নিরাপদ জায়গায় (আলমারী) এবং বদলানোর জায়গার ব্যবস্থা থাকলে শ্রমিকরা পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকতে পারেন এবং মালামাল চুরি বা হারানোর ভয় থেকে নিশ্চিত থাকেন।[৬১]

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবে দেখা যায়, ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রমিকদের জন্য কোন বিশেষ পোষাকের ব্যবস্থা নেই। শ্রমিকদের পোষাক বদলানোর জায়গা এবং ব্যক্তিগত দ্রব্যাদি রাখার জন্য কোন জায়গা নেই।[৬২]

– খাওয়ার জায়গা ঃ অনেক ছোট প্রতিষ্ঠানেই ক্যান্টিনের ব্যবস্থা করার সংগতি থাকে না। তাদের জন্য প্রথম করণীয় হবে বাড়ি থেকে আনা অথবা কেনা খাদ্যদ্রব্য খাওয়ার জন্য একটি জায়গার ব্যবস্থা করা। এই জায়গায় চা বা অন্যান্য পানীয় তৈরি করার এবং খাবার গরম করার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতে পারে। ধুলাবালি ও অন্যান্য ময়লা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঘরটি কারখানা থেকে দূরে থাকা উচিত এবং যথাসম্ভব আরামদায়ক হওয়া উচিত।[৬৩] কারখানা আইনে বলা হয়েছে, যে কারখানায় সাধারণতঃ ১০০ জনের অধিক শ্রমিক কর্মরত আছে সেখানে খাবার পানির ব্যবস্থাসহ একটি খাবার ঘরের ব্যবস্থা থাকতে হবে।[৬৪]

বাস্তবে দেখা যায়, ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে শ্রমিকদের জন্য কোন খাবার ঘরের ব্যবস্থা নেই।[৬৫]

– ক্যান্টিন ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে, কোন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ২৫০ জনের বেশি হলে সরকার একটি উপযুক্ত ক্যান্টিনের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দিয়ে নিয়মাবলী রচনা করতে পারেন।[৬৬]

কয়েকটি কারণে দুপুরে খাওয়ার জন্য শ্রমিকদের বাড়ি পাঠানো সম্ভব হয় না। যেমন–দূরত্ব, যাতায়াতখরচ, যানবাহনের অভাব, অথবা সময়ের স্বল্পতা। অত্যধিক দাম, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নিম্নমানের খাবার ইত্যাদি কারণে কারখানার আশেপাশের খাবারের দোকানগুলি শ্রমিকদের জন্য অনুপযোগী হতে পারে। শিল্প মালিকেরা এক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন যার মধ্যে কোন কোনটি বেশ কম খরচে হতে পারে। যেমন–

– খাবার রান্না করা বা আগে থেকে রান্না করা খাবারের জন্য ক্যান্টিন;
– প্যাকেট করা খাবার ও পানীয় পরিবেশনের জন্য দাঁড়িয়ে খাওয়ার জায়গা;
– গরম খাবার বিক্রি করার জন্য ফেরিওয়ালাদের দাঁড়াবার জায়গা (ছায়াচ্ছন্ন জায়গা, পানির ব্যবস্থা, আবর্জনা ফেলার ঝুড়ি ইত্যাদিসহ)।
– কয়েকজন মালিক একত্রে একটি রেস্তোঁরা চালু করতে পারেন।
–কাছাকাছি কোন রেস্তোঁরা বা ক্যান্টিন এর সাথে স্থায়ী ব্যবস্থা করা[৬৭]

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবে দেখা যায়, কোন প্রতিষ্ঠানেই শ্রমিকদের জন্য ক্যান্টিনের ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া ক্যান্টিনের কোন বিকল্প ব্যবস্থাও নেই।[৬৮]

– স্বাস্থ্যব্যবস্থা ঃ প্রতিটি প্রতিষ্ঠান তাদের শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারেন। এ পর্যায়ে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা যায়। যেমন–

- অসুস্থ বা আঘাতপ্রাপ্ত শ্রমিকদের স্থানীয় হাসপাতালে বা ক্লিনিকে চিকিৎসা করানো যায়।
- একজন ডাক্তার বা নার্সের নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা।
- এলাকায় একটি সুচিকিৎসালয় গড়ে তুলতে সাহায্য করা যায়।
- শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য সাহায্য বা ধার দেয়া যায়।
- শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যবীমার ব্যবস্থা করা যায় বা তাদের এই ধরনের বীমায় প্রিমিয়াম দিয়ে সাহায্য করা যায়।[৬৯]

বাস্তবে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভাল নয়। মাত্র ২৫% প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের খরচে বাইরে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। ১৫% প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স আছে। কিন্তু ৬০% প্রতিষ্ঠানেই চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই।[৭০]

– যানবাহনের ব্যবস্থা ঃ কর্মক্ষেত্রে যাওয়া এবং সেখান থেকে ফেরা শ্রমিকদের জন্য কঠিন সময় সাপেক্ষ এবং কষ্টকর হতে পারে। তার ফলে শ্রমিকরা ক্লান্তি, উদ্বেগ এবং আর্থিক চাপের শিকার হন। তাতে শ্রমিকদের অনুপস্থিতি বাড়ে, প্রায়ই চাকরি ছেড়ে চলে যায় এবং প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়। তাই এ পর্যায়ে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নিতে পারে–

- শ্রমিকদের যাতায়াতভাতার ব্যবস্থা করা যায়;
- স্থানীয় পরিবহন সংস্থাগুলোর সাথে বিশেষ ব্যবস্থা করা;
- অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে একত্রে পরিবহন ব্যবস্থা করেও খরচ কমানো যায়;
- প্রতিষ্ঠানের সবাই মিলে একটি পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়;
- যে সমস্ত শ্রমিক তাদের নিজস্ব সাইকেল বা মোটর সাইকেল কিনতে ইচ্ছুক তাদের জন্য সহজ শর্তে প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।[৭১]

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবে দেখা যায়, ক্ষুদশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিকদের জন্য কোন যানবাহনের ব্যবস্থা নেই এবং অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থাও নেই।

– বিনোদনমূলক ব্যবস্থা ঃ অবসর সময়ে অনেক শ্রমিক খেলাধুলা বা অন্যান্য বিনোদনমূলক কাজ করতে পছন্দ করেন। এসব কাজে যেমন আনন্দ পাওয়া যায় তেমনি শরীর এবং মনও ভাল থাকে। বিনোদনমূলক ব্যবস্থা থাকার একটি ভাল ফল হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের ভিতরে সবার মধ্যে সদ্ভাব গড়ে ওঠা। মালিক বা ম্যানেজাররা এই ধরনের খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ করলে শ্রমিকদের সাথে তাদের মনোভাব আদান-প্রদান হয় এবং সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। এভাবে সবার মনোবল গড়ে উঠলে অনুপস্থিতি কমে যায়, শ্রমিকেরা অনেকদিন থেকে চাকরিতে লেগে থাকে এবং নতুন লোক নেওয়ার সময়ও সুবিধা হয়। বিনোদনমূলক ব্যবস্থাদি প্রায়ই খুব সস্তা হয়ে থাকে। সাধারণ খেলাধুলার সরঞ্জাম, যেমন–বল, গোল, নেট অথবা ক্যারাম জাতীয় বোর্ডের খেলা এবং ম্যাগাজিন দিয়েই কাজ চলতে পারে।[৭৩] বাস্তবে দেখা যায়, প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানেই বিনোদনমূলক কোন ব্যবস্থা নেই। হাজারীবাগ এলাকার ১টি বেকারী প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা হিসেবে একটি টিভি ও একটি দাবা খেলার সরঞ্জাম দেখা গিয়েছে।[৭৪]

– শিশুদের দেখাশোনা করার ব্যবস্থা ঃ অনেক মালিকই অনুভব করেন যে, মহিলা কর্মীরা কাজে বিশ্বস্ত এবং পারদর্শী, কিন্তু শিশু সন্তানদের নিয়ে তাদের বেশ অসুবিধায় পড়তে হয় এবং এ বিষয়ে তাদের সাহায্যেরও প্রয়োজন হয়। একটি পরিষ্কার ঘর ও সম্ভব হলে সাথে কিছু খোলা জায়গাই অনেক উপকারে আসে। কিছু সাধারণ আসবাব এবং খেলনা থাকলে ভাল হয়। কাছাকাছি রান্নার জায়গা বা ক্যান্টিন থাকলে শিশুদের খাওয়ানোর সমস্যার সমাধান হয়। শিশুদের কখনোই কারখানার মেঝেতে খেলতে দেওয়া উচিত নয়। এসব জায়গায় বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি থাকতে পারে। তাছাড়া ধুলা এবং বিভিন্ন প্রকারের আঁশ ছোট শিশুদের জন্য খুবই মারাত্মক। অনেক সময় এমন লোক পাওয়া যায় যারা অল্প পারিশ্রমিকে শিশুদের দেখাশুনা করতে পারেন অথবা তাদের মায়েরাই পালা করে এই কাজটি করতে পারেন। যেসব মা ছোট শিশুদের স্তন্য দান করছেন তাদেরকে অবশ্যই বিরতির সময় সন্তানদের কাছে যাবার সুযোগ দিতে হবে।[৭৫]

কারখানা আইনে বলা হয়েছে যে, যে কারখানায় ৫০ জনের অধিক নারী শ্রমিক সাধারণভাবে নিয়োজিত সেখানে ঐ সকল শ্রমিকদের ৬ বৎসরের নীচে বয়স এমন বাচ্চাদের ব্যবহারের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য উপযুক্ত ঘরের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বাচ্চাদের ব্যবহারের জন্য ঘরগুলিতে পর্যাপ্ত আলো ও বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থায় রাখতে হবে। বাচ্চাদের পরিচর্যার জন্য এই সকল গৃহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অথবা অভিজ্ঞ মহিলাদের তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে।[৭৬]

বাস্তবে দেখা যায়, মহিলা শ্রমিকদের বাচ্চাদের জন্য কোন ঘর বা জায়গা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নেই।[৭৭]

– কারখানা দিবস ঃ অনেক প্রতিষ্ঠানেই সব শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সবার জন্য বছরে একটি বিশেষ দিন থাকে। প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য বাড়ানোর জন্য এটি অত্যন্ত কার্যকরী উপায়। এই দিনে ভাল খাবার, খেলাধুলা, পুরস্কার বিতরণী এবং ভাল পরিবেশের ব্যবস্থা করতে পারলে এই চেষ্টা সহজেই সাফল্য মন্ডিত হতে পারে।[৭৮] বাস্তবে দেখা যায়, ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে সকল শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য বিশেষ কোন দিন পালন করা হয় না।[৭৯]

৬.৫ নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিচ্যুতি

কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের উপযুক্ত নিরাপত্তা বিধান করা কারখানা মালিকের কর্তব্য। কেননা কারখানায় উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকলে উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটে।

আগুনের ক্ষেত্রে সাবধানতা ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে, কারখানায় আগুন লাগলে প্রত্যেক শ্রমিক যাতে সহজেই কারখানার বাইরে আসতে পারে তার জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকতে হবে। কোন ব্যক্তি কারখানা ঘরে অবস্থানের সময় উক্ত ঘরের দরজা তালাবদ্ধ বা অন্যভাবে শক্ত করে বন্ধ রাখা যাবে না। দরজা এমনভাবে আটকিয়ে রাখতে হবে, যাতে ভিতর হতে কোন লোক অতি সহজে এবং দ্রুততার সাথে তা খুলতে পারে। অধিক সংখ্যক শ্রমিকের বোধগম্য ভাষায় বড়বড় লাল হরফে বা অন্য কোন কার্যকরী উপায়ে বা প্রতীকের সাহায্যে কারখানা গৃহের প্রত্যেকটি জানালা, দরজা বা অন্য কোন গমন পথে নির্দেশনামা থাকতে হবে, যাতে আগুন লাগলে নিরাপদে বাইরে আসা যায়। কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকগণ কারখানায় আগুন লাগলে যাতে বুঝতে পারে সেজন্য শ্রবণযোগ্য সাবধানতা সংকেতের ব্যবস্থা প্রত্যেক কারখানায় থাকতে হবে। আগুন লাগলে কারখানার প্রত্যেক ঘর হতে শ্রমিকদের বের হওয়ার জন্য মুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

যাতায়াতের পথ থাকতে হবে। প্রত্যেক কারখানায় যেখানে নীচের তলা ছাড়া অন্য কোন তলায় দশজনের অধিক শ্রমিক সাধারণতঃ নিয়োজিত থাকে অথবা যেখানে বিস্ফোরক বা দাহ্য পদার্থ ব্যবহৃত হয় বা স্তপিকৃত রাখা হয়, সেখানে আগুন লাগলে শ্রমিকগণ যাতে পালাতে পারে সেজন্য শ্রমিকদের আত্মরক্ষার নিয়মকানুন এবং প্রয়োজনে এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।[৮০]

বাস্তবে দেখা যায়, আগুনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সাবধানতার বিধান কারখানা আইনে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে কোন প্রতিষ্ঠানেই অগ্নিকাণ্ডজনিত সাবধানতা অবলম্বনের কোন ব্যবস্থা নেই। যেমন– কারখানাগৃহ হতে অতি সহজে বের হয়ে আসার মত মুক্ত যাতায়াতের পথ নেই। কারখানায় আগুন লাগলে নিরাপদে বেরিয়ে আসার জন্য কারখানা গৃহের প্রত্যেকটি জানালা, দরজা বা অন্য কোন গমনপথে প্রতীকের সাহায্যে কোন নির্দেশনামা নেই। কারখানায় আগুন লাগলে শ্রমিকরা যাতে বুঝতে পারে এমন কোন শ্রবণযোগ্য সাবধানতা সঙ্কেতের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নেই। আগুন লাগলে শ্রমিকদের আত্মরক্ষার নিয়ম-কানুন সম্বলিত কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নেই।

কারখানা বিধিমালায় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি থাকার কথা বলা হলেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি নেই। কারখানা বিধিমালায় ধুমপান ও উন্মুক্ত আলোর উপর বিধিনিষেধ সম্বলিত বিজ্ঞপ্তি থাকার কথা বলা হলেও প্রতিষ্ঠানগুলিতে তা দেখা যায়নি।[৮১]

যন্ত্রপাতি বেড়া দেওয়া বা ঘেরিয়ে রাখা ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে প্রত্যেক কারখানায় শ্রমিকদের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমন, চলমান যন্ত্রাংশ, ঘূর্ণায়মান চাকা, লেদমেশিনের সম্মুখ অংশ, যন্ত্রপাতির বিপদজ্জনক অংশ প্রভৃতি বেড়া দিয়ে রাখার কথা বলা হয়েছে।[৮২] বাস্তবে দেখা যায়, কোন প্রতিষ্ঠানেই যন্ত্রপাতিসমূহ বেড়া দিয়ে রাখা হয় না।[৮৩]

চলমান যন্ত্রে বা যন্ত্রের নিকটে কাজ করা ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে, যন্ত্রপাতি চলমান অবস্থায় পরীক্ষা করার প্রয়োজন হলে, অথবা পরীক্ষার প্রেক্ষিতে চলমান অবস্থায় পরিষ্কার করা, তৈল দেওয়া, কোন অংশ মেরামত করা বা বেল্ট লাগানোর প্রয়োজন হলে কেবলমাত্র আটসাট পোষাক পরিহিত বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুরুষ শ্রমিক দ্বারাই তা করাতে হবে। কোন মহিলা বা শিশুকে এ সকল কাজে নিয়োজিত করা যাবে না।[৮৪] বাস্তবে দেখা যায়, চলমান যন্ত্রে বা

Dhaka University Institutional Repository

যন্ত্রের নিকটে কাজ করার সময় শ্রমিকগণ নির্দিষ্ট কোন পোষাক পরে না এবং এ ব্যাপারে তাদের কোনরূপ প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয় না।[৮৫]

অতিরিক্ত ভার ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে, কারখানার কোন ব্যক্তিকে এমন কোন ভার উত্তোলন, বহন বা সরানোর কাজে নিযুক্ত করা যাবে না যাতে আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকে। যেমন- কারখানা বিধিমালায় বলা হয়েছে, প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ভারবহন করবে সর্বোচ্চ ৬৮ পাউন্ড এবং কিশোর বহন করবে ৫০ পাউন্ড।[৮৬] কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, খাদ্য শিল্পে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ সর্বোচ্চ ৮০ পাউন্ড পর্যন্ত ভারবহন করে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক ঠেলাগাড়ির সাহায্যে ১০০০ পাউন্ড পর্যন্ত ভার বহন করে থাকে। অন্যদিকে কিশোর শ্রমিক ভারবহন করে সর্বোচ্চ ২০০ পাউন্ড।[৮৭]

চোখের নিরাপত্তা ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে, কোন কারখানায় উৎপাদন প্রক্রিয়া চলাকালীন শ্রমিকদের চোখে যাতে কনা যাবতীয় কোন কিছু পড়ে বা অত্যাধিক আলো বা তাপের কারণে চোখের ক্ষতি হতে পারে এমন অবস্থায়, চোখের নিরাপত্তার জন্য কার্যকর পর্দা বা গগল্‌সের ব্যবস্থা রাখার জন্য সরকার নির্দেশ দিতে পারেন।[৮৮]

কিন্তু বাস্তবে প্রতিষ্ঠানসমূহে চোখের নিরাপত্তার জন্য কোন কার্যকর পর্দা বা গগল্‌সের ব্যবস্থা দেখা যায়নি।[৮৯]

৬.৬ অন্যান্য বিচ্যুতি

সাপ্তাহিক ও দৈনিক কাজের সময় ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে, কোন প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকের সাপ্তাহিক কাজের সময় ৪৮ ঘন্টার বেশি হবে না এবং এই সময়ের অধিক তাকে কাজ করতে বলা যাবে না।[৯০] আইনে আরও বলা হয়েছে, কোন প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিককে দৈনিক ৯ ঘন্টার বেশি কাজ করতে বলা যাবে না বা দেয়া যাবে না।[৯১]

বাস্তবে দেখা যায়, ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৯০ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ হয়ে থাকে। ৫% প্রতিষ্ঠানে দৈনিক ১৪ ঘন্টা পর্যন্ত হয়, ১০% প্রতিষ্ঠানে দৈনিক ১৩ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ হয় ২০% প্রতিষ্ঠানে দৈনিক ১২ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ হয়, ২০% প্রতিষ্ঠানে দৈনিক ১০ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ হয়, ১৫% প্রতিষ্ঠানে দৈনিক ৯ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ হয়, ২৫% প্রতিষ্ঠানে দৈনিক ৮ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ হয় এবং ৫% প্রতিষ্ঠানে দৈনিক ৬ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ হয়।[৯২]

Dhaka University Institutional Repository

কারখানা আইনে বলা হয়েছে, কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিককে দৈনিক ৫ ঘন্টার বেশি কাজে নিয়োজিত করা বা কাজের জন্য অনুমতি দেয়া যাবে না।[৯৩]

বাস্তবে দেখা যায়, কিশোর ও শিশু শ্রমিকদেরকে প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকদের অনুরূপ সময় পর্যন্ত কাজ করানো হয়।[৯৪]

ক্ষতিপূরণমূলক সাপ্তাহিক ছুটি ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে যে, যদি কোন শ্রমিক সাপ্তাহিক ছুটি না পেয়ে থাকে, তবে সে সেই মাসেই অথবা পরবর্তী দুটি মাসের মধ্যে সমপরিমান দুটি ক্ষতিপূরণমূলক সাপ্তাহিক ছুটি হিসেবে ভোগ করতে পারবে।[৯৫]

বাস্তবে দেখা যায়, ৮০% প্রতিষ্ঠানে ক্ষতিপূরণমূলক ছুটি পাওয়া যায় না।[৯৬]

অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য অতিরিক্ত ভাতা ঃ

কারখানা আইনে বলা হয়েছে, যদি একজন প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক দৈনিক ৯ ঘন্টার উর্ধ্বে বা বা সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টার অধিক কোন কারখানায় কাজ করে তবে তাকে স্বাভাবিক মজুরীর দ্বিগুণ হারে অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য অতিরিক্ত ভাতা প্রদান করতে হবে।[৯৭] বাস্তবে দেখা যায়, ৩৫% প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য অতিরিক্ত ভাতা প্রদান করে না।[৯৮]

নিযুক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে, যে শিশুর বয়স ১৪ বৎসরের কম তাকে কোন কারখানায় কাজের জন্য নিযুক্ত করা বা কোন কাজ করতে অনুমতি দেয়া যাবে না।[৯৯] বাস্তবে দেখা যায় ৮ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ করা হয়।[১০০]

প্রতীক চিহ্ন বহন ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে যে, প্রত্যয়নকারী চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত দৈহিক সক্ষমতা সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র ব্যতিরেকে একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু শ্রমিককে কোন কারখানায় নিয়োগ করা যাবে না। কারখানা ব্যবস্থাপকের নিকট উক্ত প্রত্যয়নপত্র দাখিল করা এবং তার প্রমাণস্বরূপ কাজের সময় প্রতীক চিহ্ন বহন করা অপ্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু শ্রমিকের জন্য বাধতামূলক।[১০১]

বাস্তবে দেখা যায়, অপ্রাপ্তবয়স্ক বা কিশোর ও শিশু শ্রমিক নিয়োগ করার সময় প্রত্যয়নকারী চিকিৎসক কর্তৃক দৈনিক সক্ষমতা সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র নেওয়া হয় না।[১০২]

শিশু শ্রমিকদের রেজিস্টার ঃ কারখানা আইনে বলা হয়েছে যে, যে সকল কারখানায় শিশুরা কাজে নিযুক্ত আছে সেই সকল কারখানায় ব্যবস্থাপককে শিশু শ্রমিকদের একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে।[১০৩]

বাস্তবে প্রতিষ্ঠান সমূহে শিশু শ্রমিকদের কোন রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হয় না।[১০৪]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. জে, ই, থারম্যান ও অন্যান্য, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রডাকটিভিটি সার্ভিসেস উইং, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন, ইউএনডিপি/আইএলও প্রকল্প বিজিডি ৮৬/০০৮, পৃ. ১৫।

২. ঐ, পৃ. ১৭ ও ১৮।

৩. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

৪. জে, ই, থারম্যান ও অন্যান্য, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রডাকটিভিটি সার্ভিসেস উইং, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন, ইউএনডিপি/আইএলও প্রকল্প বিজিডি ৮৬/০০৮, পৃ. ২০-২৮।

৫. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

৬. জে, ই, থারম্যান ও অন্যান্য, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রডাকটিভিটি সার্ভিসেস উইং, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন, ইউএনডিপি/আইএলও প্রকল্প বিজিডি ৮৬/০০৮, পৃ. ৩৯।

৭. ঐ, পৃ. ৩৯।

৮. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

৯. জে, ই, থারম্যান ও অন্যান্য, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রডাকটিভিটি সার্ভিসেস উইং, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন, ইউএনডিপি/আইএলও প্রকল্প বিজিডি ৮৬/০০৮, পৃ. ৪০।

১০. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

১১. জে, ই, থারম্যান ও অন্যান্য, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রডাকটিভিটি সার্ভিসেস উইং, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন, ইউএনডিপি/আইএলও প্রকল্প বিজিডি ৮৬/০০৮, পৃ.৪৩।

১২. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

১৩. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা–১২(১)।

১৪. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. জে, ই, থারম্যান ও অন্যান্য, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রডাকটিভিটি সার্ভিসেস উইং, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন, ইউএনডিপি/আইএলও প্রকল্প বিজিডি ৮৬/০০৮, পৃ. ৯৫।

১৬. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা–১৪(১)।

১৭. জে, ই, থারম্যান ও অন্যান্য, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রডাকটিভিটি সার্ভিসেস উইং, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন, ইউএনডিপি/আইএলও প্রকল্প বিজিডি ৮৬/০০৮, পৃ. ৯৫।

১৮. ঐ, পৃ. ৯৫।

১৯. ঐ, পৃ. ৯৬।

২০. ঐ, পৃ. ৯৬।

২১. ঐ, পৃ. ৯৭।

২২. ঐ, পৃ. ৯৯, ১০০ ও ১০১।

২৩. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

২৪. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা–১৮(১)।

২৫. ঐ, ধারা–১৮(২)।

২৬. ঐ, উপধারা-৩।

২৭. জে, ই, থারম্যান ও অন্যান্য, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রডাকটিভিটি সার্ভিসেস উইং, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন, ইউএনডিপি/আইএলও প্রকল্প বিজিডি ৮৬/০০৮, পৃ. ৬৭।

২৮. ঐ, পৃ. ৬৮।

২৯. ঐ, পৃ. ৬৮।

৩০. ঐ, পৃ. ৬৮।

৩১. ঐ, পৃ. ৬৯।

৩২. ঐ, পৃ. ৬৯।

৩৩. ঐ, পৃ. ৬৯।

৩৪. ঐ, পৃ. ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

৩৫. ঐ, পৃ. ৭৪ ও ৭৫।

৩৬. ঐ, পৃ. ৭৬।

৩৭. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকার ও সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

৩৮. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-১৭(১)।

৩৯. ঐ, ধারা–১৭(২)।

৪০. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

৪১. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-২১(১)।

৪২. ঐ, ধারা-২৩(৩)।

৪৩. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে।

৪৪. জে, ই, থারম্যান ও অন্যান্য, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রডাকটিভিটি সার্ভিসেস উইং, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন, ইউএনডিপি/আইএলও প্রকল্প বিজিডি ৮৬/০০৮, পৃ. ৮১।

৪৫. ঐ, পৃ. ৮১ ও ৮২।

৪৬. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-১৯(১)।

৪৭. ঐ, ধারা-১৯(২)।

৪৮. ঐ, ধারা-১৯(৩)।

৪৯. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ।

৫০. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা–২০(১)।

৫১. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

৫২. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৪৩।

৫৩. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

৫৪. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৪৪।

৫৫. জে, ই, থারম্যান ও অন্যান্য, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রডাকটিভিটি সার্ভিসেস উইং, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন, ইউএনডিপি/আইএলও প্রকল্প বিজিডি ৮৬/০০৮, পৃ. ৮৫।

৫৬. ঐ, পৃ. ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

৫৭. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

৫৮. জে, ই, থারম্যান ও অন্যান্য, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রডাকটিভিটি সার্ভিসেস উইং, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন, ইউএনডিপি/আইএলও প্রকল্প বিজিডি ৮৬/০০৮, পৃ. ৮৬।

৫৯. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৪৬।

৬০. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

৬১. জে, ই, থারম্যান ও অন্যান্য, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রডাকটিভিটি সার্ভিসেস উইং, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন, ইউএনডিপি/আইএলও প্রকল্প বিজিডি ৮৬/০০৮, পৃ. ৮৬ ও ৮৭।

৬২. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

৬৩. জে ই থারম্যান ও অন্যান্য, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রডাকটিভিটি সার্ভিসেস উইং, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন, ইউএনডিপি/আইএলও প্রকল্প বিজিডি ৮৬/০০৮, পৃ. ৮৮।

৬৪. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৪৬।

৬৫. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

৬৬. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৪৫।

৬৭. জে, ই, থারম্যান ও অন্যান্য, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রডাকটিভিটি সার্ভিসেস উইং, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন, ইউএনডিপি/আইএলও প্রকল্প বিজিডি ৮৬/০০৮, পৃ. ৮৮।

৬৮. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

৬৯. জে, ই, থারম্যান ও অন্যান্য, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রডাকটিভিটি সার্ভিসেস উইং, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন, ইউএনডিপি/আইএলও প্রকল্প বিজিডি ৮৬/০০৮, পৃ. ৯০।

৭০. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ।

Dhaka University Institutional Repository

৭১. জে ই থারম্যান ও অন্যান্য, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রডাকটিভিটি সার্ভিসেস উইং, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন, ইউএনডিপি/আইএলও প্রকল্প বিজিডি ৮৬/০০৮, পৃ. ৯২।

৭২. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ।

৭৩. জে, ই, থারম্যান ও অন্যান্য, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রডাকটিভিটি সার্ভিসেস উইং, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন, ইউএনডিপি/আইএলও প্রকল্প বিজিডি ৮৬/০০৮, পৃ. ৯২ ও ৯৩।

৭৪. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

৭৫. জে, ই, থারম্যান ও অন্যান্য, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রডাকটিভিটি সার্ভিসেস উইং, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন, ইউএনডিপি/আইএলও প্রকল্প বিজিডি ৮৬/০০৮, পৃ. ৯৩।

৭৬. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৪৭।

৭৭. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

৭৮. জে, ই, থারম্যান ও অন্যান্য, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রডাকটিভিটি সার্ভিসেস উইং, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন, ইউএনডিপি/আইএলও প্রকল্প বিজিডি ৮৬/০০৮, পৃ. ৯৩।

৭৯. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।

৮০. কারখানা আইন, ৯১৬৫, ধারা-২২।

৮১. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

৮২. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-২৩।

৮৩. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

৮৪. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-২২।

৮৫. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

৮৬. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৩৬।

৮৭. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

৮৮. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা–৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

৮৯. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

৯০. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৫০(১)।

৯১. ঐ, ধারা-৫৩।

৯২. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।

৯৩. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৭০(১)।

৯৪. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।

৯৫. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৫২।

৯৬. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।

৯৭. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৫৮।

৯৮. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।

৯৯. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৬৬।

১০০. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ।

১০১. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৬৭।

১০২. কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।

১০৩. কারখানা আইন, ১৯৬৫, ধারা-৭২।

১০৪. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৭

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৭

কার্যপরিবেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাবলী ও সেগুলো নিরসনে প্রস্তাবিত সুপারিশ

৭.১ সমস্যা ও সুপারিশ

বর্তমান জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যপরিবেশ উন্নত নয়। এক্ষেত্রে কিছু সমস্যা রয়েছে। বর্তমান জরিপের ফলাফলের আলোকে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যপরিবেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ ও সেগুলো নিরসনে কতিপয় সুপারিশ পেশ করা হলো:

* ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যপরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যা উদ্ভাবন করতে গিয়ে কলকারখানা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকারী পরিদপ্তরের কিছু সমস্যা দৃষ্টি গোচর হয়। যেমন, ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনের জন্য যে পরিমান পরিদর্শকের প্রয়োজন হয় সে পরিমান পরিদর্শকের অভাব রয়েছে। যারা রয়েছেন তাদের নিরাপত্তার জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে যাতায়াতের জন্য তাদেরকে পরিবহনের কোন সুবিধা দেয়া হয় না। পরিদর্শকের পরিদর্শন কার্যে ব্যবহারের পর্যাপ্ত মেশিনারী সামগ্রীর অভাব রয়েছে। যোগ্যতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ ও পরিকল্পনাবিদের অভাব রয়েছে। তাছাড়া পরিদর্শক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। প্রশিক্ষণ নেয়া হলেও তা বাস্তবায়নের পরিবেশ নেই। সর্বোপরি পরিদর্শন কার্যে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাব রয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে পরিদর্শন পরিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেন, 'কোন কোন পরিদর্শক মোটা টাকা হাতে পেলে পরিদর্শন না করেই চলে আসে।'[১]

Dhaka University Institutional Repository

কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তরকে ঢেলে সাজাতে হবে। সেখানে পর্যাপ্ত পরিমানে পরিকল্পনাবিদ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। তাদেরকে পরিদর্শন কাজে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিতে হবে, যাতায়াতের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে। পরিদর্শকের ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত মেশিনারী সামগ্রীর ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শুধুমাত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলেই চলবে না, সাথে সাথে তা বাস্তবায়নের পরিবেশও সৃষ্টি করতে হবে। পরিদর্শন কার্যে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতে হবে। পরিদর্শকগণ পরিদর্শনকার্য সঠিকভাবে করেন কিনা সরকারকে এ ব্যাপারে নজরদারির ব্যবস্থা করতে হবে এবং কোন পরিদর্শক দুর্নীতির মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যে ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করলে সে জন্য শাস্তির বিধান করতে হবে।

* ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত নয়। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে অবহিত থাকলেও সম্ভাব্য হয়রানির ভয়ে তারা তাদের সমস্যা পরিদর্শন কর্তৃপক্ষকে জানায় না।[২]

পরিদর্শন কর্তৃপক্ষকে তাদের প্রদত্ত সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। এর ফলে ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে ভয়-ভীতিমুক্ত হয়ে তাদের সমস্যাসমূহ পরিদর্শন পরিদপ্তরে জানাতে পারবে। এরপর পরিদর্শকগণ তাদেরকে কার্যপরিবেশ উন্নয়নে বিভিন্নভাবে পরামর্শ প্রদান করতে পারবেন।

* বাংলাদেশের সকল শিল্পের জন্য অভিন্ন আইন বিদ্যমান। অর্থাৎ ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য কোন আলাদা আইন করা হয়নি। বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র সকল প্রতিষ্ঠানেই অভিন্ন আইন ঢালাওভাবে প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। তাই ক্ষুদ্রশিল্পের সকল ক্ষেত্রে কারখানা আইনের সকল ধারা প্রয়োগ করা সম্ভব না হওয়ায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের পক্ষে এই আইন সম্পূর্ণরূপে মেনে চলা সম্ভব হচ্ছে না।[৩]

* বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য আলাদা আইন প্রনয়ন করতে হবে। অর্থাৎ কারখানা আইনের ব্যাপক সংশোধন করতে হবে। এ লক্ষ্যে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ জরিপ করে এটির প্রকৃত সংজ্ঞা প্রদান করতে হবে। সংশোধিত আইনে পরিদর্শনের বিষয়বস্তুর মান পূর্বনির্ধারিত হতে হবে। এ সংক্রান্ত আইনের ধারাসমূহ সুস্পষ্ট হতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

* বাংলাদেশের ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের বেশির ভাগই অনেক পুরোনো। তাই এগুলোর কার্যপরিবেশ উন্নত করতে হলে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানের আমূল পরিবর্তন সাধন করতে হবে, যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কার্যপরিবেশ উন্নত করতে হলে অনেক অর্থের প্রয়োজন। ক্ষুদ্রশিল্পের মালিকগণের সেই সামর্থ্য নেই। কিংবা এ জন্য কোন উৎস থেকে তারা ঋণ পায় না এবং সরকার থেকেও কোন সাহায্য আসে না।[৪] এনজিও কাঠামোর আওতায় বর্তমানে ক্ষুদ্র শিল্পখাতে ঋণদান কার্যক্রমের বিস্তৃতি খুবই সীমিত। ক্ষুদ্রশিল্প খাতের মালিকেরা সুসংগঠিত নয়, যেমনভাবে সুসংগঠিত বড় শিল্পের মালিক এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। ফলে ঋণ নিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে সম্মিলিতভাবে দরকষাকষির ক্ষমতা নেই, যেমনটি অন্যদের রয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্প খাতে আশানুরূপ হারে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি না পাওয়ার এটিও একটি বড় কারণ। ঋণদান প্রক্রিয়া নানা জটিলতায় আক্রান্ত, যে জটিলতা মোকাবেলা করা ক্ষুদ্র শিল্পখাতের মালিকদের জন্য অধিক কঠিন কাজ। ঋণের জন্য নির্ধারিত আবেদন ফর্মপূরণ করা থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাগজপত্র সরবরাহ পর্যন্ত যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা মোকাবেলা করা ক্ষুদ্রশিল্পের মালিকদের জন্য বিরাট সমস্যা। ক্ষুদ্র শিল্পের অধিকাংশ মালিকই হচ্ছেন দরিদ্র শ্রেণীর এবং তাদের লেখাপড়াও খুব একটা নেই। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্রশিল্পের মালিকগণ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের নিজেদের সৃষ্ট আমলাতান্ত্রিক ভোগান্তির শিকার হন। ফলে তারা মাঝপথে ঋণগ্রহণের চেষ্টা থেকে বিরত থাকেন। ক্ষুদ্র শিল্পের অধিকাংশ মালিক ঋণগ্রহণের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক উৎস সম্পর্কে অবগত নন।[৫]

ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবর্তন তথা কার্যপরিবেশের উন্নয়ন সাধন করার জন্য সরকার ও বিভিন্ন সংস্থাকে ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সহজশর্তে ঋণ প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাংক, বিসিক এবং এনজিও প্রতিষ্ঠানসমূহকে অগ্রণীভূমিকা পালন করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রশিল্পের মালিকদের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের মধ্যে ক্ষমতায়ন ঘটাতে হবে। এ লক্ষ্যে তাদেরকে বিভিন্ন সূত্রে ও ইস্যুতে সংগঠিত হতে হবে এবং ন্যায়সঙ্গত ইস্যুতে এ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারকদের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে। ঋণদানের প্রক্রিয়াগত জটিলতা ও এর সাথে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা দূর করতে হবে। পত্র-পত্রিকা, বেতার-টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের ঋণকার্যক্রম বিষয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার চালাতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

* ঝুঁকি গ্রহণে সক্ষম মেধাবী, পরিশ্রমী ও দক্ষ শিল্পমালিকদের সংখ্যা বাংলাদেশে পর্যাপ্ত নয়। অধিকাংশ ক্ষুদ্র শিল্পমালিকেরই একটি লক্ষ্য থাকে স্বল্প পরিশ্রমে তড়িঘড়ি করে উচ্চ হারে মুনাফা অর্জন, যা সহজ নয়। মেধাবী, পরিশ্রমী ও দক্ষ শিল্পমালিক না থাকায় কার্যপরিবেশের উন্নয়ন হচ্ছে না।[৬] ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ কিভাবে প্রতিষ্ঠান ডিজাইন করতে হবে সে সম্পর্কে অজ্ঞ। কিভাবে কার্যপরিবেশ উন্নত করে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যায় সে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই। অনেক প্রতিষ্ঠানই বিশেষজ্ঞ যোগাড় করতে পারে না।[৭]

দেশে একটি আত্মনিবেদিত শিক্ষিত, মেধাবী, পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাবান মালিক শ্রেণী গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের মালিকদের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বিসিক, বিভিন্ন ব্যাংক, এনজিও তথা সরকারকে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে।

* ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মীগণ কার্যপরিবেশ সম্পর্কে সচেতন নয়। শ্রমিক নেতাগণের জ্ঞানের অভাবের কারণে তারা প্রকৃত বিষয় না বুঝে বৃথা আন্দোলন করে। তারা প্রকৃতপক্ষে কার্যপরিবেশ উন্নয়নের জন্য আন্দোলন করেনা।[৮]

শ্রমিক-কর্মীদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে হবে এবং কার্যপরিবেশ সম্পর্কে তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এ লক্ষ্যে তাদের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদেরকে বুঝাতে হবে যে, প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হলে তাদেরও উন্নতি হবে। কার্যপরিবেশ উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন সাধন করতে হয়। আর এই পরিবর্তন আনার সবচেয়ে ভাল উপায় হল কয়েকজন শ্রমিকের একটি দলের উপর দায়িত্বটি দিয়ে দেওয়া। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে যুক্ত থাকলে তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষা হবে বলে নিশ্চিত থাকবে। তারা নিজেদের পরামর্শ দিতে পারবে এবং তার সঠিক বাস্তবায়নের দায়িত্ব নেবে। ফলে তারা যে শুধু সহযোগিতা করবে তা নয়, কাজটির অগ্রগতিও তারা লক্ষ্য করবে এবং প্রয়োজনমত সমন্বয় সাধনে আগ্রহী হবে। এতে শ্রমিকদের আনুগত্য ও উদ্দীপনা বাড়বে।

* ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিবেশ উন্নয়নের অন্যতম সমস্যা হল পর্যাপ্ত স্থানের অভাব। জরিপে দেখা যায়, কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জায়গা নেই। তারা ভাড়া করা বাড়িতে প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে। এর ফলে কার্যপরিবেশের উন্নয়ন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৌশলীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ডিজাইন করে অল্পস্থানের ভিতর কার্যপরিবেশের উন্নয়ন সাধন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারকে পরিদর্শন পরিদপ্তরের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করতে হবে। তাছাড়া যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ভাড়া করা বাড়িতে প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন তারা যাতে প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গা কিনতে পারে এ ব্যাপারে সরকারকে আর্থিক সাহায্য দিতে হবে। বিসিক, বিভিন্ন ব্যাংক, বিভিন্ন এনজিওকে সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে এ সহযোগিতা দিতে হবে।

* কার্যপরিবেশ কাঙ্খিত মাত্রায় না হওয়ার আরেকটি কারণ হলো ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকদের উদাসীনতা। তারা মনে করে কার্যপরিবেশের উন্নয়ন সাধন করা মানে অর্থের অপচয় করা। তাদের এই মনোভাবের ফলে পরোক্ষভাবে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে।[১০]

স্বল্প খরচে কার্যপরিবেশের উন্নয়ন সাধন করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যায় এই ধারণাটি ক্ষুদ্র শিল্পের মালিকদের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারকে পরিদর্শন পরিদপ্তর, বিসিক ও অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারণা চালাতে হবে। প্রয়োজনে বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এই প্রচারকার্য চালাতে হবে।

৭.২ উপসংহার

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রশিল্পের একটি স্বতন্ত্র ভূমিকা রয়েছে। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্রশিল্পের অনেক সুবিধাজনক দিক থাকে। পৃথিবীর সব শিল্পোন্নত দেশই তাদের শিল্পায়নের প্রাথমিক স্তরে ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়নকেই শিল্পোন্নয়নের অন্যতম কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে প্রথমে ক্ষুদ্রশিল্পকেই গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা এটি বৃহৎ শিল্পের একটি নির্ভরযোগ্য ভিত্তি গড়ে তুলবার জন্য যেমনি প্রয়োজন, তেমনি শিল্পের গতিশীল বিকাশকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে অগ্র ও পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পের সমর্থন নিশ্চিত করার জন্যও অপরিহার্য। আর এই ক্ষুদ্রশিল্পের উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে উপযুক্ত কার্যপরিবেশের উপর। প্রতিষ্ঠানে কাঙ্খিত মাত্রার কার্যপরিবেশ বিদ্যমান না থাকলে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়, কার্যে অসন্তুষ্টি দেখা দেয়। কার্যসন্তুষ্টির অভাবে শ্রমিক-কর্মীগণের অসহযোগিতার ফলস্বরূপ প্রতিষ্ঠান লোকসানসহ নানারূপ বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়। এতে করে প্রতিষ্ঠান প্রগতিশীল সাফল্য লাভ করতে পারে

Dhaka University Institutional Repository

না। কথায় বলে, স্বাস্থ্যই সম্পদ। কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠান যদি নোংরা আবর্জনাযুক্ত থাকে, বায়ুচলাচল ও তাপমাত্রা স্বাভাবিক না থাকে, ধুলাবালি জমে থাকে, প্রতিষ্ঠান থেকে যদি ধোয়া নির্গত হয়, অতিরিক্ত ভিড় পরিলক্ষিত হয়, প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক আলোর ব্যবস্থাব ত্রুটি থাকে, বিশুদ্ধ ও ঠাণ্ডা খাবার পানি না থাকে, নিজস্ব পায়খানা ও প্রস্রাবখানা না থাকে কিংবা থাকলেও অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন থাকে, যেখানে সেখানে যদি থুথু ফেলা হয়–এসব পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকলে শ্রমিক-কর্মীগণ অসুস্থ হয়ে পড়বে। ফলে তারা উৎপাদনকার্য চালিয়ে যেতে পারবে না অথবা পারলেও টার্গেট অনুযায়ী সাফল্য লাভ করতে পারবে না। অন্যদিকে কারখানার নিরাপত্তার বিষয়, যেমন-অগ্নিকান্ড, বিপদজনক যন্ত্রপাতি, অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর ও শিশুকে বিপজদজনক যন্ত্রে নিয়োগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে যদি পরিকল্পিত ব্যবস্থা না নেয়া হয় তাহলে শ্রমিক-কর্মীদের জীবনে মারাত্মক ঝুঁকির সৃষ্টি হবে। তাছাড়া শ্রমিকদের কল্যাণ সম্পর্কিত ব্যবস্থা যেমন– ধৌতকরণের সুযোগ-সুবিধা, প্রাথমিক চিকিৎসার উপকরণ, ক্যান্টিন, আশ্রয়, শিশুদের জন্য কামরা ইত্যাদির পরিকল্পিত ব্যবস্থা যদি না থাকে, শ্রমিক-কর্মীরা যদি যুক্তিসঙ্গত ছুটি, কাজের বিরতি না পায় সেক্ষেত্রে তারা সন্তুষ্ট থাকবে না।

ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ জরিপ করে দেখা যায়–প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থা ভাল নয়। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই নোংরা এবং দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশ বিরাজ করছে। বায়ুচলাচল ও তাপমাত্রা সন্তোষজনক নয়। প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক আলোর ব্যবস্থা খুবই খারাপ। কোন প্রতিষ্ঠানেই থুথু ফেলার জন্য পিকদানি নেই। প্রতিষ্ঠানগুলিতে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানেই বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা নেই, কিংবা গরমকালে ঠান্ডা পানির ব্যবস্থা নেই। অনেক প্রতিষ্ঠানেই পায়খানা ও প্রস্রাবখানা নেই, শ্রমিকদের ধোয়া ও গোসলের কোন ব্যবস্থা নেই। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানেই ফাস্ট এইড বক্স নেই, এবং প্রাথমিক চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত নেই। শ্রমিকেরা খেতে পারে এমন কোন ক্যান্টিন বা খাবার ঘর প্রতিষ্ঠানগুলিতে নেই। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানেই শ্রমিকদের চিত্তবিনোদনের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণেও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ উদাসীন। যেমন-অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কিত বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সাবধানতা অবলম্বন করে না। তাদের অনেকের মতে, বিশেষজ্ঞের অভাবে তারা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি রাখে না। চলমান যন্ত্রের নিকটে কাজ করার সময় শ্রমিক নির্দিষ্ট কোন পোষাক পরে না এবং এ ব্যাপারে তাদের কোন প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠানগুলিতে বেআইনিভাবে বেশি ওজনের ভারবহনের কাজ হয়ে থাকে। চোখের নিরাপত্তার জন্য কোন গগল্‌সের ব্যবস্থা নেই। অন্যান্য বিষয় যেমন–শ্রমিকগণকে দৈনিক ও প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট সময়ের বেশি কাজ করানো হয়। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানেই ক্ষতিপূরণমূলক সাপ্তাহিক ছুটি পাওয়া যায় না। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত সময় কাজ করলে অতিরিক্ত ভাতা প্রদান করে না। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা কিশোর ও শিশু শ্রমিক নিয়োগ করার সময় প্রত্যয়নকারী চিকিৎসক কর্তৃক দৈহিক সক্ষমতা সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র নেওয়া হয় না। শ্রমিকদের কোন রেজিস্টার প্রতিষ্ঠানসমূহ সংরক্ষণ করে না। অর্থাৎ বলা যায়–ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে কাঙ্ক্ষিত মাত্রার কার্যপরিবেশের অভাব রয়েছে। জরিপকালে কার্যপরিবেশ কাঙ্ক্ষিতমাত্রার না হওয়ার কারণস্বরূপ বিভিন্ন সমস্যা দৃষ্টি গোচর হয়। এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের কলকারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তরের কিছু সমস্যা যেমন–পরিদর্শকের স্বল্পতা, পরিদর্শকের নিরাপত্তার অভাব, পরিদর্শকদের জন্য যানবাহনের অভাব, পর্যাপ্ত মেশিনারীর অভাব, যোগ্যতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ ও পরিকল্পনাবিদের অভাব, পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণের অভাব ও পরিদর্শকদের কর্তব্যে অবহেলা। এছাড়াও অন্যান্য সমস্যার মধ্যে রয়েছে– ক্ষুদ্র শিল্পের মালিকগণ পরিদর্শন পরিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত না থাকা, আইনগত ত্রুটি, অর্থের অভাব, ঋণ না পাওয়া, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেধাবী ও দক্ষ মালিকের অভাব, কার্যপরিবেশ সম্পর্কে মালিক ও শ্রমিক-কর্মীগণের সচেতনতার অভাব, পর্যাপ্ত স্থানের অভাব, মালিকদের উদাসীনতা ও ভুলধারণা ইত্যাদি। উল্লেখিত সমস্যাসমূহ সমাধান করতে হলে প্রথমেই পরিদর্শন পরিদপ্তরকে ঢেলে সাজিয়ে এর সমস্যাসমূহের সমাধান করতে হবে, ক্ষুদ্র শিল্পের মালিকগণ যাতে পরিদর্শন পরিদপ্তরের কার্যক্রম জানতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, আইনগত ত্রুটি দূর করতে হবে, প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিক ও শ্রমিক-কর্মীগণকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ও তাদের মধ্যে কার্যপরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, মালিকগণ যাতে নিজের জায়গায় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারে সেজন্য তাদের আর্থিক সহায়তা দিতে হবে, মালিকদের উদাসীনতা ও কার্যপরিবেশ সম্পর্কিত ভুলধারণা দূর করতে হবে। সর্বোপরি সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যপরিবেশ উন্নয়নে এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত বিবিধ সমস্যার এককালীন সমাধান সম্ভব নয়; স্তরে স্তরে এসব উন্নয়ন করতে হবে। তবুও উল্লেখিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করলে আশা করা যায়

Dhaka University Institutional Repository

যে, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের কার্যপরিবেশ অনেকাংশেই উন্নত হবে। বর্তমান গবেষণাটি ঢাকা শহরের বিভিন্ন থানার ২০টি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে করা হয়েছে। ঢাকা শহর ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাই কার্যপরিবেশসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ব্যাপকভিত্তিক গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে এই শিল্পের বিভিন্ন সমস্যার চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

অষ্টাদশ শতকের পূর্বে জাপানের অর্থনীতিও বর্তমান বাংলাদেশের মতই ছিল। তারা প্রথমে ক্ষুদ্রশিল্পের উপর, তারপর মাঝারি শিল্প এবং সর্বশেষে বৃহৎ শিল্পের উপর গুরুত্ব প্রদান করে।

১৮৬৮ সালে সম্রাট মেইজীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার আগেই জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুরু হয়। ১৮৭৬ সালের পরে মাত্র ৪৫ বৎসরের মধ্যেই একটি বিচ্ছিন্ন কৃষিনির্ভর সমাজ হতে জাপান এরূপ একটি শক্তিশালী শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে উন্নীত হতে সক্ষম হয়েছিল, যার ফলে সারা বিশ্বে তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা হয়ে উঠেছিল অপ্রত্যাশিত। পশ্চিমে কয়েক শতাব্দীর প্রচেষ্টায় যে উন্নতি সম্ভব হয়েছে সে উন্নতি সম্রাট মেইজীর শাসনাধীনে জাপান মাত্র কয়েক দশকে সম্ভব করে তোলার চেষ্টায় ব্রতী হয়– আধুনিক শিল্প, আধুনিক রাজনৈতিক ভাবধারা এবং আধুনিক ধাঁচের সমাজ ও আধুনিক জাতি গঠনে।[১১]

শিল্পের উন্নতি বিধানের জন্য মেইজী সরকার ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে। যেমন– পাশ্চাত্যের অনুকরণে বিদেশ থেকে অভিজ্ঞ লোক আনয়ন করা হয়, জাপানী শিক্ষিত তরুণদেরকে বিদেশে প্রেরণ করা হয়, শিল্প সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা প্রদানের জন্য দেশে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।[১২]

জাপানের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রশিল্প এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র শিল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র শিল্পের এরূপ ভূমিকার জন্য অনেকে জাপানকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের দেশ বলে অভিহিত করে থাকে। ১৯৬০ সালের হিসাব অনুযায়ী জাপানের সর্বমোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৯৯.৪% ক্ষুদ্র শিল্প। সে বছর মোট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৩.২২ মিলিয়ন এবং ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা ছিল ৩.২০ মিলিয়ন। বর্তমানে জাপানে ভারী শিল্প থাকা সত্ত্বেও ক্ষুদ্রশিল্পের গুরুত্ব হ্রাস পায়নি।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে বাংলাদেশে দ্রুতগতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মত বেকারত্ব প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশে শ্রমিকের অভাব নেই, অভাব আছে দক্ষ কারিগরের, বৈদেশিক মুদ্রার, মূলধনের ও সাংগঠনিক দক্ষতার। তাই মনে হয়, এদেশে মানব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্যে ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়ন প্রয়োজন। যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে এখানে কৃষির পরিপূরক হিসেবে ক্ষুদ্রশিল্পের বিকাশ সাধন করা যায়।[১৪]

কালের পরিক্রমায় জাপান আজ অর্থনৈতিক পরাশক্তি। তাই জাপানের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশকেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রথমে ক্ষুদ্রশিল্পের উপর জোর দিতে হবে এবং পরবর্তীতে অন্যান্য বৃহদাকার শিল্পের উপর দৃষ্টি দিতে হবে। আর এভাবেই শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সহজ হবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।

২. ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।

৩. কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।

৪. ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।

৫. বিসিকের জনৈক উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।

৬. ঐ।

৭. ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।

৮. কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।

৯. ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকার ও সরাসরি পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে।

১০. ক্ষুদ্র শিল্পের কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।

১১. এম, এ, মান্নান, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, রয়েল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৩১৫।

১২. ঐ, পৃ. ৩১৮।

১৩. ঐ, পৃ. ৩৩১ ও ৩৩২।

১৪. ঐ, পৃ. ৩৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট–১

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নপত্র

১. প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

২. প্রতিষ্ঠার সন ঃ

৩. উত্তরদাতার নাম ঃ

৪. পদবী ঃ

৫. বয়স ঃ

৬. অভিজ্ঞতা ঃ

৭. কারখানায় মোট শ্রমিকের সংখ্যা কত?

প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ	জন
প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা	জন
কিশোর	জন
শিশু	জন

৮. কারখানার ছাদ ও টিনের অবস্থা কিরূপ?

৯. ময়লা ও আবর্জনা কিভাবে অপসারণ করা হয়?

১০. শ্রমিকের কাজ করার কামরা কিভাবে ধৌত করা হয়?

১১. চুনকাম ও রং করা হয় কি? চুনকাম ও রং করার পূর্বে কিভাবে ধোয়া হয়?

১২. কারখানার দেয়ালের অবস্থা কিরূপ?

Dhaka University Institutional Repository

১৩. কারখানার কোন্ অংশ আলোকিতকরণ করা হয়?

১৪. আলো চোখে পড়ার কারণে কি প্রতিক্রিয়া হয়?

১৫. কারখানায় প্রাকৃতিক আলোর ব্যবস্থা কিরূপ?

১৬. কারখানায় অপ্রাকৃতিক আলোর ব্যবস্থা কিরূপ?

১৭. শ্রমিক-কর্মীদের জন্য কিরূপ পানির ব্যবস্থা রয়েছে?

১৮. প্রতিদিন কি পরিমান পানি সরবরাহ করা হয়?

১৯. খাবার পানি উপযুক্ত পাত্রে সংরক্ষণ করা হলে কতদিন পর পর পানি ভরা হয়?

২০. গরমকালে পানি ঠান্ডা রাখার কি ব্যবস্থা আছে?

২১. কারখানায় প্রাকৃতিক বাতাসের অবস্থা কিরূপ?

২২. কারখানায় অপ্রাকৃতিক বাতাসের অবস্থা কিরূপ?

২৩. কারখানায় পায়খানার সংখ্যা কত?

২৪. কারখানায় প্রস্রাবখানার সংখ্যা কত?

২৫. মহিলাদের জন্য আলাদা পায়খানা ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা আছে কি?

২৬. কারখানার পায়খানার অবস্থা কিরূপ?

২৭. পায়খানা ও প্রস্রাবখানায় কখন চুনকাম ও রং করা হয়?

২৮. পায়খানা কি দ্বারা পরিষ্কার করা হয়?

২৯. থুথু ফেলার জন্য কি ব্যবস্থা রয়েছে?

৩০. কারখানায় আগুন লাগলে শ্রমিকগণ যাতে শুনতে পারেন তার জন্য কি ব্যবস্থা রয়েছে?

৩১. আগুন লাগলে কারখানা থেকে বের হওয়ার জন্য অতিরিক্ত বর্হিগমন পথ আছে কি?

৩২. কারখানায় অগ্নিকান্ড ঘটলে পানি সরবরাহের কি ব্যবস্থা রয়েছে?

৩৩. অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি কয়টি আছে?

৩৪. কারখানার সম্ভাব্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রত্যেক যন্ত্রপাতির বিভিন্ন অংশসমূহ ঘেরিয়ে রাখা হলে কোন অংশসমূহ ঘেরিয়ে রাখা হয়?

৩৫. চলমান যন্ত্রের নিকট কারা কাজ করে থাকে?

৩৬. বিপদজনক যন্ত্রে কারা কাজ করে থাকে?

Dhaka University Institutional Repository

৩৭. খুচরা যন্ত্রাংশসমূহ কিভাবে সংরক্ষণ করা হয়?

৩৮. কারখানায় কত পাউন্ড পর্যন্ত ভারবহনের কাজ হয়ে থাকে?

৩৯. বিপদজনক স্থানে প্রবেশের প্রয়োজন হলে কিভাবে প্রবেশ করা হয়?

৪০. কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের ধোয়া ও গোসলের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা রয়েছে?

৪১. মহিলা শ্রমিকদের ধৌতকরণের জন্য কি কি ব্যবস্থা রয়েছে?

৪২. শ্রমিকদের জন্য আশ্রয় বা বিশ্রামের ঘর ও বাসস্থান থাকলে সেখানে কি ব্যবস্থা আছে?

৪৩. শ্রমিকদের চিত্তবিনোদনের জন্য কি কি ব্যবস্থা আছে?

৪৪. কারখানায় শ্রমিকদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কি কি সরঞ্জামাদি রয়েছে?

৪৫. ক্যান্টিনের ব্যবস্থা থাকলে সেখানে কি কি আছে?

৪৬. কারখানায় দৈনিক কত ঘণ্টা কাজ হয়ে থাকে?

৪৭. সপ্তাহে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক কতদিন ছুটি ভোগ করেন?

৪৮. কোন প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক সাপ্তাহিক ছুটি না পেলে অন্য সময়ে কোন ক্ষতিপূরণমূলক ছুটি পান কি?

৪৯. প্রতি সপ্তাহে কয়দিন ক্ষতিপূরণমূলক অবকাশ থাকে?

৫০. প্রতিষ্ঠানে কয়টি পালায় কাজ হয়?

৫১. প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক অতিরিক্ত সময় কাজ করলে তাদের কিভাবে মূল্যায়ন করা হয়?

৫২. কারখানায় মহিলা শ্রমিক দৈনিক কতঘণ্টা কাজ করেন?

৫৩. কারখানায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকগণ দৈনিক কতঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করে থাকে?

৫৪. অপ্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকগণকে কিভাবে নিয়োগ করা হয়?

৫৫. কত বছর বয়স্ক শিশুকে কারখানায় কাজে নিযুক্ত করা হয়?

৫৬. প্রাপ্ত বয়স্ক, কিশোর ও শিশু শ্রমিকগণকে কিভাবে মজুরী দেওয়া হয়?

৫৭. শিশু শ্রমিক কয়টি পালায় কাজ করে থাকে?

৫৮. শিশু শ্রমিকদের প্রতিপালায় সময়সীমা সর্বোচ্চ কত ঘণ্টা?

৫৯. কোন শিশু একই দিনে একাধিক কারখানায় কাজ করে কি?

৬০. শিশু শ্রমিকদের জন্য রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হয় কি?

৬১. কারখানায় সকল শ্রমিকদের ছুটি সংক্রান্ত কি কি নিয়মকানুন পালন করা হয়?

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট–২

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

Anastasi, A., Fields of Applied Psychology (**2nd Ed.**). **McGraw Hill Kogakusha Ltd., Tokyo, 1979.**

Arshad and Rahman, History of Indo-Pakistan, (**1st Ed.**), **Ideal Publications, Dacca, 1962.**

Ahmed, M.U., Privatisation and Development: An Overview of the Fundamental Issues, **Social Science Review,** Vol. X. No. 1, Dhaka Bangladesh, June 1993.

Acking, C.A., and Kuller, R., The Perception of an Interior as a Function of its Colour, **Ergonomics,** 1972.

Ali, M. R., and Jahan, R., Critical Flicker Frequency as a Function of Colour, **The Dacca University Studies,** 1974.

Akerstedt, T., and Torsvalt, L., Experimental Changes in Shift Schedules : Their Effects on Well-being, **Ergonomics,** 1978.

Ahmed, M, **The Financing of Small Scale Industries,** A Study of Bangladesh and Japan, University of Dhaka, 1987.

Bennett, C. A., and Rey, P., Whats so What About Red?, Human Factors, **1972.**

Dhaka University Institutional Repository

Bethel, Lawrence L., and Others, Industrial Organization And Management, **Fourth Edition, Mc Graw Hill Book Company, New York, 1979.**

BSCIC, **Annual Report,** 1995-96.

_____, **Survey on Small Industries on Bangladesh,** 1991.

Burrows, A.A., Acoustic Noise, an Informational Definition, **Human Factors,** 1960.

Bangladesh Bureau of Statistics, **Statistical Pocket Book,** 1995.

Cohen, A., The Role of Psychology in Improving Worker Safety and Health Act., **American Psychological Association,** Honolulu, Hawaii, Sept. 1972.

Davis, K, **Human Behavior At Work,** 5th Edition, Tata Mc Graw-Hill Publishing Co., New Delhi, 1977.

Ewell, J.M., 1955, A Yardstick For `56 Proctor and Gamble, **Safety Bulletin,** January, 1956.

Eysenck, H.J., Acritical and Experimental Study of Color Preferences, **American Journal of Psychology,** 1941, 54.

Frankel, Leek And Fleisher, Alexander, **The Human Factor In Industry,** The Mcmillan Company, New York, 1920.

Ferree, C.E., and Rand, G. Good Working Conditions For Eyes. **Personnal J.,** 1937.

Dhaka University Institutional Repository

Faulkner, T. W., and Murphy, T.J., Lighting for Difficult Visual Tasks, **Human Factors,** 1973, 15.

Finkelman, J.M., and Glass, D.C., Reppraisal of the Relationship Between Noise and Human Performance by Means of a Subsidiary Task Measure, **Journal of Applied Psychology,** 1970, 54.

Glass, D.C., and Singer, J.E., Urban Stress: Experiments and Noise and Social Stressors, **Academic Press,** Newyork, 1972.

Gilmer, B.V.H., **Industrial Psychology,** McGraw Hill Book Co., New York, 1966.

Hossain, M., and Others, Job Satisfaction of Garment Workers: A Case Study on Selected Factories in Narayanganj: **Islamic University Studies,** Vol. 4 No-1, 1995.

Haque, A.B.M., Zahirul, "A Quality of Working Life of Industrial Workers in Bangladesh, Psychology in South Asia, **Shakil Prokashoni, Dhaka, July, 1996.**

Humphrey, C. E., Privatisation in Bangladesh Economic Transition in a Poor Country, **The University Press Ltd.,** Dhaka Bangladesh, 1992.

Haque, R., Effects of Music on Productivity and Employee Attitude in a Garments Factory, Unpublished Project, **Dhaka University,** 1989.

Hepner, H.W., **Psychology Applied to Life and Work,** (3rd Ed.), Prentice-Hall, Inc. Englewood, Newjersy, 1965.

Dhaka University Institutional Repository

Jones. H. H., and Cohen, A Noise as a Health Hazard at Work, in the Community and in the Home, **USPHS, Public Health Reports,** 1968.

Kamal, M.R., Problems of Small-Scale and Cottage Industries in Bangladesh, **The University of Nagoya,** Japan, 1985.

Kuntz, J.E., and Sleight, R.B., Effect of Target Brightness on "Normal" and "Subnormal" visual Acquity, **Journal of Applied Psychology,** 1949.

Kidd, J.S., Line Noise and Man-machine System Performance, **J. Engr. Psychol.,** 1962.

Kryter, K.D. The Effects of Noise on Man, **Academic Press,** Newyork, 1970.

Korn Hauser, A.W., The Effects of Noise on Office Output, **Indust. Psychol.,** 1927.

Kerr, W.A., Experiments on The Effects of Music on Factory Production, **Applied Psychology Monographs,** 1945.

____, Accident Proneness in Factory Departments, **Journal of Applied Psychology,** 1950.

Kossoris, M.D., and Kohler, R.F., Hours of Work and Output, U.S. Department of Labour, **Bureau of Labour Statistics**, Bulletin No. 917, 1947.

Dhaka University Institutional Repository

Kayemuddin, Md., Evaluation of Factors Affecting Productivity in Small Industries in Bangladesh, PHD Thesis, Dept. of Accounting, **University of Dhaka,** 1992.

Knauth, P. and Rutenfmz, J., **Duration of Sleep Related to The Type of Shift Work,** In a reinberg, N. Vieux, and P. Andlauer (Eds), Night and Shift work : Biological and Social Aspects, Pergamon Press, Oxford, 1981.

Koller, M., and Haider, M., Psychological Problems and Psychosomatic Symtoms of Night and Shift Workers, **Activ. Nerv. Sup,** 1977.

Khaleque, A, and Rahman, A Shift Workers Attitudes Towards Shift Work and Perception of Quality of Life, **International Archieves of Occupational and Environmental Health,** 1984.

Likert, Rensis, **The Human Organization: Its Management And Value,** Mcgraw Hill Book Co., New York, 1967.

Luckiesh, M. and Moss, F.K., **The Science of Seeing,** Princeton, N.J., van Nostrand, 1937.

Loveday, J. and Munroe, S.H., Preliminary Notes on The Boot and Shoe Industrym, **Industrial Fatigue Research Board,** Rept. No. 10, 1920.

Mayo, Elton, **The Human Problems of an Industial Civilization,** Mass : Harvard University Press, Boston, 1933.

Dhaka University Institutional Repository

MCGehee, W., and Owen, E.B., Authorized and Unauthorized Rest Pauses in Clerical Work, **Journal of Applied Psychology,** 1940.

Mott, P.E., Mann, F.C., Mclaughlin, Q., and Warwick, D.P., shift work : The Social Psychological and Physical Consequences, Ann Arbor, Mich : **University of Michigan Press,** 1965.

McBain, W.N., Noise, The Arousal Hyphothesis and Monotonous Work, **Journal of Applied Psychology,** 1961, 45.

McCormic, E. J., **Human Factors In Engineering and Design,** McGraw Hill, Newyork, 1976.

_____, **Human Engineering,** Mc Graw Hill, Newyork, 1957.

Maier, N. R. F. **Psychology In Industry,** Third Edition, Oxford And IBH Publishing Co. New Delhi-Calcutta.

Mc Gehee, W, and Gardner, J. E., Music In A Complex Industrial Job, **Personnel Psychology,** 1949.

Osborne, E.E., And Vernon H.M., The Influence of Temparature and Other Conditions on The Frequency of Industrial Accidents, **IFRB, Rept.** No. 19, 1922.

Planning Commission, Govt. of The Peoples Republic of Bangladesh, **The Fifth Five Year Plan,** 1997-2002.

___, **Participatory Perspective Plan For Bangladesh** : 1995-2010, July 1995.

____, **Fourth Five Year Plan,** 1990-1995.

Dhaka University Institutional Repository

Park, J.F. JR., And Payne, M.C. JR., Effects of Noise Level And Difficulty of Task in Performing Division, **Journal of Applied Psychology** 1963, 47.

Saraf, D.N., Marketing Small and Cottage Industries Products, **A Paper Presented in The Seminar on Development of Small And Cottage Industries in Bangladesh,** December, 1981.

Smith, H.C., Music in Relation to Employee Attitudes, Piece Work Production And Industrial Accidents, **Applied Psychology Monographs,** 1947.

Sarma S.V.S., **Small Entrepreneurial Development in Some Asian Countries,** A Comparative Study, Light And Life Publishers, New Delhi and Jammu, 1985.

Spragg, S.D.S; And Rock, M.C., Dial Reading Performance As A Function of Color of Illumination, **Journal of Applied Psychology,** 1952.

Tinker, M.A., Illumination Standards for Effective and Easy Seeing, **Psychological Bulletin,** 1947.

Taylor, F. W., **The Principles Of Scientific Management**, Harper And Brothers, New York, 1911.

Tiffin, Joseph, **Industrial Psychology,** Third Edition, Prentice-Hall, Newjersy, 1956.

Ure, Andrew, **The Philosophy Of Manufacturers,** Charles Knight, London, 1835.

Dhaka University Institutional Repository

Uhrbrock, R.S., Music On The Job : Its Influence On Worker Morale and Productivity, **Personnel Psychology,** 1967.

Vepa, R.K., **Small Industry: The Challenge of The Eighties,** Vikas Publishing House PVT. Ltd., New Delhi, 1983.

Vernon, H.M, And Bedford, T., The Relation of Atmospheric Conditions to The Working Capacity and The Accident Rate Of Coal Miners, **IFRB Rept.** No. 39, 1927.

_____ A Study Of Absenteeism In A Group of Ten Colliers, **IFRB Rept.** No. 51, 1928.

____, The Influence of Rest Pauses on Light, Industrial Work, **Industrial Fatigue Research Board, Rept.** No. 25, 1924.

_____, The Speed of Adaptation of Output To Altered Hours of Work, **Industrial Fatigue Research Board Rept.** No. 6, 1920.

Waytt. S. Franser, J. A. and Stock, F.G.L, Fan Ventilation in A Humid Weaving Shed. **IFRB, Rept.** No. 37, 1926.

আবদুল আউয়াল খান ও অন্যান্য, **ব্যবস্থাপনা,** আবীর পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০১।

আবদুল খালেক, **শিল্প মনোবিজ্ঞান,** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৫।

আবদুল আজিজ খান, **শ্রম ও শিল্প আইন,** দ্বিতীয় সংস্করণ, পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮।

আবু তাহের খান, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে অর্থায়ন ঃ সমস্যা ও করণীয়, **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা,** অক্টোবর- ৯৭, জুন-৯৮।

এম, এ, মান্নান, **অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা,** ৬ষ্ঠ সংস্করণ, রয়েল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

এ, এইচ, হাবিবুর রহমান, **ব্যবসায় উদ্যোগ**, ১ম সংস্করণ, এইচ. কে. এস. পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৮।

কাজী ফারুকী ও অন্যান্য, **বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন**, তৃতীয় সংস্করণ, কাজী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭।

ক্লড এস. জর্জ, জুনিয়র, **ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার ইতিহাস**, ১ম সংস্করণ, (অনুবাদ) পেপার প্রসেসিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ, ঢাকা, ১৯৯৩।

কাজুতাকা কোগী ও অন্যান্য, **কার্যাবস্থা উন্নয়নে স্বল্পব্যয়ের পদ্ধতিসমূহ** ঃ এশিয়ার ১০০টি উদাহরণ,প্রডাকটিভিটি সার্ভিসেস উইং, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন,সেপ্টেম্বর,১৯৯২।

কারখানা আইন, ১৯৬৫।

জগতুল আলম, বিশ্বব্যাংকের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পখাত, **শিল্পজার্নাল**, ২য় সংখ্যা, বিসিক, অক্টোবর, ১৯৮৪।

জে, ই, থারম্যান ও অন্যান্য, **কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি**, প্রডাকটিভিটি সার্ভিসেস উইং, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন, ইউএনডিপি/আইএলও প্রকল্প বিজিডি ৮৬/০০৮।

তোফায়েল আহমেদ, **যুগে যুগে বাংলাদেশ**, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯২।

নেসার আহমেদ, **শিল্প মনোবিজ্ঞান**, ১ম সংস্করণ, তানিম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩।

বাংলাদেশ ব্যাংক, **বার্ষিক রিপোর্ট**, ১৯৯৪-৯৫, ঢাকা, এপ্রিল, ১৯৯৬।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, শিল্পনাগরী ডাইরেক্টরী, ১৯৯৫।

বিরূপাক্ষ পাল, **মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বাংলাদেশ**, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৫।

মোঃ আতাউর রহমান ও নজরুল ইসলাম, **সাংগঠনিক আচরণ**, দ্বিতীয় সংস্করণ, উত্তরা পাবলিকেশন্স, নাটোর, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

মোঃ হাবিবুল্লাহ, **সাংগঠনিক ব্যবহার ও শিল্প মনোবিজ্ঞান,** তৃতীয় সংস্করণ, ছাত্রবন্ধু পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৫।

মোঃ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, **বাংলাদেশের ইতিহাস,** নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯০।

মোঃ রফিকুল্লাহ এমরান, মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন সমস্যা, সম্ভাবনা ও কৌশল, **দৈনিক অর্থনীতি,** ৬৮তম সংখ্যা, ১৯৯৯।

মোঃ আবদুস সামাদ, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রশিল্পের ভূমিকা, **বিসিক বার্তা,** চতুর্থ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ, ১৯৯৭।

মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, **বাণিজ্যিক ভূগোল,** ৫ম সংস্করণ, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, ঢাকা, ১৯৯৯।

রওশন জাহান, **শিল্পে মনোবিজ্ঞান ঃ কর্ম বিজ্ঞান,** ১ম সংস্করণ, আমাদের বাংলা প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১৯৯০।

লতিফুর রহমান, **উৎপাদন ব্যবস্থাপনা,** ১ম সংস্করণ, রয়েল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৩।

---, **আধুনিক বাণিজ্যিক ভূগোল,** দশম সংস্করণ, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৭।

---, **কারবারের ব্যবস্থাপনা,** দশম সংস্করণ, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, ঢাকা, ১৯৯৮।

শিল্পমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, **শিল্পনীতি-১৯৯১,** ঢাকা।

--- **শিল্পনীতি-১৯৯৯,** ঢাকা।

সফিকুর রহমান, **বাংলাদেশের অর্থনীতি,** তৃতীয় সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৯।